ভাদ্র—১৩৪৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য। ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব জিনিষ। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বৈষ্ণব-প্রধান দেশ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য রামানুজ হইতে বল্লভাচার্য্য পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ভক্তিবাদ বিভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্তের আনুকূল্যে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এই অবিচ্ছিন্ন ভক্তিসাধনা শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাধাভাবদ্যুতি শবলিত ভক্তিতত্ত্বে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভারতবর্ষের সকল প্রকার বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে বিলক্ষণ ও বিশিষ্ট। মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি দার্শনিক কিম্বা ভক্তমণ্ডলী সকলেই মোক্ষকে চরম পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তিকে কোথাও সাধ্য বলেন নাই, মুক্তির সাধনরূপেই ইহার স্থান। সুতরাং ভক্তিই শ্রেষ্ঠতম পরম পুরুষার্থ ইহা একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই প্রচার করিয়াছেন। আর্ষ যুগে, বিশেষতঃ পৌরাণিক যুগে, চরম পুরুষার্থরূপে যে সকল সিদ্ধান্ত রহিয়াছে তাহার যে পরিমাণ গভীর গবেষণার প্রয়োজন ততটা এখনও হইতেছে না। সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে বৈদিক সংহিতাদি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহাতে ভক্তিকে অথবা মুক্তিকে চরম পুরুষার্থ বলা হইয়াছে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে এ পর্য্যন্ত আমাদের যাহা উদ্যম হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

বৈদিক যুগে কি সিদ্ধান্ত ছিল তাহা জানিতে হইলে আচার্য্যগণের গ্রন্থ প্রণিধানযোগ্য। দর্শনযুগে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, মোক্ষই চরম পুরুষার্থ। বৌদ্ধযুগেও মুক্তিকে অধ্যাত্ম জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করা হয়। আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞানবাদী। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, বেদান্ত-

সূত্র, গীতা ও উপনিষদের মুখ্য প্রতিপাদ্য প্রয়োজন মুক্তি। অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তী আচার্য্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তিনি দ্বৈতপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন বটে কিন্তু তাঁহার মতে মুক্তিই অধ্যাত্ম সাধনার চরম পরিণতি। মধ্বাচার্য্যও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তাঁহারও সিদ্ধান্ত ছিল মোক্ষই মনুষ্য জীবনের চরম আপ্তব্য, পরম পুরুষার্থ। কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ইহাই হইল যে, মুক্তি হইতেও ভক্তির উৎকর্ষ সমধিক। অর্থাৎ ভক্তিই চরম ও পরম পুরুষার্থ। বঙ্গের এই বিলক্ষণ ভক্তিতত্ত্ব শ্রীরূপ শ্রীসনাতন গোস্বামিদ্বয় প্রচার করিয়া বঙ্গীয় দার্শনিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীজীব গোস্বামীও ভক্তিতত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণ দ্বারা মোক্ষবাদী ভারতবর্ষকে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব অভিনব রসসম্ভার দান করিয়াছেন। বৌদ্ধ অভ্যুদয়ের পর হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মোক্ষবাদ প্লাবিত ভারতবর্ষ এইরূপ অপূর্ব্ব শিক্ষার সন্ধান পায় নাই।

শ্রীরূপ গোস্বামী অতি পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন—

"ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তি সুখ স্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

—ভক্তিরসামৃত সিন্ধু

যতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যহৃদয়ে ভোগস্পৃহার মত মুক্তিস্পৃহা পিশাচী তুল্য বাস করিবে ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তিসুখ তাহাতে প্রবেশ করিবে না। যে ভারত যুগযুগান্তর হইতে উদাত্ত-কণ্ঠে মুক্তির মহিমা প্রচার করিয়া আসিতেছে, সেই ভারতেই কন্থা কৌপীনধারী একজন বাঙ্গালী বৈরাগী দৃঢ়কণ্ঠে নিঃসঙ্কোচে বলিলেন—মুক্তিস্পৃহা পিশাচী তুল্য। ইহাই হইল বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য। শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তিসমৃদ্ধ শ্রীসনাতন তদীয় বৃহদ্ ভাগবতামৃত গ্রন্থে এই ভক্তিবাদ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল, শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক ভক্তিশাস্ত্র এবং ইহা উপনিষদের সার। সেই সমস্ত উপনিষদের মর্ম্মার্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিধৃত রহিয়াছে। অনেকগুলি শ্লোক দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের বা জীবন্মুক্তের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, যেমন—দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ—নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ, এই প্রকার বহু উক্তি দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্ম করিবেন বটে কিন্তু কর্তৃত্বের অভিমান তাঁহাতে থাকিবে না। অথচ শ্রীভগবানের উপদেশ হইল, "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ"—কেহই এক মুহূর্ত্তও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীভগবদুপদেশ অনুসারেই তিনি কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া লোকহিতার্থ কর্ম্ম সম্পাদন করেন। তাঁহার দেহ সক্রিয় হইলেও অন্তরে তিনি 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অহঙ্কার দ্বারা সর্ব্বথা অস্পৃষ্ট। যন্ত্রি-চালিত যন্ত্রবৎ তিনি ভগবৎ প্রেরণানুসারেই কর্ম্ম করিয়া যান। "শান্তিং নির্ব্বাণ পরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি"—এই শ্লোকে নির্ব্বাণমুক্তির কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা খুব সংক্ষেপেই উক্ত হইয়াছে। নির্ব্বাণমুক্তির অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য তিরোহিত হয়। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ কল্পিত, উহা সুতরাং অবিদ্যারই কার্য্য ও অপারমার্থিক। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। এই তত্ত্বের অনুশীলন জীবভাব দূর করিবার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু ব্রহ্মাত্মবোধ সম্পাদন অত্যন্ত দুষ্কর। তাই শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—"অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।" নিরুপাধিক ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি যতক্ষণ দেহাত্ম বুদ্ধি থাকিবে ততক্ষণ হইবে না। উপর্য্যুক্ত মুক্তির দ্বৈবিধ্য থাকা সত্ত্বেও সাধকসম্প্রদায় জীবন্মুক্তির দিকেই সবিশেষ আকৃষ্ট হন। মনের এমন একটা অবস্থা আসিবে যখন সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব চলিয়া যাইবে, চিত্তে অনুদ্বেগময় প্রশান্তি বিরাজ করিবে, দেহ আছে তাহার প্রয়ত্নও রহিয়াছে অথচ আভিমানিক কর্তৃত্ববুদ্ধি নাই, পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় জীবাত্মা শীতোষ্ণাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট অবিকৃত রহিয়াছে—শ্রেষ্ঠ সাধকগণ এই অবস্থা লাভ করিবার জন্যই যত্নশীল হইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীসনাতন গোস্বামী মুক্তি ও ভক্তির স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে অতি পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন স্বারামতা অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থার প্রাপ্তি ত সহজ। অহঙ্কার পরিত্যাগক্রমে তাহা সু-করই হইয়া উঠে। ভূয়োদর্শন ও বিবেক দ্বারা সংসারের অবস্থার সম্যক্ উপলব্ধি হইলে জীবের ভ্রান্ত কর্তৃত্ববুদ্ধি চলিয়া যাইতে পারে। সৃষ্টির অভাবনীয় বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য করিলে একটি বিলক্ষণ শক্তি যে তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে এইরূপ বোধ আপনিই

আসে। তখন সাধক আপনার কর্তৃত্ব যে নিতান্তই আভিমানিক তাহা বুঝিতে পারেন। ঈশ্বরের বিভুত্ব ও অমিত শক্তিমত্তা সাধককে বুঝাইয়া দেয় যে আবার স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব কোথায়? আমি ত যন্ত্রিচালিত একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র মাত্র!

সুতরাং ভগবদ্ভক্তি যতই প্রগাঢ় হইবে—ততই কর্তৃত্বের মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপ জীবন্মুক্ত অবস্থার দিকে সাধক অগ্রসর হইবেন। মুক্তি দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয়। ভক্তির চরম ফল পাইবার পূর্ব্বে ইহা সাধকের কাম্য হইতে পারে। কিন্তু ইহা ভক্তির একটি অবান্তর ফল। মনে রাখিতে হইবে, ভক্তের পক্ষে এই আত্মারামত্ব অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থাও গ্রাহ্য নহে, কেন না ইহা প্রেমবিরোধী—তথাপি নাত্মারামত্বং গ্রাহ্যং প্রেমবিরোধিয়ৎ।" (—বৃহদ্ভাগবতামৃত)। শ্রীভগবানের প্রতি নিরবধি প্রীতিই হইল প্রেম। তজ্জন্য প্রেমে অনন্ত অতৃপ্তি। স্বভাবতই উহা তৃপ্তির অভাব "তৃপ্ত্যভাব-স্বভাবতং।" আত্মারাম কৃতকৃত্যতা আনে, এই অবস্থায় সাধক নিষ্ক্রিয় হন। তাঁহার নিকট প্রাপঞ্চিক ব্যাপার স্বপ্নবৎ ঐন্দ্রজালিক মনে হয়। জীবের সাক্ষাৎস্বরূপ চৈতন্যের উপলব্ধি করিয়া তিনি আত্মরতি আত্মক্রীড়, সুতরাং পরিতৃপ্ত থাকেন। "আত্মন্যেব সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"—এই হইল তাঁহার অবস্থা। নিবিড় জ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা দেহাত্মবাদ দূর করিয়া তিনি কৃতকৃত্যতা বোধ করেন মাত্র। "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" প্রভৃতি গীতোক্তি জীবন্মুক্তের চরিতার্থতা প্রচার করিতেছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে-হৃদয়ে চরিতার্থতা আসিয়াছে তাহাতে ভক্তি প্রবেশ করে না। সর্ব্বপ্রকার যুক্তির অনুশীলন দ্বারা তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—প্রেমে কৃতকৃত্যতা নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রকার সিদ্ধান্ত রহিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রামানুজাচার্য্য হইতে বল্লভাচার্য্য পর্য্যন্ত সকল বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মুক্তিকেই সাধ্য বলিয়াছেন, ভক্তি মুক্তির সাধন। ভক্তি উপায়, মুক্তি উপেয়। কিন্তু বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত হইল ভক্তি সাধ্য, সাধন নহে। ইহা পঞ্চম পুরুষার্থ, ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ ব্যতিরিক্ত—ইহাদের অতীত অবস্থা। নামকীর্ত্তন আত্মসমর্পণাদি দ্বারা এই প্রেম ভক্ত-হৃদয়ে অনুভূত হয় এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে পরশ না গেল॥" ইহাই হইল ভক্তের অনন্ত অপরিসীম অতৃপ্তি বা সর্ব্বাত্মভূত সচ্চিদানন্দরসঘন মূর্ত্তি। শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমলক্ষণাভক্তি, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনর্পিতচরী ভক্তির অসাধারণ সিদ্ধান্ত।

ভক্তি হ্লাদিনী শক্তির পরিণামবিশেষ। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ভগবানের বহিরঙ্গ শক্তি আর হ্লাদিনী তাঁহার অন্তরঙ্গ শক্তি। ভগবান্ তাঁহার বহিরঙ্গ শক্তি দ্বারা এই বিপুল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রপঞ্চের উৎপত্তি-বিলয়-প্রসঙ্গে শ্রুতিও বলিয়াছেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি কিন্তু তাঁহার স্বরূপভূতা। ভগবান্ আনন্দস্বরূপ হইলেও আনন্দের অনুভবিতা নন। হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা তিনি স্ব স্বরূপ আনন্দের অনুভবিতা হন। বিষ্ণুপুরাণে হ্লাদিনী শক্তির পরিচয় আছে। মানুষের জীবনের উপর হ্লাদিনী শক্তি সক্রিয় আছেন। প্রত্যেক মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে আপনাকে বিমল আনন্দরসের অধিকারী করিয়া তুলে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" আনন্দ যেমন রহিয়াছে তাহার অনুভবেরও প্রয়োজন। আনন্দের সাক্ষাৎক্রিয়মানত্ব না থাকিলে চরিতার্থতা কোথায়? চরিতার্থতার অভাব অতৃপ্তি আনয়ন করে। হ্লাদিনী আনন্দকে অনুভবের বিষয়ীভূত করিয়া অতৃপ্তির পর্য্যবসান করে।

ভক্ত চান জ্ঞানও থাকুক, ভাবও থাকুক। জ্ঞান হইল প্রমাণজন্য বৃত্তি। ভাব আসে জ্ঞানের পর। বিষয়ের অনুভূতি প্রমাণের ফল। অনুভূতির পর বিষয়ের প্রতি আনুকূল্য জন্মে। বিষয় অধিগত না হইলে বিষাদ, ব্যাকুলতা ও অতৃপ্তিতে চিত্ত ভরিয়া উঠে। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানকে পাইয়া সন্তুষ্ট কিন্তু প্রেমমার্গী বৈষ্ণব জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল না পাইলে অতৃপ্ত। বিধাতা মস্তিষ্কও সৃষ্টি করিয়াছেন হৃদয়ও সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং হৃদয়রাজ্যের ব্যাপার মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। জ্ঞানের জন্য তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে জ্ঞানমার্গী সংসার পরিত্যাগ

করেন—"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।" ভক্ত কিন্তু আভিমানিক কর্ত্তৃত্ববোধ দূর করিয়া নিত্য কৃষ্ণ কৈঙ্কর্য্যে তন্ময় হইয়া থাকেন। তাঁহার নিকট ভগবানই সব ; তিনি অকর্ত্তা, ভগবানই একমাত্র কর্ত্তা—নিয়ন্তা। ভক্ত হ্লাদিনীর প্রভাবে প্রপঞ্চের মধ্যে থাকিয়াও শ্রীভগবানের সেবা করেন।

জ্ঞান সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলে মানুষের পরিণতি হয় উন্মত্ততা। দুই পথ রাখিয়া চলিবার যে পথ সেইটিই হইল ভক্তিমার্গ। নির্ব্বাণবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভক্তিবাদ তখন তাহাতে আসিয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব, অমিতাভ প্রভৃতি বৌদ্ধগণের উপাস্য হন। বোধিসত্ত্ব বা অমিতাভের কল্পনা (conception) বৌদ্ধসংস্কৃতির পরিণতি নহে, উহা হিন্দু ভক্তিশাস্ত্রের অবদান।

শ্রীভগবানের নিকট ভক্তের নিরন্তর এই প্রার্থনা, "হে ভগবন্, আমি সুখৈশ্বর্য্য চাই না, অপুনর্ভব চাই না। আমি সকলের আর্ত্তি—নিজের করিয়া নিতে চাই। যেখানে দুঃখের অনুভূতি, তুমি শক্তি দাও আমি যেন সেখানে প্রবিষ্ট হইতে পারি।" কেবলমাত্র ভোগরাগের আড়ম্বরেই শ্রীহরির সেবা হয় না। সকল প্রাণীর যিনি সেবা করিতে পারেন তিনিই যথার্থ শ্রীহরিভক্ত। ভগবান্ যে বিরাট বিশ্ব সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার সেবার ভার ভক্তের উপর। ভক্ত সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সকল লাবণ্যের আশ্রয়, মাধুর্য্যময় ভগবৎস্বরূপের অনুভূতি করিয়া তাঁহার সেবার জন্য নিত্য উন্মুখ থাকিবেন। ভক্তের অনুভূতি আকাঙ্ক্ষাবিমিশ্র। 'যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্॥'—এই বুদ্ধি লইয়া ভক্ত কর্ম্মে নিরত থাকিবেন। শ্রীরূপ গোস্বামী তাই এই প্রেমভক্তির পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"স্তোত্রং যত্রতটস্থতামুপনয়ৎ চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাম্
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন পৃথুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বরেসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া॥"

—বিদগ্ধমাধব

যাঁহার প্রেম স্বারসিক হইয়াছে তিনি ভাবিবেন, যে ব্যক্তি তাঁহার স্তুতি করেন তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে আপনার বলিয়া ভাবেন না। যিনি তাঁহার নিন্দা করেন তিনি যেন তাঁহার স্বজন বন্ধু। বন্ধুর মত তাই পরিহাস করিতেছেন। দোষ দর্শনে প্রেমিকের প্রেমক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ; গুণ বর্ণনে প্রেমিকের প্রেম বৃদ্ধিও লাভ করে না। এই অহেতুকী প্রীতির বিবর্ত্তই হইল বাঙ্গালীর প্রেমধর্ম্ম। ইহাই হইল বাঙ্গালার প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য অসাধারণ দান বা অনর্পিতচরী ভক্তি।

আজ বাঙ্গালীর চতুর্দ্দিকে দুরবস্থা। আমাদের জীবন প্রেমহীন কলহমুখর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালী আপনার নিজস্ব প্রেমধর্ম্ম ভুলিয়াছে বলিয়া আজ তাহার সর্ব্বত্র বিড়ম্বনা! পুনর্ব্বার প্রেম মহাবৃক্ষের শীতল ছায়ায় না আসিলে কি আমাদের অশান্তি দূরীভূত হইবে? বর্ত্তমানে প্রেম কামে পরিণত হইয়াছে, ভোগবাসনাকেই আমরা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম মনে করি। আমাদের এই জাতীয় দুর্দ্দিনে প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। প্রেমধর্ম্মের রাধাভাবদ্যুতি—শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাতা শ্রীচৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইলে আমরা এই প্রেমের অপ্রাকৃত বিমল আনন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব, অন্যথা নহে। এই মহান্ সত্যের প্রতি অনাদর বা উপেক্ষা আমাদের সর্ব্বনাশের পথকে আরও প্রশস্ত ও আরও সুগম করিয়া তুলিবে।

বারিদবরণ

(নাটিকা)

শ্রীঅশোক সেন এম-এ

চরিত্র

বারিদবরণ—অবসরপ্রাপ্ত দর্শনের অধ্যাপক। আজীবন হিপ্নোটিজম্, স্পিরিচ্যুয়ালিজম্ ইত্যাদি সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়াছেন। বর্ত্তমান বয়স পঞ্চান্ন—এযাবৎ অবিবাহিত।

অসীম—বিলাতী ডিগ্রিপ্রাপ্ত ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। বয়স ছাব্বিশ বৎসর।

অতনু—অসীমের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ব্যারিষ্টার। অসীমের থেকে কিছু বড় কি ছোট।

অমিতা—বারিদবরণের বন্ধু-কন্যা। অত্যন্ত শিশুকালে মা মারা যান। দশ বৎসর বয়সের সময়ে অমিতার পিতা দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া বন্ধু বারিদবরণের হস্তে কন্যার লালনপালনের ভার দিয়া যান। অমিতার বর্ত্তমান বয়স বাইশ বৎসর, উচ্চশিক্ষিতা।

মিসেস্ রায়—মধ্যবয়সী বিগতযৌবনা লেডী ডাক্তার, বালবিধবা। এক সময়ে সৌন্দর্য্য ছিল, এখন উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে সমস্ত মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যূথিকা—অতনুর স্ত্রী।

প্রথম অঙ্ক

অসীমের বসিবার ঘর। সময়—সন্ধ্যা

অসীম (মৃদুস্বরে পড়িতেছিল)—
How do I love thee ?
Let me count the ways.
I love thee to the depth and
breadth and height
My soul can reach—

অতনুর প্রবেশ

অতনু। এই সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ Love, love ক'রে ক্ষেপে উঠ্লে কেন হে? বিকালে কি বারিদবরণের বাড়ী গিয়েছিলে না কি? তা দিল্লী-আগ্রা কেমন দেখা হ'ল বল—

অসীম। বসো, বসো, সব বল্ছি। দিল্লী, আগ্রা সবই অপূর্ব্ব কলাশিল্পের নিদর্শন। তবে সব চেয়ে সুন্দর জিনিষ যা দেখ্লাম—আগেই অবশ্য চিঠিতে সে কথা তোমাকে জানিয়েছি—বারিদবরণের পালিতা বন্ধু-কন্যা অমিতাকে।

অতনু। 'প্রোপোজ্'-'ট্রোপোজ্' করেছ না কি?

অসীম। দিন পনের'র আলাপে 'প্রোপোজ' কি হে?

অতনু। তাতে কি। কত বড় বড় ব্যাপার এর থেকে অল্প সময়ে করা যায়, আর এ ত সামান্য প্রোপোজ করা। আলাপও কম পক্ষে পনের দিনের। প্রথম সাক্ষাৎ যে-সে জায়গায় নয়—প্রেমিকের তীর্থস্থান আগ্রার তাজমহলে—যার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নীল যমুনা—

অসীম। আরে থামো থামো। গোড়াতেই ভুল করে বস্লে। প্রথম আলাপ আগ্রায় নয়—ফতেপুর সিক্রীতে, অবশ্য পরে একসঙ্গে তাজ দেখ্তে গিয়েছিলাম।

অতনু। সে যা হোক্, এবার বিশদভাবে আলাপের বিবরণী দাও দেখি।

অসীম। আগ্রা থেকে ভোরবেলা রওনা হলাম ফতেপুর সিক্রীর দিকে। ষ্টেশনে নেমে দেখি একটা সরাই গোছের—সেখানে বিক্রী হচ্ছে চা এবং দুধ। ঢুকে দেখ্লাম এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক—সঙ্গে ফিকে সবুজ শাড়ী পরিহিতা একটি যুবতী। Sharp features—লম্বা টানা টানা চোখ। মোটের উপর ঐ রকম শুষ্ক ধূলিধূসরিত মরুতে ঐ আনারকলির মত মেয়েটিকে দেখে মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্ল বুঝতেই পারছ।

অতনু। সে দৃশ্য কল্পনা ক'রে আমিও যে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্ছি। Go on, তারপর কি হল বল, থেমো না—

অসীম। তারপর আর কি, যথারীতি আলাপ পরিচয়। একসঙ্গে ফতেপুরের শিল্পকলা উপভোগ, যতদূর ইতিহাসের জ্ঞান ছিল—প্রদর্শন। Impress করতে যথাসাধ্য চেষ্টা, ইত্যাদি ইত্যাদি…

অতনু। মেয়েটি কেমন ?

অসীম। আমার কাছে She is a phantom of delight. অতনু, তুমি অনেক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, আমি বিয়ে কর্‌ব কবে। আমি উত্তর দিয়েছি, মনের মত পেলে—অর্থাৎ সুন্দরী এবং উদার মনোবৃত্তি-সম্পন্না মেয়ে পেলে তবেই বিয়ে কর্‌ব। তুমি তার উত্তরে বলেছ, আমার মানসসুন্দরীকে ফর্‌মাস দিয়ে তৈরী কর্‌তে হবে। অতনু, এতদিনে সেই মানসসুন্দরীর দেখা পেয়েছি।

অতনু। দেখ অসীম, যখনই কেউ কারো সঙ্গে 'লভে' পড়ে, তার মধ্যেই দেখ্‌তে পায় তার আকাঙ্খিত সব। এ তুমিই নূতন দেখছ না। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে দেখে এসেছে প্রেমিক এ ভাবে তার প্রেমিকাকে।

অসীম। তর্কে কাজ নেই। অমিতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেই বুঝ্‌বে।

অতনু। Guardian-টির নাম কি বললে ? রুদ্রবরণ নাকি—তিনি তোমাদের এই আলাপটাকে কি ভাবে দেখ্‌ছেন ?

অসীম। বারিদবরণবাবু একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। কথা বলেন কম। সব সময়েই অন্যমনস্ক। হয় ত তিনজনে কিছু দেখ্‌ছি—আমি অমিতাকে কিছু বোঝাচ্ছি, অমিতা নিবিষ্ট মনে শুন্‌ছে, হঠাৎ চোখ পড়ল বারিদবাবুর ওপর। দেখি কঠোরভাবে তিনি আমার দিকে চেয়ে আছেন। কিন্তু তক্ষুণি সামলে নিয়ে একটু হেসে আমাকে বল্‌লেন—ইতিহাসের জ্ঞান আপনার প্রগাঢ়, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় অমিতার এসব বোঝবার সুবিধা হচ্ছে। আমার কিন্তু তাতেও অস্বস্তি গেল না। যাক্, একই গাড়ীতে ফিরে এলাম আগ্রায় এবং সেখান থেকে দিল্লীও আমরা একই সঙ্গে দেখ্‌লাম ঘুরে ঘুরে। এর মধ্যে একদিন দিল্লীতে এক সিনেমা হলে বারিদবাবু আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁর ইচ্ছাশক্তি দেখাতে। সত্যই অদ্ভুত ক্ষমতা এ বিষয়ে ভদ্রলোকের। তাঁর দিকে একবার চাইলে লোকে যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে।

অতনু। তোমার দিকটাই ত এতক্ষণ বল্‌লে। অমিতার মনোভাব কি ?

অসীম। পরিষ্কার যদিও কথা হয়নি এ বিষয়ে তার সঙ্গে, তবে আমার মনে হয় অমিতার আপত্তি হবে না।

অতনু। কবে আলাপ করিয়ে দিচ্ছ ?

অসীম। আজ রাত্রে ওদের ওখানে নেমন্তন্ন। অমিতাকে বল্‌ব আস্‌ছে রবিবার তোকে নিয়ে যাব ওদের বাড়ী।

অতনু। ওঠা যাক্ তাহ'লে আজ।

অসীম। আমিও তৈরী হয়ে নিই যাবার জন্য।

অতনুর প্রস্থান

যবনিকা পতন

দ্বিতীয় অঙ্ক

[বারিদবরণের পাঠকক্ষ। দর্শন, স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্, হিপ্‌নোটিজ্‌ম্, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে নানা পুস্তকে পরিপূর্ণ। সময় সন্ধ্যা। একটি টেবিলের দুই পার্শ্বে দুইটি চেয়ারে বারিদবরণ ও মিসেস্ রায়। টেবিলের উপরের ল্যাম্প্‌টি হইতে স্বল্প নীল আলোকে সামান্য একটু স্থান আলোকিত। তাহা ভিন্ন ঘরটির বেশীর ভাগ স্থানই অন্ধকারে ভরা। চারিদিকেই যেন এক ভয়াবহ আবহাওয়া।]

বারিদবরণ ও মিসেস্ রায়

বারিদবরণ। তুমি এতদিন পরে হঠাৎ কোথা থেকে এবং কি অভিপ্রায়ে এসে হাজির হয়েছ লতিকা ?

মিসেস্ রায়। আমার এখানে আসাটা যে তোমার অভিপ্রেত নয়, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

বারিদবরণ। ওসব বাজে কথা রেখে তোমার এখানে আসার কারণ কি বল।

মিসেস্ রায়। কারণ আর কিছুই না। বর্ত্তমানে আমি অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থায় পড়েছি, আমার কিছু টাকার প্রয়োজন।

বারিদবরণ। তোমাকে যথেষ্ট টাকা আমি দিয়েছিলাম। নিজের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে সে সব টাকা তুমি নষ্ট করেছ। আর এক পয়সাও তুমি আমার কাছে পাবে না।

মিসেস্ রায়। আমাকে সর্ব্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে এখন আমার ভরণপোষণ চালাতে অস্বীকার করা তোমার মত বীরপুরুষেরই শোভা পায়। ভদ্রঘরের বালবিধবা আমি। কোন কিছুর অভাব ছিল না আমার। কুক্ষণে আমার দেওরের সঙ্গে আমাদের বাড়ী তুমি এসেছিলে। কুক্ষণে তোমার প্রলোভনে আমি ভুলেছিলাম, তা না হ'লে ভদ্রঘরের বউ আমি, নিজের শ্বশুরবাড়ীতে সম্মানে থাক্‌তে পার্‌তাম।

বারিদবরণ। মিথ্যা কতগুলি বাজে কথা বলে পাপ বাড়িও না লতিকা। আমি তোমাকে প্রলোভিত করেছিলাম, না তুমি আমাকে প্রলোভিত করেছিলে নানা রকমে! অবশ্য আমারও দোষ হয়েছিল। তোমার প্রলোভনে উত্তেজিত হয়ে তোমাকে ঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে আসা আমার উচিত হয় নি। তবু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি তোমাকে নিয়ে ঘর কর্‌তে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখ্‌লাম তুমি একজনকে নিয়ে সুখী নও। তোমাকে ডাক্তারী পড়ালাম—যাতে ভবিষ্যতে বিপদে পড়্‌লে তুমি স্বাধীনভাবে চালাতে পার নিজেকে। সর্ব্ববিষয়ে তোমাকে আমি স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। কিন্তু ভদ্রভাবে থাক্‌তে তুমি রাজী হলে না। দেখ্‌লাম উচ্ছৃঙ্খলতায় তুমি পশুর মত হয়ে উঠ্‌লে। তখনই আমি তোমাকে পরিত্যাগ কর্‌লাম। তাও আমি তোমার প্রতি অবিচার করি নি। তোমাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলাম—আর এও তোমাকে বলেছিলাম, ভবিষ্যতে তুমি আর এক পয়সাও আমার কাছ থেকে পাবে না।

মিসেস্ রায়। আমি আমার দোষ স্বীকার কর্‌ছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এসো না—আবার আগের মত আমরা একসঙ্গে থাকি ?

বারিদবরণ। না, সে হতে পারে না।

মিসেস্ রায়। কারণ ?

বারিদবরণ। নানা কারণ আছে—সব তোমাকে আমি বল্‌তে চাই না। তবে প্রধান কারণ এই যে, তোমার মত বদ স্ত্রীলোকের সঙ্গ আমি অতি ঘৃণ্য মনে করি।

মিসেস্ রায়। ওসব নীতিকথা তোমার মত চরিত্রহীন লম্পটের···

দরজা ঠেলিয়া অমিতার প্রবেশ। মিসেস্ রায় থামিয়া গেলেন। অমিতা মিসেস্ রায়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসু-ভাবে বারিদের দিকে চাহিল

বারিদবরণ। কোথায় গিয়েছিলে অমিতা ?

অমিতা। এই একটু সিনেমায় গিয়েছিলাম।

বারিদবরণ। আচ্ছা তুমি এখন যাও। আমি এঁর সঙ্গে একটু গোপনীয় আলোচনায় ব্যস্ত আছি।

অমিতার প্রস্থান

মিসেস্ রায়। এতক্ষণে বুঝ্‌লাম কেন আমাকে রাখ্‌তে রাজী নও। বয়স হয়ে গেছে, আমার ভেতর আর আছে কি ? এদিকে নূতন নাগরিকাটি পূর্ণ-যৌবনা, টানা টানা চোখ, রসে ভরপুর। তা একে কোথা থেকে জোটালে ? যাক্, আমি তোমার আমোদ নষ্ট কর্‌তে চাই না। আমি চলে যাই। তারপর তুমি যত ইচ্ছা আমোদ ক'র।

এতক্ষণ বারিদবরণ কট্‌মট্ করিয়া মিসেস্ রায়ের দিকে চাহিয়াছিলেন। মিসেস্ রায় ক্রমশই যেন নিজশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছেন এবং দুর্ব্বল বোধ করিতেছেন

টাকা না পেলে আমি কিছুতেই যাব না এবং তোমার নাগরিকাটিকে বলে দেব আমার তুমি কি দশা করছ।

বারিদবরণ। চুপ্ কর।

কিছুক্ষণ কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। মিসেস্ রায় নিজের সমস্ত শক্তি হারাইয়া ফেলিলেন। বারিদবরণ ধীরে ধীরে তাঁহার চোখের কাছে হাত নাড়িতে লাগিলেন। সমস্ত সময় তাঁহার চক্ষু মিসেস্ রায়ের চক্ষুর উপর নিবদ্ধ।

যাক্ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু কর্‌তে পার্‌বে না—Completely hypnotised.

উঠিয়া ভিতরের দরজাটা আটকাইয়া দিয়া আসিলেন। মিসেস্ রায় মড়ার মত বসিয়া—দেহ যেন প্রাণহীন। চোখে যেন দৃষ্টিশক্তি নাই। তাহার পর বারিদবরণ মিসেস্ রায়ের কাছে আসিয়া কহিলেন—

লতিকা, তুমি আমার কাছে কি জন্য এসেছিলে ?

মিসেস্ রায়। (যেন কোন যন্ত্রের ভিতর হইতে উত্তর আসিতেছে) তোমাকে চাপ দিয়ে কিছু টাকা আদায় কর্‌তে।

বারিদবরণ। তোমার কি সত্যিই টাকার দরকার ?

মিসেস্ রায়। হ্যাঁ, বর্ত্তমানে ভয়ানক অর্থকষ্ট পাচ্ছি।

বারিদবরণ। কত টাকা হ'লে তোমার চলে ?

মিসেস্ রায়। হাজার টাকা হ'লেই চ'লে যাবে।

বারিদবরণ উঠিয়া আলমারি হইতে দুই হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া মিসেস্ রায়ের হ্যাণ্ড্‌ব্যাগে পুরিয়া দিলেন।

বারিদবরণ। (লতিকার দিকে ক্ষণকাল কঠোরভাবে

চাহিয়া) লতিকা, আমার কথার উপর কথা বলার সাহস আছে তোমার ?

মিসেস্ রায়। না।

বারিদবরণ। (দৃঢ়স্বরে) আমি বল্‌ছি, তোমার গত জীবনের কথা মনে কর্‌বার শক্তি তোমার নেই। আমি কে, আমার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ছিল তুমি ভুলে গেছ। বল ত দেখি তোমার গত জীবনের কথা।

মিসেস্ রায়। কিছুই মনে কর্‌তে পার্‌ছি না।

বারিদবরণ। আমি বল্‌ছি বাড়ী ফিরে তোমার এই বিহ্বলভাব কেটে যাবে। কিন্তু পূর্ব্বস্মৃতি তোমার লোপ পাবে। এখন তুমি আস্তে আস্তে বাড়ী চলে যাও।

ধীরে ধীরে মিসেস্ রায়ের প্রস্থান

মূর্খ স্ত্রীলোক, তুমি এসেছিলে বারিদবরণের সঙ্গে খেলা কর্‌তে, সমুচিত শাস্তি সেই জন্য তোমায় দিতে হ'ল। কিন্তু অমিতা ওকে দেখে কি মনে কর্‌ল! যাক্, সে একটা কিছু বুঝিয়ে দেওয়া যাবে। অমিতা আমার নাগরিকা—হাঃ, হাঃ, হাঃ, পূর্ণযৌবনা, টানা টানা চোখ, সুন্দর দেহের গড়ন, মন্দ কি! ওকে বিয়ে করে জীবনে কটা দিন সুখ ক'রে নিলেই বা ক্ষতি কি? (হঠাৎ সচকিত হইয়া) না, না, না—এ আমি কি ভাব্‌ছি! বন্ধু-কন্যা, মেয়ের মত যাকে পালন করেছি এতদিন—যাক্, দূর হোক্ যত বাজে চিন্তা।

যবনিকা পতন

তৃতীয় অঙ্ক

বারিদবরণের বাড়ীর ড্রয়িং রুম। বারিদ, অসীম, অতনু ও অমিতা। সকলে চা পানে রত

অতনু। খুবই আনন্দিত হলাম আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্যলাভ ক'রে।

অমিতা। আমরাও কম আনন্দিত হইনি আপনার সঙ্গে আলাপে। আপনার বন্ধু ত প্রতি কথায় একবার আপনার কথা উল্লেখ কর্‌বেনই।

অতনু। আপনাদের কথাও ইদানীং আমার বন্ধুর কাছে প্রায়ই শুন্‌তাম। যে অসীম কোন মেয়েকেই আমল দিত না, যার প্রতি কথায় মেয়েদের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাবই দেখা যেত বরাবর, সেও যখন আপনার গুণগানে মুখর হয়ে উঠ্‌ল, তখন ভাব্‌লাম, দেখ্‌তে হবে এ মেয়েটিকে। তা দেখ্‌লাম সত্যিই আপনি একটি রত্ন।

অমিতা ও অসীমের একবার চোখাচোখি হইল—দুজনেই লজ্জিত হইয়া চোখ নামাইল। হঠাৎ যেন বারিদবরণের চোখের ভাব কঠোর হইল—আবার সেই মুহূর্ত্তে কঠোরভাব দূর হইয়া তাঁহার মুখে এক অপূর্ব্ব করুণ ভাবে ভরিয়া গেল।

বারিদ। আমার অমিতাকে এ পর্য্যন্ত যে দেখেছে সেই প্রশংসা না করে পারে নি। (একটু যেন স্নেহের ভাবে) বিশেষ অসীমের কথা ছেড়েই দিন। অমিতার সঙ্গে অসীমের বন্ধুত্ব যদিও অল্প দিনের, কিন্তু দেখ্‌লে মনে হয় যেন কতকালের পরিচিত এরা।

অতনু। আপনার অদ্ভুত শক্তির কথাও প্রায়ই শুনি অসীমের মুখে। আপনার ইচ্ছাশক্তির কথা, স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে আপনার প্রগাঢ় জ্ঞানের কথা। আচ্ছা বারিদবাবু, আপনি স্পিরিট এনেছেন কখনও?

বারিদ। এ সব বিষয় আপনি বিশ্বাস করেন?

অসীম। অতনুর মত হচ্ছে, না প্রমাণ পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুই বিশ্বাস কর্‌বে না—তবে কেউ যদি প্রমাণ দিতে পারে এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, তবে বিশ্বাস কর্‌তে কোন আপত্তি নেই।

বারিদ। অতনুবাবু, একটা কথা আপনাকে বলি। ক্ষুদ্র মানবের জ্ঞানবুদ্ধি কতটুকু? আজ যা অসম্ভব মনে হয়, কাল দেখ্‌বেন তা যেন জলের মত সহজ। অনেক বিষয়ের অস্তিত্ব বিজ্ঞানকেও প্রমাণ অভাবে প্রথম প্রথম অস্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে—তারপর আস্তে আস্তে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এ সব বিষয়ে যদি প্রমাণ না পাওয়ার দরুণ তাদের অস্তিত্ব স্বীকার না করা হ'ত, তবে বিজ্ঞান সমর্থ হ'ত না এদের প্রমাণ কর্‌তে। আমার এসব কথা আপনার মনে লাগ্‌বে না জানি। ভবিষ্যতে যদি সুযোগ পাই, আপনাকে দেখিয়ে দেব কত কিছু অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায় যা বর্ত্তমানে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর।

অতনু। তা যদি দেখাতে পারেন আমিও তাতে কম আনন্দিত হ'ব না। আশা করি, শীগ্‌গির সে সুযোগ

আস্‌বে। আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি, আমাদের আবার আর এক বন্ধুর বাড়ী যেতে হবে।

অমিতা। (অসীমের প্রতি) আপনিও যাবেন নাকি এখনই ওঁর সঙ্গে?

অসীম। হ্যাঁ, আমাদের দুজনেরই ওখানে রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ।

বারিদ। আমার ইচ্ছা আপনারা দুজনে একদিন আমার এখানেও রাত্রে আহার করেন'।

অতনু। তাতে আর আপত্তি কি? একদিন কেন—যে কয়দিন বল্‌বেন সন্তুষ্টচিত্তে সে কয়দিনই আস্‌ব—এ আর এমন কথা কি?

অসীম। আচ্ছা, আজ তা হ'লে আমরা যাই।

নমস্কার বিনিময় অসীম ও অতনুর প্রস্থান। অমিতা উভয়কে দ্বার পর্য্যন্ত দিয়া ফিরিয়া আসিল। বারিদ এই সময়টা চিন্তামগ্নচিত্তে বসিয়া ছিল।

বারিদ। (অমিতার পুনঃপ্রবেশে সচকিত হইয়া) ওঁরা চলে গেলেন, না অমিতা? আচ্ছা অমিতা, তোমার এখন বিয়ে দেওয়া দরকার, না? (অমিতা মুখ নামাইল) তোমার বাবা আর আমি বাল্যবন্ধু ছিলাম। ইণ্টারমিডিয়েট্ পাশের পর তোমার বাবা ডাক্তারি পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, আর আমি গেলাম জেনার্‌ল্ লাইনে। ডাক্তারী পাশের পর তোমার বাবা এলাহাবাদে গিয়ে প্রাকটিশ সুরু করেন। বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ এবং চিঠিপত্র বন্ধ ছিল দুজনের মধ্যে। এলাহাবাদেই তোমার জন্ম। ওখানেই তোমার মা মারা যান, না?

অমিতা। হ্যাঁ, আমার বছর চার-পাঁচ বয়সের সময়ে আমার মা মারা যান। সেকথা আমার এখনও মনে আছে।

বারিদবরণ। হঠাৎ একদিন এক চিঠি পেলাম তোমার বাবার কাছ থেকে—'আমি কল্‌কাতায় এসেছি। অত্যন্ত অসুস্থ, বোধ হয় বাঁচব না। অত্যন্ত জরুরি একটি কাজের জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করা দরকার। অবশ্য আস্‌বে।' তক্ষুণি গেলাম তোমাদের বাড়ী। সত্যিই দেখ্‌লাম তোমার বাবা যক্ষ্মারোগে মরণাপন্ন। তোমার তখন বয়স বোধ হয় সাত-আট বছর।

অমিতা। না, তখন আমার বয়স ছিল ঠিক দশ বছর। সে দুর্দ্দিনের কথা মনে হ'লে এখনও শিউরে উঠি। আমার ভার কার ওপর দিয়ে যাবেন এই চিন্তাই বাবাকে তখন তাঁর রোগের থেকে বেশী যন্ত্রণা দিচ্ছিল। সে সময়ে আপনি এসে পড়াতে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। মারা যাবার আগের দিন বাবা বলেছিলেন, বারিদ আমার নিজের ভাইয়ের থেকেও বেশী। ওর ওপর তোমার ভার দিয়ে আমি যেন স্বস্তি পেলাম। ঠিক আমার মতই দেখো ওকে।

বারিদ। (এই কথা শুনিয়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন)—তোমার ভরণপোষণ এবং শিক্ষার জন্য যথেষ্ট টাকা তোমার বাবা আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল তোমার যেন একটি সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়। সকলেই তোমার শিক্ষার প্রশংসা করে। বাকী আর একটি কাজ ছিল—একটি সৎপাত্র দেখে তার হাতে তোমাকে সম্প্রদান করা। তা এতদিনে ভগবানের কৃপায় তাও বোধ হয় জুটে গেল। মনে কর্‌ছি, অসীম সব দিক থেকেই তোমার যোগ্যপাত্র। তুমিও অসীমকে মনে মনে ভালবাস, না অমিতা?

অমিতা মুখ নীচু করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না

বারিদ। বুঝেছি মা। যাক্ এ কাজটা হ'লেই আমার ছুটি—আমি নিশ্চিন্ত, সমস্ত ভার থেকে আমি মুক্ত।

অমিতা। কেন, আমি কি আপনার ভারস্বরূপ হয়ে উঠেছি কাকাবাবু?

বারিদ। হাঃ, হাঃ, হাঃ—তুই আমার ভার অমিতা? ওটা একটা কথার কথা বল্‌ছিলাম। তুই ত জানিস্ মা, তোকে ছেড়ে দিতে কত কষ্ট আমার। তবু কর্ত্তব্য কর্‌তে হবে।

অমিতা। আমি জানি কাকাবাবু, আপনি আমাকে কত ভালবাসেন।

বারিদ। আচ্ছা মা, দেখা যাবে বিয়ের পর কাকাবাবুকে কতখানি মনে থাকে। তুমি এবার তোমার ঘরে যাও, আমি এখন একটু একলা থাক্‌ব।

অমিতার প্রস্থান

শিশুর মত মন! মনে করে আমি ওকে মেয়ের মত দেখি। তা যদি হতে পারত সে যেন হ'ত স্বর্গীয়। তা ত কই পারি না। ওর সুন্দর দেহের আকর্ষণে আমি যেন ক্রমশ পাগল হয়ে উঠ্‌ছি; আমার মধ্যেকার সুপ্ত পশু জাগ্রত

হয়ে উঠেছে। তাকে যেন কিছুতেই বশে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। না—কিছুতেই না—বন্ধুর অপমান আমি কর্‌ব না, যেমন ক'রে হোক্ নিজেকে দমন কর্‌ব। যত শীঘ্র পারি ওই অসীমের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওকে চোখের থেকে দূরে সরিয়ে দেব। কাছে কাছে থাক্‌লে আর বেশীদিন নিজের পশুত্বকে চেপে রাখ্‌তে পার্‌বো না।

যবনিকা পতন

চতুর্থ অঙ্ক

তিন মাসের কিছু পরের ঘটনা। অতনুর বাড়ী—রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে সকলে ড্রয়িং রুমে বসিয়া ধূমপান এবং গল্প করিয়া সময় কাটাইতেছে। অতনু, যূথিকা ও অসীম

যূথিকা। তারপর অসীমবাবু, আগে ত বিয়ের নামে নাক কোঁচকাতেন। আজকাল এ বিষয়ে মত নিশ্চয়ই বদলেছেন!

অসীম। বিয়ের সময়ে ভেবেছিলাম হয় ত মত সত্যিই বদলাবে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই দেখ্‌ছি কি ভুলই করে বসেছি।

যূথিকা। কেন, দাম্পত্য কলহ চল্‌ছে বুঝি বর্ত্তমানে? তা আজকার সন্ধ্যাটা কিন্তু বেশ কাট্‌ল। এই সঙ্গে অমিতাও যদি থাক্‌ত আনন্দ লাগত আমাদের।

অতনু। সত্যিই অসীম, কি এমন দরকার পড়্‌ল অমিতার? আমি এত ক'রে ব'লে এলাম—

অসীম। তবে সব বলি শোন অতনু। এতক্ষণ প্রকৃত কারণ কিছুই বলিনি। তা শুন্‌লে তোমরা ব্যথা পাবে বলে। অতনু, বিয়ে কর্‌বার সময়ে ভেবেছিলাম কি সুখেই ভবিষ্যত জীবন কাটাব। মাত্র কয়েকদিনের পথের আলাপে সম্পূর্ণ অচেনা অমিতাকে ভাল ক'রে না জেনেই বিয়ে ক'রে যে হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছি, তার ফল এখন হাতে হাতে পাচ্ছি। বারিদবাবুর আচরণ তখনই আমার কেমন রহস্যময় লেগেছিল। ক্রমশ অমিতাও যেন আমার কাছে হয়ে উঠ্‌ছে একেবারে রহস্যে ভরা।

অতনু। তুমিও বোধ হয় সেই ছোঁয়াচ পেয়েছ। তোমার কথাবার্ত্তাগুলিও ত আমার কম রহস্যময় মনে হচ্ছে না। সব কথা পরিষ্কার ক'রে বল দেখি।

অসীম। বিয়ের পর মাস তিনেক বেশ সুখেই কাটিয়েছিলাম। কিন্তু তার পর থেকেই যেন অমিতা কি রকম বদলে যাচ্ছে। আমাকে যেন আজকাল সইতে পারে না। সব সময়ে আমাকে এড়িয়ে চল্‌তে পার্‌লেই যেন সুখী হয়। সদাই একটা বিহ্বল ভাব। ও যেন নিজের মধ্যেই নেই। ওকে যেন অন্য কেউ চালাচ্ছে। যখন তখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। কোথায় যায় জিজ্ঞাসা কর্‌লে কিছুই উত্তর দেয় না। যেন ওসব প্রশ্নে ভয়ানক বিরক্ত হয়। আমিও আজকাল সেজন্য ওকে কখনও কিছু প্রশ্ন করি না ওর গতিবিধি সম্বন্ধে। এক দিন রাত বারোটার সময়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখি বিছানায় অমিতা নেই। ভাব্‌লাম হয় ত বাথরুমে গেছে। মিনিট পনের গেল তবুও আসে না। উঠে সমস্ত বাড়ী খুঁজে দেখ্‌লাম—কোথাও নেই। ভয়ানক চিন্তিত হয়ে উঠ্‌লাম। আলো জ্বেলে বসে বসে ভাবতে লাগ্‌লাম কি করা যায়। সমস্ত দিন কলেজে লেক্‌চার দেবার পর কি রকম পরিশ্রম হয় বুঝতেই পার। কখন ঝিমোতে আরম্ভ করেছি। হঠাৎ 'খট্' ক'রে একটা আওয়াজ হওয়ায় চোখ চেয়ে দেখি অমিতা এসেছে। একটু বিরক্তভাবে বল্‌লাম—এত রাত্রে না বলে কোথায় গিয়েছিলে? বলে গেলে ত এসব হাঙ্গামো হয় না। কিন্তু ওর কানে যেন আমার কথা ঢুক্‌ল না। আমাকে যেন ও তখন চিন্‌তেই পার্‌ছে না এমন ভাব কর্‌ল।

যূথিকা। বলেন কি? তারপর কি হ'ল?

অসীম। তারপর আলো নিভিয়ে দুজনেই শুয়ে পড়্‌লাম। হঠাৎ খানিকক্ষণ পরে জেগে উঠে দেখি অমিতা বালিশে মুখ চেপে গুঙ্গিয়ে গুঙ্গিয়ে কাঁদছে। উঠে বসে কোলের উপর তার মাথাটা নিয়ে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লাম কি হয়েছে বল অমিতা। অনেকক্ষণ এভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌বার পর বল্‌ল—কে যেন আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সব কাজ করাচ্ছে। আমি যেন নিজের সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেল্‌ছি। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, তোমার কি হয়েছে খুলে বল, আমি সব ঠিক ক'রে দেব। তারপর বল্‌লাম—আজ এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে অমিতা?

অতনু। কি বললে?

অসীম। বল্‌লো—কিছুই আমার মনে নেই। তবে

কে যেন আমাকে মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে টানে, তখন আমার কোনই শক্তি থাকে না। আমার মনে হয়, কারা যেন আমার এবং তোমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা কর্‌ছে। তা থেকে রক্ষা পাবার শক্তি তোমার-আমার কারুরই নেই।

যূথিকা। কিছুই স্মরণ কর্‌তে পার্‌ল না অমিতা?

অসীম। না।

অতনু। পরদিন সকালে জিজ্ঞাসা কর্‌লে না কেন, কিছু মনে পড়ে কি-না?

অসীম। পরদিন এমন ভাব কর্‌ল যেন রাত্রে আমার সঙ্গে ওর কোন কথাই হয় নি। একটু বেশ রুক্ষ আচরণ কর্‌ল, আমিও তাতে বিরক্ত হয়ে আর কিছু বল্‌লাম না।

অতনু। এতে মান-অভিমানের স্থান নেই অসীম। বেশ বোঝা যাচ্ছে, তোমার স্ত্রী এমন কোন বিপদে পড়েছেন যা পরিষ্কারভাবে বল্‌বার শক্তি বা সাহস তাঁর নেই। তোমাকেই খুঁজে বের কর্‌তে হবে এর প্রকৃত কারণ। এবার থেকে রাত্রে একটু সজাগ থেকো। তোমার স্ত্রী যদি আবার রাত্রে বাইরে যান কোন দিন, নিঃশব্দে তাঁর অনুসরণ ক'রে দেখে আস্‌বে প্রকৃত ব্যাপার কি। তারপর যথোচিত প্রতিবিধান কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে।

অসীম। তাতে কোন ফল হবে বলে তোমার মনে হয়?

অতনু। নিশ্চয়—এক্ষেত্রে সেই হচ্ছে ঠিক পথ।

অসীম। অনেক রাত হ'ল—আজ তা হ'লে উঠি।

অতনু। চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

যবনিকা পতন

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাত বারোটা। বারিদবরণের পড়িবার ঘর। নীল আলোকে ঘর আলোকিত—চারিদিকে একটু ভয়াবহ আবহাওয়া। বারিদবরণ চেয়ারে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

বারিদবরণ। (চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—টেবিলের উপরের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া) রাত বারোটা। এইবার ঠিক সময় হয়েছে। সমস্ত পৃথিবী এখন নিদ্রামগ্ন। অমিতা হয় ত এখন সুখে স্বামীর পাশে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। কি অদ্ভুত শক্তি এই মেয়েটার। প্রায় মাস চারেক ধরে চেষ্টা কর্‌ছি এখনও সম্পূর্ণভাবে আমার ইচ্ছার বশীভূত কর্‌তে পার্‌ছি না। আগে ত কাউকে এতদিন লাগেনি আমার মুঠার মধ্যে আন্‌তে। এদিকে আমিও যেন আর পার্‌ছি না। আমার সমস্ত শক্তি যেন ক্ষয় হয়ে এসেছে। সব সময়েই যেন একটা ভীষণ ক্লান্তি অনুভব কর্‌ছি। যাক্, কাজ আরম্ভ করা যাক্। (খানিকক্ষণ ধ্যানমগ্নের মত চুপ করিয়া রহিলেন—তারপর অস্ফুটভাবে বলিতে লাগিলেন) অমিতা, তুমি যেখানে যে অবস্থায়ই থাকো, আস্তে আস্তে উঠে আমার এখানে চলে এসো। জগতে কারো সাধ্য নেই তোমায় বাধা দেয়। তোমার ইচ্ছা না থাক্‌লেও তোমাকে আসতেই হবে।···কিন্তু আজ এত দুর্ব্বল লাগ্‌ছে কেন? যেন একটা ভয় আস্‌ছে প্রাণে—যাক্, ওসব কিছু না। অমিতা, বারিদবরণের ডাক উপেক্ষা কর্‌বে এমন শক্তি তোমার নেই। (সামনের দিকে দুই হাত দোলাইয়া ডাকিতে লাগিলেন) এসো—এসো—এসো···

যবনিকা পতন

দ্বিতীয় দৃশ্য

অতনুর বাড়ী। রাত বারোটার কিছু বেশী। ড্রয়িংরুমে অতনু এবং অসীম।

অতনু। এই রাত্রে এরকম বিহ্বলভাবে হঠাৎ? কি ব্যাপার বল ত?

অসীম। অতনু, কি যে ব্যাপার আমি কিছুই বুঝছি না। আজ রাত্রে হঠাৎ দেখি অমিতা আবার কোথায় বেরোচ্ছে। কিছু না বলে আমিও নিঃশব্দে তার অনুসরণ কর্‌লাম। দেখি অমিতা এসে থামল বারিদবাবুর বাড়ী। এত রাত্রে বারিদবাবুর বাড়ীতে কি প্রয়োজন থাক্‌তে পারে? কি করা যায়, কিছুই ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌লাম না। তারপর স্থির কর্‌লাম, তোমার কাছে এসে পরামর্শ ক'রে যথাকর্ত্তব্য ঠিক করা যাবে।

অতনু। দেখ অসীম, প্রথম দিন থেকেই তোমার ঐ বারিদবরণটিকে আমার কেমন-কেমন লেগেছে। ওর ওই রহস্যপূর্ণ ভাব আমি প্রথম থেকেই সন্দেহ ক'রে এসেছি। এখন যেন আমার মনে হচ্ছে, বারিদবরণই অমিতার এই

অবস্থার জন্য দায়ী। লোকটা হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌ জানে। আমার মনে হচ্ছে ও অমিতাকে হিপ্‌নোটাইজ করে।

অসীম। কি উদ্দেশ্য নিয়ে ও কাজ করছেন উনি? কি স্বার্থ থাক্‌তে পারে এতে ওঁর?

অতনু। তা এখন পর্য্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। চল দুজনে যাই বারিদবরণের বাড়ী এবং সেই কথাটাই পরিষ্কার ক'রে ফেল্‌ব। কত বড় শক্তিশালী এই বারিদবরণ আজ একবার দেখে নেব।

অসীম। আজ এই রাত্রেই যাবে?

অতনু। আজ না গেলে আর সহজে হাতে হাতে ধর্‌তে পারব না।

যবনিকা পতন

তৃতীয় দৃশ্য

বারিদবরণের বাড়ী

বারিদবরণের পড়বার ঘর, নীল আলোকে ঘর আলোকিত। দুটি চেয়ারে মুখোমুখি বারিদবরণ এবং অমিতা বসিয়া। অমিতা যেন আত্মচেতনাহীন। তীক্ষ্ণভাবে বারিদবরণ অমিতাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেন

বারিদবরণ। অমিতা, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করবার তোমার সাহস আছে?

অমিতা। (যেন কলের ভিতর হইতে শব্দ আসিতেছে) না।

বারিদবরণ। আমাকে তুমি চিন্‌তে পার্‌ছ?

অমিতা। আপনি কাকাবাবু।

বারিদবরণ। তুমি কি বিবাহিত জীবনে সুখী?

অমিতা। হ্যাঁ, খুব সুখী।

বারিদবরণ। তুমি অসীমকে ভালবাস?

অমিতা। ভালবাসি।

বারিদবরণ। শোন অমিতা, তোমাকে মেয়ের মত পালন করেছিলাম কিন্তু তোমার দেহে যৌবন আসার সঙ্গে সঙ্গে আমারও প্রাণে জেগে উঠ্‌ল অতৃপ্ত ক্ষুধার আগুন। নিজেকে অনেক বোঝালাম—যাকে মেয়ের মত দেখে এসেছি তার সম্বন্ধে এরূপ কল্পনাও পাপ। কিন্তু আমার ভিতরকার পুরুষ এ কথায় সায় দিলে না। সে চাইল তোমার ভিতরকার নারীকে পেতে। নিজেকেই নিজে অনেক বোঝালাম। শেষে ভাব্‌লাম, তোমাকে দূরে সরিয়ে দিলেই এভাব কেটে যাবে। তাই তোমার বিয়ে দিলাম। কিন্তু দেখ্‌লাম তাতেও শান্তি পেলাম না। (স্বগত) কিন্তু উঃ, সমস্ত দেহে এ কি জ্বালা অনুভব করছি! মনে হচ্ছে যেন আজই আমার শেষ দিন উপস্থিত। (অনেক কষ্টে নিজেকে যেন আবার স্থির করিয়া লইলেন) যাক্‌ সে কথা। শোন অমিতা, তোমাকে আমি ভালবাসি। ইচ্ছায় হোক্‌ অনিচ্ছায় হোক্‌, তোমারও আমাকে ভালবাস্‌তে হবে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার শক্তি তোমার নেই। তোমাকে নিয়ে আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাব দূরে—বহু দূরে। সেখানে গিয়ে তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধব নূতন ক'রে। বুঝেছ? তোমাকে যেতে হবে অনেক দূরে আমার সঙ্গে।

অমিতা। বুঝেছি, যাব আপনার সঙ্গে অনেক দূরে।

বারিদবরণ। কিন্তু এ কি জ্বালা! সমস্ত দেহ যেন পুড়ে যাচ্ছে!

কে দরজায় ধাক্কা দিল

বারিদবরণ। কে? কে এত রাত্রে দরজায় ধাক্কা দেয়? না—না—আমারই ভুল—আমারি ভুল। কে আবার আসবে এত রাত্রে!

আবার দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ

না, সত্যিই ত কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে—তবে কি ...

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া একেবারে অসীম এবং অতনুর সম্মুখে পড়িলেন। ভয়ে তাঁর মুখ নীল হইয়া গেল। সমস্ত দেহ যেন উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিল

বারিদবরণ। এত রাত্রে কি প্রয়োজন এখানে?

অতনু। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা আসিনি। আমরা জান্‌তে চাই, কিসের জন্যে এত রাত্রে অমিতাকে এখানে এনেছেন?

বারিদবরণ। তোমার কাছে সে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই। এক্ষুনি এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার বাড়ী থেকে দূর হও। তা না হ'লে যোগ্য শাস্তি পাবে।

অতনু। সাবধান বারিদবরণ, আমাকে ভয় দেখাতে এসো না। আমি দুর্ব্বলচিত্ত কাপুরুষ নই যে, আমাকে

চোখ রাঙিয়ে যা বল্‌বে তাই কর্‌ব তোমার পোষা কুকুরের মত। শোন, অমিতা কোথায় আছে শীগ্‌গির তাকে এনে দাও···যাও···

বারিদবরণ বাহিরের দিকে হাত দেখাইয়া বাহির হইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিয়া গেলেন। দুই বার প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন দম লইবার, তাহার পর টলিয়া পড়িলেন

অসীম। (ব্যস্ত হইয়া) এ কি ব্যাপার? (বারিদের দেহের কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া) অতনু, He is dead!

অতনু। ক্ষমতার অতিরিক্ত শক্তি দেখাতে গেলে হিপ্‌নোটিষ্টের পরিণাম অনেক সময়েই এরকম হয়।

শয়তানের সাজা একেই বলে। চল, এখন অমিতাকে দেখি গিয়ে···

উভয়ে ঘরে ঢুকিল। অমিতার বিহ্বল ভাব যেন আস্তে আস্তে কাটিয়া আসিতেছে। অসীম অমিতার কাছে গেল। অমিতা চোখ খুলিয়া অসীমের দিকে চাহিল। আস্তে আস্তে ভোরের আলো ঘরে ঢুকিতেছে। অমিতা অবাক্‌ হইয়া চারিদিকে চাহিল। তারপর একবার অতনুর দিকে চাহিয়া অসীমকে জিজ্ঞাসা করিল

অমিতা। এ কি? আমি কোথায়?

অসীম। এতক্ষণ বোধ হয় নরকেই ছিলে। চল, এবার বাড়ী যাই। চল অতনু···

যবনিকা পতন

পদ্মবন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

(মাঠের পথে যাইতে দেখিলাম দীঘীটি একেবারে পদ্মবনে পরিণত হইয়াছে। শোভায় ও গন্ধে মুগ্ধ হইলাম)

১

দীঘিভরা কমনীয় পদ্মের বন—
অধিকার করে নিল মোর সারা মন।
পত্রের কি বাহার!
শুকোদর সুকুমার!
নিবিড় শোভায় একি শিবির রচন।

২

মিলিল—সহসা শুভ যাত্রার ফল—
আমার নয়নে শত নয়ন কমল।
ভ্রমর বাঁধিছে চাক্‌
পাখীদের হাঁক ডাক
এত বড় উৎসব দেখা যে বিরল।

৩

জীবনে পেলাম এক স্মরণীয় ক্ষণ
মরু মাঝে সুমেরুর সোনার স্বপন।
বলে কে হতশ্রী—?
অতিথি কমলাগৃহে,—
দেবতার দৃষ্টিতে—তিলেক যাপন!

৪

শোভার সায়রে একি মরকত দ্বীপ!
শেষ পুণ্যেতে হৃত খণ্ড ত্রিদিব।
যেন সাধকের হৃদি
ধন্য করিছে ক্ষিতি,
মুকুলিত ভালবাসা মূর্ত্ত সজীব।

৫

পলকের প্রীতি বুকে রেখে গেল দাগ
মনকে রঙায়ে দিল পদ্ম পরাগ।
আছে আর কি অভাব
সরোজ স্বরাজ লাভ,
পদ্মরাগের খনি আমারি বেবাক।

৬

কমল কানন পানে চাই যতবার
কমলে কামিনী রাজে যেন মাঝে তার।
যেথা শোভা আছে যত
চরণেতে হয় নত
পদ্ম বাড়ায় পাদপদ্ম বাহার।

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

মধ্যমা জাতি

এই জাতিতে গান্ধার ও নিষাদ ভিন্ন অপর পাঁচটি (স রি ম প ধ) স্বরের যে কোন একটি অংশ ও গ্রহস্বর হইতে পারে। এই জাতিতে ষড়জ ও মধ্যম স্বরের বহুল প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহাতে গান্ধারের ব্যবহার অল্প, এই জাতি গান্ধার লোপে ষাড়ব এবং নিষাদ ও গান্ধারের লোপে ঔড়ুব হইয়া থাকে। ইহার কলা আটটি, প্রত্যেকটি কলায় পূর্ব্বোক্তরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করিতে হয়। মূর্চ্ছনা ঋষভাদি তাল চঞ্চৎপুট। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ধ্রুবা গানরূপে ইহা প্রযুক্ত হয়। মধ্যম ইহার ন্যাসস্বর। যখন যেটি অংশ স্বর হয় সেই স্বরটিই তখন অপন্যাস স্বরও হইয়া থাকে। এই জাতির গান কালে শুদ্ধ ষাড়ব, দেশী ও আন্ধালী এই সদৃশ রাগগুলির ছায়া-পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এই জাতির প্রস্তার লিখিত হইতেছে—

এই জাতির ও কলা সমূহে অষ্ট লঘু যোজনা পূর্ব্বের ন্যায়ই করিতে হইবে, যথা—

প্রথম কলায়—মা ১+মা ১+মা ১+মা+পা ১+মিলিত ধনি ১+নী ১+মিলিত ধপ ১=৮, এইরূপে অষ্ট লঘু যোজিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কলায়—অষ্ট লঘু প্রয়োগ নিম্নলিখিতরূপে করা হইয়াছে। মা ১+মিলিত পম ১ মা+সা ১+মা ১+গা ১+রী ১+রী ১=৮।

তৃতীয় কলায়—নিম্নলিখিতরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে—১+মা মা ১+মিলিত রিম ১+মিলিত গম ১+মা ১+মা ১+মা ১+মা ১=৮।

মধ্যমা জাতির প্রস্তার

মা	মা	মা	মা	পা	ধনি	নী	ধপ	১
পা	০	০	তু	ভ	ব০	মূ	০০	
মা	পম	মা	সা	মা	গা	রী	রী	২
র্দ্ধ	জা০	০	০	ন	নং	০	০	
পা	মা	রিম	গম	মা	মা	মা	মা	৩
কি	রী	ট০	০০	০	০	০	০	
মা	নিধ	নিস	নিধ	পম	পধ	মা	মা	৪
ম	ণি০	দ০	০০	র্প০	০০	ণং	০	
নী	নী	রী	রী	নী	রী	রী	পা	৫
গৌ	০	রী	০	ক	র	প	০	
নী	মপ	মা	মা	সা	সা	সা	সা	৬
ল্ল	ব্যাং০	০	০	গু	লি	০	স্থ	
গা	নী	র্সা	র্গা	ধপ	সা	ধনি	র্সা	৭
তে	০	০	০	০০	০	জি০	তং	
পা	র্সা	পা	নিধপ	মা	মা	মা	মা	৮
সু	কি	র	০০০	ণং	০	০	০	

চতুর্থ কলায়—মা ১+মিলিত নিধ ১+মিলিত নিস ১+মিলিত নিধ ১+মিলিত পম ১+মিলিত পধ ১+মা ১+মা ১+মা ১=৮ এইরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করিতে হইবে।

পঞ্চম কলায়—নী°-নী°-রী-রী-নি-রী-রী-পা এই আট স্বরের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া আটটি লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ কলায় নী ১+মিলিত মপ ১+মা ১+মা ১+সা ১+সা ১+সা ১+সা ১=৮ এইরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

সপ্তম কলায়—গা' ১+নী ১+সা' ১+গা' ১+মিলিত ধপ ১+সা ১+মিলিত ধনি ১+সা ১=৮ এইরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

অষ্টম কলায়—পা ১+সা' ১+পা ১+মিলিত নিধপ ১+মা ১+মা ১+মা ১+মা ১=৮, এইরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করিতে হইবে।

যে পদ্য পূর্ব্বোক্তরূপে প্রস্তারে পরিণত করা হইয়াছে সে পদ্যটি [illegible]—

পাতুভব মূর্দ্ধজাননং কিরীট মণি দর্পণম্।
গৌরীকর পল্লবাঙ্গুলি স্থতোজিতং স্থকিরণম্॥

পঞ্চমী জাতি

এই জাতিতে ঋষভ ও পঞ্চম এই দুইটি স্বরের যে কোন একটি অংশ স্বর হইয়া থাকে। সগ ও ম এই তিনটি স্বরের এই জাতিতে স্বল্প প্রয়োগ হয়। ঋষভ ও মধ্যমের সঙ্গতি। সম্পূর্ণ অবস্থায় এই জাতিতে গান্ধার—নিষাদেরও সঙ্গতি হইয়া থাকে। অংশ স্বর ঋষভ হইলে এই জাতি ঔড়ুব হয় না। এই জাতি গান্ধার বর্জ্জনে ষাড়ব ও নিষাদ-গান্ধার বর্জ্জনে উড়ুব হয়। ইহারও কলা আটটি। মূর্চ্ছনা ঋষভাদি, তাল চঞ্চৎপুট। পঞ্চম ন্যাস স্বর, ঋষভ, পঞ্চম ও নিষাদ ইহাদের যে কোনও একটি অপন্যাস স্বর হইয়া থাকে। শুদ্ধ পঞ্চম, দেশী ও আন্ধালী রাগে এই জাতির ছায়া পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে ইহার প্রস্তার প্রদর্শিত হইতেছে—

এই প্রস্তারে কিরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে তাহা পর পৃষ্ঠায় দেখান হইল :—

পঞ্চমী জাতির প্রস্তার

পা	ধনি	নী	নী	মা	নী	মা	পা	১
হ	র০	মূ	০	র্দ্ধ	জা	০	ন	
গা	গা	সা	সা	মা	মা	পা	পা	২
নং	ম	হে	০	শ	ম	ম	র	
পা	পা	ধা	নী	নী	নী	গা	সা	৩
প?	তি	বা	০	হু	স্ত	০	স্তু	
পা	মা	ধা	নী	নিধ	পা	পা	পা	৪
ন?	ম	নং	০	তং	০	০	০	
পা	পা	রী'	রী'	রী'	রী'	রী'	বী'	৫
প্র	ণ	মা	০	মি	পু	রু	ষ	
মা?	নিগ	সা	সধ	নী	নী	নী	নী	৬
মূ?	খ০	প	দ্য০	০	ল	০	ক্ষী	
সা'	সা	সা'	মা	পা	পা	পা	পা	৭
হ	র	ম	০	স্মি	কা	০	পা	
ধা	মা	ধা	নী	পা	পা	পা	পা	৮
ভি	ম	জে	০	য়ং	০	০	০	

প্রথম কলায়—অষ্ট লঘু যোজনা এইরূপ - পা ১+ধনি ১+নী ১+নী ১+মা ১+নী ১+মা ১+পা ১=৮।

দ্বিতীয় কলায়—অষ্ট লঘু যোজনা—গা ১+গা ১+সা ১+সা ১+মাঁ ১+মা ১+পাঁ ১+পাঁ ১=৮।

তৃতীয় কলায়—অষ্ট লঘু যোজনা—পাঁ ১+পাঁ ১+ধাঁ ১+নাঁ ১+নাঁ ১+নাঁ ১+গা ১+সা ১=৮।

চতুর্থ কলায়—অষ্ট লঘু যোজনা—পা ১+মা ১+ধা ১+নী ১+নিধ ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮।

পঞ্চম কলায়—অষ্ট লঘু যোজনা—পা ১+পা ১+রী′ ১+রী′ ১+রী′ ১+রী′ ১+রী′ ১+রী′ ১=৮।

ষষ্ঠ কলায়—মা′ ১+নিগ ১+সা ১+সধ ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১=৮।

সপ্তম কলায়—সা ১+সা ১+সা ১+মা ১+পা ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮।

অষ্টম কলায়—ধা ১+পা ১+ধা ১+নী ১+পা ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮।

নিম্নলিখিত শ্লোকের উপর প্রস্তার করা হইয়াছে—

হরমূর্দ্ধজাননং মহেশমমরপতি বাহুস্তম্ভনমনন্তম্।
তং প্রণমামি পুরুষমুখপদ্মলক্ষ্মীহরমম্বিকা পতিমজেয়ম্॥

ধৈবতী জাতি

ধৈবতী জাতিতে ঋষভ ও ধৈবত এই দুইটি স্বরের মধ্যে যে কোন একটি অংশ ও গ্রহ স্বর হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ অবস্থায় এই জাতিতে আরোহি বর্ণগত 'স' ও 'প' স্বর অল্পতররূপে অর্থাৎ লঙ্ঘনের নিয়মে প্রয়োগ করিতে হয়। আর আরোহি বর্ণে স ও প স্বর অল্পরূপে প্রয়োগ করিতে হয়। স্বর সমূহের এই অল্পতর ও অল্প প্রয়োগের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বে জাতি সমূহের সাধারণ লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। এই জাতি পঞ্চম লোপে ষাড়ব এবং ষড়জ ও ও পঞ্চমের লোপে ঔড়ুব হইয়া থাকে। ষড়জ গ্রামের ঋষভাদি অভিরুদ্গতা মূর্চ্ছনা—রেঁ গাঁ মাঁ পাঁ ধাঁ নিঁ সাঁ—সানি ধাপা মাগারে। তাল, মার্গ গীতি ও বিনিয়োগ ষাড়জী জাতির ন্যায়। ইহার ন্যাস স্বর ধৈবত, ঋষভ মধ্যম ধৈবত এই তিনটি স্বরের মধ্যে যে কোন একটি অপন্যাস স্বর হইয়া থাকে। শুদ্ধ কৈশিক, দেশী ও সিংহলী রাগে এই জাতির ছায়া পরিলক্ষিত হয়। এই জাতির কলা দ্বাদশটি, প্রত্যেকটি কলায় পূর্ব্বোক্তরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করিতে হয়। নিম্নে এই জাতির প্রস্তার প্রদর্শিত হইতেছে—

ধা	ধা	নিধ	পধ	মা	মা	মা	মা	১
ত	রু	না॰	০০	ম	লে	০	ন্দু	
ধা	ধা	নিধ	নিস	সা	সা	সা	সা	২
ম	নি	ভু॰	০০	ষি	তা	০	ম	
সধ	ধা	পা	মধ	ধা	নিধ	ধনি	ধা	৩
ল॰	শি	রো	০০	০	০০	জ॰	০	
সা	সা	রিগ	রিগ	সা	রিগ	সা	সা	৪
ভু	জ	গা॰	০০	ধি	পৈ॰	০	ক	
ধা	ধা	নী	পা	ধা	পা	মা	মা	৫
কু	০	ণ্ড	ল	বি	লা	০	স	
ধা	ধা	পা	মধ	ধা	নিধ	ধনি	ধা	৬
কৃ	ত	শো	০০	০	০০	ভং॰	০	
ধা	ধা	নিস	নিস	নিধ	পা	পা	পা	৭
ন	গ	সু॰	০০	ন্থ॰	ল	০	ক্ষী	

রিগ	সা	সা	সা	নী	নী	নী	নী	৮
দে॰	হা	০	০	র্দ্ধ	মি	০	শ্রি	
সা	রিগ	রিগ	সা	নী	সা	ধা	ধা	৯
ত	শ॰	রী॰	০	০	০	র	০	
রী	গরি	মগ	মা	মা	মা	মা	মা	১০
গ্র	ণ •	মা॰	০	মি	ভূ	০	ত	
নী	নী	ধা	ধা	পা	রিগ	সা	রিগ	১১
গী	০	তো	০	প	হা॰	০	র॰	
পা	ধা	সা	মা	ধা	নী	ধা	ধা	১২
গ	রি	তু	০	০	০	ষ্টং	০	

উপরিলিখিত প্রস্তারে অষ্ট লঘু যোজনা নিম্নলিখিত প্রণালীতে করা হইয়াছে—

প্রথম কলায়—ধা ১+ধা ১+নিধ ১+পধ ১+মা ১+মা ১+মা ১+মা ১=৮।

দ্বিতীয় কলায়—ধা ১+ধা ১+নিধ ১+নিস ১+সা ১+সা ১+সা ১+সা ১=৮।

তৃতীয় কলায়—সধ ১+ধা ১+পা ১+মধ ১+ধা ১+নিধ ১+ধনি ১+ধা ১=৮।

চতুর্থ কলায়—সা ১+সা ১+রিগ ১+রিগ ১+সা ১+রিগ ১+সা ১+সা ১=৮।

পঞ্চম কলায়—ধাঁ ১+ধাঁ ১+নাঁ ১+পাঁ ১+ধাঁ ১+পাঁ ১+মা ১+মা ১=৮।

ষষ্ঠ কলায়—ধাঁ ১+ধাঁ ১+পাঁ ১+মধাঁ ১+ধাঁ ১+নিধাঁ ১+ধনিঁ ১+ধাঁ ১=৮।

সপ্তম কলায়—ধা ১+ধা ১+নিসঁ ১+নিসঁ ১+নিধ ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮।

অষ্টম কলায়—রিগ ১+সা ১+সা ১+সা ১+নাঁ ১+নাঁ ১+নাঁ ১+নাঁ ১=৮।

নবম কলায়—সা ১+রিগ ১+রিগ ১+সা ১+নাঁ ১+সা ১+ধা ১+ধা ১=৮।

দশম কলায়—রাঁ ১+গাঁ রিঁ ১+মগঁ ১+মাঁ ১+মাঁ ১+মাঁ ১+মঁ ১+মঁ ১=৮।

একাদশ কলায়—নী ১+নী ১+ধা ১+ধা ১+পা ১+রিগ ১+সা ১+রিগ ১=৮।

দ্বাদশ কলায়—পা ১+ধা ১+সা ১+মা ১+ধা ১+নী ১+ধা ১+ধা ১=৮।

নিম্নলিখিত পদ্যটির উপরে এই প্রস্তার করা হইয়াছে—

তরুণামলেন্দুমণিভূষিতামলশিরোজং,
ভুজগাধিপৈক কুণ্ডলবিলাসকৃতশোভং
নগসুন্দুলক্ষ্মী দেহার্দ্ধ মিশ্রিতশরীরং
প্রণমামি ভূতগীতোপহার পরিতুষ্টম্।

নৈষাদী জাতি

এই জাতিতে নিষাদ, ঋষভ ও গান্ধার এই তিনটি স্বরের যে কোনও একটি অংশ স্বর হইয়া থাকে। যখন যেটি অংশ স্বর হয় তখন তাহার বহুল প্রয়োগ এবং অপর স্বরগুলির অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়াগ হইয়া থাকে। এই জাতিতে ষাড়ব ঔড়ুব ও লঙ্ঘনের নিয়ম ধৈবতী জাতির ন্যায়, বিনিয়োগ ষাড়জী জাতির ন্যায়। ইহার তাল চঞ্চৎপুট, কলা ষোলটি মূর্চ্ছনা ষড়জ গ্রামে গান্ধারাদি। নিষাদ ন্যাস স্বর, অংশ স্বরগুলিই অপন্যাস স্বর হইয়া থাকে। শুদ্ধ সাধারিত, দেশী ও বেলাবলী রাগে এই জাতির ছায়া পরিলক্ষিত হয়। ইহার প্রস্তার প্রদর্শিত হইতেছে।

নী	নী	নী	নী	সা	ধা	নী	নী	১
তং	০	সু	র	ব	০	ন্দি	ত	
পা	মা	সা	ধা̊	নী̊	নী̊	নী̊	নী̊	২
ম	হি	য	ম	হা	০	সু	র	
সা	সা	গা	গা	নী	নী	ধা	নী	৩
ম	থ	ন	মু	মা	০	প	তিং	
স´া	সা´	ধা	নী	নী	নী	নী	নী	৪
ভো	০	গ	যু	তং	০	০	০	
সা	সা	গা	গা	মা̊	মা̊	মা̊	মা̊	৫
ন	গ	সু	ত	কা	০	মি	নী	
নী̊	পা̊	ধা̊	পা̊	মা̊	মা̊	মা̊	মা	৬
দি	০	ব্য	বি	শে	০	ষ	ক	
রী	গ´া	স´া	স´া	রী´	গ´া	নী	নী	৭
সূ	০	চ	ক	শু	ভ	ন	খ	
নী	নী	পা	ধ নি	নী	নী	নী	নী	৮
দ	০	র্প	ণ	কং	০	০	০	
সা	সা	গা'	সা	মা	মা	মা	মা	৯
অ	হি	মু	খ	ম	নি	খ	চি	
সা̊	সা̊	সা̊	সা̊	নী̊	ধা̊	সা̊	সা̊	১০
তো	০	জ্জ্ব	ল	নূ	০	পু	র	
ধা	ধা	নী	নী̊	রী	গা	মা̊	মা̊	১১
বা	ল	০	ভু	জ	ঙ্গ	০	ম	
মা	মা̊	পা̊	ধা̊	নী̊	নী̊	নী	নী	১২
র	ব	ক	লি	০	তং	০	০	
পা	পা	নী̊	নী̊	রী̊	রী	রী	রী	১৩
ক্র	ত	ম	ভি	ব্র	জা	০	মি	
রী	মা	মা	মা	রী	গা	সা	সা	১৪
শ	ব	ণ	ম	নি	০	ন্দি	ত	
ধা	ধা	রী	গা	সা	ধা	নী	নী	১৫
পা	০	দ	যু	গ	প	০	ঙ্ক	
প´া	ম´া	রী´	গা	নী	নী	নী	নী	১৬
জ	বি	লা	০	সং	০	০	০	

এই নৈষদী জাতিতে নিম্নলিখিতরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

প্রথম কলায়—নী ১+নী ১+নী ১+নী ১+তার সা ১+ধা ১+নী ১+নী ১=৮।

দ্বিতীয় কলায়—পা ১+মা ১+সা ১+মন্দ্র ধা ১+মন্দ্র নী ১+মন্দ্র নী ১+মন্দ্র নী ১+মন্দ্র নী।

তৃতীয় কলায়—সা ১+সা ১+গা ১+গা ১+নী ১+নী ১+ধা ১+নী ১=৮।

চতুর্থ কলায়—তার সা ১+তার সা ১+ধা ১+পাঁচটি নী ৫=৮ ।

পঞ্চম কলায়—তুইটি সা ১+১=২+তুইটী গা ১+১=২+চারিটি মন্দ্র মা ৪=৮।

ষষ্ঠ কলায়—নী পা ধা পা মা মা মা মা এই আটটি মন্দ্র স্বরে লঘু=৮।

সপ্তম কলায়—রী´ ১+গা´ ১+সা´ ১+সা´ ১+রী´ ১+গা´ ১+নী ১+নী ১=৮।

অষ্টম কলায়—নী ১+নী ১+পা ১+ধ নি ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১=৮।

নবম কলায়—সা ১+সা ১+গা ১+সা ১+মা ১+মা ১+মা ১+মা ১=৮।

দশম কলায়—মন্দ্র মা̊ ১+মা̊ ১+মা̊ ১+মা̊ ১+নী̊ ১+ধা̊ ১+মা̊ ১+মা̊=৮।

একাদশ কলায়—ধা ১+ধা ১+নী ১+নী ১+রী ১+গা ১+মা̊ ১+মা̊ ১=৮।

দ্বাদশ কলায়—মন্দ্র মা̊ ১+মা̊ ১+পা̊ ১+ধা̊ ১+নী̊ ১+নী̊ ১+নী̊ ১+নী̊ ১=৮।

ত্রয়োদশ কলায়—পা̊ ১+পা̊ ১+নী ১+নী̊ ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১=৮।

চতুর্দ্দশ কলায়—রী ১+মা ১+মা ১+মা ১+রী ১+গা ১+সা ১+সা ১=৮।

পঞ্চদশ কলায়—ধা ১+মা ১+রী ১+গা ১+সা ১+ধা ১+নী ১+নী ১=৮।

ষোড়শ কলায়—তার পা´ ১ মা´ ১ রী´ ১ গা´ ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১=৮।

নৈষাদী জাতির উল্লিখিত প্রস্তারটি নিম্নলিখিত পদ্যের উপর রচনা করা হইয়াছে।

তং সুরানন্দিত মহিষ মহাসুর মথনমুমাপতিং ভোগযুতম্,
নগসুত কামিনী দিব্য বিশেষক সূচক শুভনখদর্পণকম্।
অহিমুখমণিখচিতোজ্জ্বল নূপুর বালভুজঙ্গমরবকলিতং
ক্রতমভিব্রজামি শরণমনিন্দিত পাদযুগপঙ্কজবিলাসম্॥

ষাড়জী জাতি হইতে এই নৈষাদী জাতি পর্য্যন্ত যে সাতটি জাতির প্রস্তার প্রদর্শিত হইল এই সাতটি শুদ্ধ জাতি। অতঃপর শুদ্ধ জাতির পরস্পর সংসর্গে যে বিকৃত জাতিগুলি উৎপন্ন হয়, তাহাদের লক্ষণ ও প্রস্তার লিখিত হইতেছে—

ষড়জ কৈশিকী জাতি

এই জাতিতে ষড়জ, গান্ধার ও পঞ্চম এই তিনটি স্বরের যে কোনও একটি অংশ স্বর হইয়া থাকে। ঋষভ ও মধ্যম স্বরের অল্পত্ব, ধৈবত ও নিষাদ স্বরের অংশস্বর (স গ প) অপেক্ষা অল্পত্ব এবং ঋ ও ম অপেক্ষা বহুত্ব ব্যবহৃত হয়। তাল চঞ্চৎপুট, কলা ষোলটি, নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে প্রাবেশিকী ধ্রুবারূপে এই জাতির বিনিয়োগ বা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। গান্ধার ইহার ন্যাসস্বর, ষড়জ, নিষাদ ও পঞ্চম অপন্যাস স্বর। গান্ধার-পঞ্চম, হিন্দোল, দেশী ও বেলাবলী রাগে এই জাতির সাদৃশ্যমূলক ছায়া পরিলক্ষিত হয়। এই জাতির প্রস্তার প্রদর্শিত হইতেছে

সা	সা	মাঁ	পাঁ	গরি	সগ	মা	মা	১
দে	০	০	০	০০	০০	০	০	
মা	মা	মা	মা	সা̊	সা̊	সা̊	সা̊	২
বং	০	০	০	০	০	০	০	
ধা	ধা	পা	পা	ধা	ধা	রী	রিম	৩
অ	স	ক	ল	শ	শি	তি	ল০	
রী̊	রী	নী̊	নী̊	নী̊	নী̊	নী̊	নী̊	৪
ধা	ধা	পা	ধনি	মা	মা	পা	পা	৫
দ্বি	র	দ	গ০	তিং	০	০	০	
ধা	ধা	পা	ধনি	ধা	ধা	পা	পা	৬
নি	পু	ণ	ম০	তিং	০	০	০	
সা	সা	সা	সা	সা	সা	সা	সা	৭
মু	০	গ্ধ	০	মু	খা	০	স্বু	
ধা	ধা	পা	ধা	ধনি	ধা	ধা	ধা	৮
রু	হ	দি	০	ব্য০	কা	০	ন্তিং	
সা	সা	সা	রিগ	সা	রিগ	ধা	ধা	৯
হ	র	ম	০০	স্থু	দো০	০	দ	
মা	ধা	পা	পা	ধা	ধা	নী	নী	১০
ধি	নি	না	০	দং	০	০	০	
রী	রী	গা	সা̊	সা̊	সা̊	সা̊	গা̊	১১
অ	চ	ল	ব	র	সূ	০	নু	
ধা̊	রিঁসঁ	রী̊	সরিঁ	রী̊	সাঁ	সাঁ	সাঁ	১২
দে	০০	হা	০০	র্দ্ধ	গি	০	শ্রি	
সা	সরি	রী	সরি	রী	সা	সা	সা	১৩
ত	শ০	রী	০০	রং	০	০	০	
মা	মা	মা	মা	নিধ	পধ	মা	মা	১৪
প্র	ণ	মা	০	মি০	তম	হং	০	
নী	নী	পা	পম	পা	পম	পধ	রিগ	১৫
অ	নু	প	ম০	মু	খ০	ক০	ম০	
গা	গা	গা	গা	গা	গা	গা	গা	১৬
লং	০	০	০	০	০	০	০	

এই প্রস্তার অষ্টলঘু যোজনা নিম্নলিখিতরূপে করা হইয়াছে।

১ম কলায়—সা ১+সা ১+মা ১+পা ১+গরি ১+মগ ১+মা ১+মা ১=৮

২য় কলায়—মা ১+মা ১+মা ১+মা ১+সা ১+সা ১+সা ১+সা ১=৮

৩য় „ —ধা ১+ধা ১+পা ১+পা ১+ধা ১+ধা ১+রী ১+রিম ১=৮

৪র্থ „ —রী ১+রী ১+নী̊ ১+নী̊ ১+নী̊ ১+নী̊ ১+নী̊ ১+নী̊ ১=৮

৫ম „ —ধা ১+ধা ১+পা ১+ধ নি ১+মা ১+মা ১+পা ১+পা ১=৮

৬ষ্ঠ „ —ধা ১+ধা ১+পা ১+ধনি ১+ধা ১+ধা ১+পা ১+পা ১=৮

৭ম „ আটটি 'সা' স্বরে একটি করিয়া অষ্টলঘু যোজিত হইতেছে।

৮ম „ —ধা ১+ধা ১+পা ১+ধা ১+ধনি ১+ধা ১+ধা ১+ধা ১=৮

৯ম „ —সা ১+সা ১+সা ১+রিগ ১+সা ১+রিগ ১+ধা ১+ধা ১=৮

১০ম „ —মা ১+ধা ১+পা ১+পা ১+ধা ১+ধা ১+নী ১+নী ১=৮

১১শ „ —রী ১+রী ১+গা ১+সা ১+সা̊ ১+সা̊ ১+সা̊ ১+সা̊ ১+গা̊ ১=৮

১২শ „ —ধা̊ ১+রিস̊ ১+রী̊ ১+সরি̊ ১+রী̊ ১+সা̊ ১+সা̊ ১+সা̊ ১=৮

১৩শ „ —সা ১+সরি ১+রী ১+সরি ১+রী ১+সা ১+ +সা ১+সা ১=৮

১৪শ „ —মা ১+মা ১+মা ১+মা ১+নিধ ১+পধ ১+মা ১+মা ১=৮

১৫শ „ —নী ১+নী ১+পা ১+পম ১+পা ১+পম ১+পধ ১+রিধ ১=৮

১৬শ „ আটটি 'গা' স্বরে একটি করিয়া অষ্টলঘু যোজনা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত পদ্যের উপরে প্রস্তার করা হইয়াছে।

দেবমসকলশশিতিলকং দ্বিরদ গতিং
নিপুণমতিং মুগ্ধমুখাম্বুরুহ দিব্যকান্তিম্।
হরমম্বুদোদধি নিনাদমচল বর সূনুদেহার্দ্ধ-
মিশ্রিত শরীরং
প্রণমামি তমহমনুপমমুখকমলম্॥

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ

রজনী-জাগর-রাগ নয়নে তোমার!
ওষ্ঠপুটে প্রণয়ের স্মৃতিচিহ্নখানি
রয়েছে অঙ্কিত; চূর্ণ চিকুরসম্ভার
অসম্বৃত; চেলাঞ্চল কেন নাহি জানি
বিলোল শিথিল। গতি—শ্লথ মদালস
কেলিশ্রান্ত ক্লান্তপক্ষ কলহংসী প্রায়
মন্দাকিনী তটে! আজি সারাটি দিবস
যামিনীর নর্ম্মলীলা স্মরি' বুঝি হায়,
হৃদয় হয়েছে তব ব্যাকুল উদাস।
তাই নাহি বিম্বাধরে কলহাস্য রেখা
ফেলিতেছ নিরজনে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,—
মুছে গেছে অশ্রুধারে কজ্জলের লেখা

আঁখিকোণে? মুছে ফেলি' নিশীথ স্বপন
এবে সখি, কর্ম্মস্রোতে ঢালো প্রাণমন!

শ্রীমাকড়সা

অধ্যাপক শ্রীযামিনীমোহন কর

আমার এই কাহিনীর starting point, অর্থাৎ কি-না, সূত্রপাত হইল একটী কুষ্মাণ্ড। আপনারা হাসিতেছেন—হাসিবারই কথা। নারী, প্রেম, রেস, সুরা, খুন, ডাকাতী, রাহাজানি ইত্যাদি অনেক জিনিস লইয়া গল্প লেখা হইয়াছে। কিন্তু এমন গল্প আপনারা কখনও পড়েন নি, যার গোড়াকার কথা হইল কুমড়ো। বুঝুন কতখানি নতুনত্ব ইহার মধ্যে রহিয়াছে। এটী আবার যে-সে কুষ্মাণ্ড নহে—"আগরপাড়া কৃষি-প্রদর্শনী"র প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত কুষ্মাণ্ড। এত বড় কুষ্মাণ্ড বাকি বাঙ্গলা দেশে—শুধু বাঙ্গলা দেশে কেন, ভারতবর্ষে কখনও উৎপন্ন হয় নাই। এই নীরস আরম্ভের পরিণতি কি ভীষণ exciting, আপনারা এখন কল্পনা করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই অতি-বৃহৎ কুষ্মাণ্ডের জন্য বাঙ্গলাদেশের এই সর্ব্বজনবিদিত লেখক প্রায় কালের করতলগত হইয়াছিল আর কি! নিশ্চয়ই এইবার আপনাদের গল্পটী শুনিতে ভয়ানক ইচ্ছা হইতেছে, না?

আমাকে তখনকার দিনে কেউ চিনিত না বটে, কিন্তু এখন সকলেই চেনে। আমার পরিচয়টা আপনাদের কাছে আগে হইতে দিয়া রাখি। পাঠকদের কাছে নিজেকে গোপন রাখা আমি পছন্দ করি না। আমার নাম সেবক শ্রীগোপীজনবল্লভপদরেণু দাস-ঘোষ মহাশয়। চিনিতে পারিলেন? না পারিবারই কথা। এটী আমার পৈত্রিক নাম। সাহিত্যক্ষেত্রে এ নাম অচল। তাই আমার এখনকার নাম—"শ্রীমাকড়সা"। এবার নিশ্চয়ই চিনিয়া ফেলিয়াছেন। এ নামে আমি ছাড়া আর কেহ নাই। বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধাবনিতা আমার লেখা বই পড়ে। পথে-ঘাটে-মাঠে আমার বইয়ের পাতা আপনি দেখিতে পাইবেন। খেলার মাঠে ও ঘোড়দৌড়ে আমার লেখা বইয়ের পাতায় চিনের বাদাম বিক্রয় হয়। বলুন—এত publicity আর কোনও লেখক কখনও পাইয়াছেন কি? 'রহস্যজাল' সীরিজ আমারই সম্পাদিত। তাদের সব বইই প্রায় আমারই রচিত। "টিকটিকির টিটকারী", "জালিয়াৎ রাজার সাজা", "সাপে-নেউলে" ইত্যাদি এ সবই আপনারা পড়িয়াছেন। সুতরাং আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে আমি একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক।

অবশ্য যখনকার ঘটনা আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি তখন আপনারা আমায় চিনিতেন না। আমি তখন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম reporter.—"হুক্কাহুয়া" কাগজে কাজ করি। সে সময় ওর চেয়ে নামজাদা কাগজ আর ছিল না। মাস দু-তিন অন্তর আমাকে তাঁরা টাকা পঁচিশেক দিতেন। দৈনিক দু-আনা চার-আনা তখনকার দিনে দেওয়া চলিত না। সম্পাদক মহাশয় কিন্তু বেশ মোটা রকম মাহিনা পাইতেন—বোধ হয় পঁচিশের পিঠে শূন্য। তাঁর নাম আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। দুঃখের বিষয় তিনি আমার রচনার তারিফ করা তো দূরে থাকুক, সর্ব্বদা নিন্দা করিতেন। একবার এক ফুটবল ম্যাচের খবর লিখিবার সময় উপরে দু-লাইন পদ্য যোগ করিয়া দিয়াছিলাম। তাতে তাঁর সে কি রাগ। যাই হোক, এটুকু বুঝিয়াছি যে আমার প্রতিভা—যা তিনি লুক্কায়িত ছিল বলিয়া চিনিতে পারেন নাই—আজ প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

সেদিন—বেলা সাড়ে দশটা হইবে। মেড়ার লড়াইয়ের এক দু পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ লিখিতেছিলাম—আমি দু পৃষ্ঠা লিখিলে কি হইবে, সম্পাদকের নিষ্ঠুর কলমাঘাতে দু পৃষ্ঠার মাত্র দু লাইন বাঁচিয়া থাকে, আর সব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়—এমন সময় খবর পাইলাম যে সম্পাদক মহাশয় আমায় ডাকিতেছেন। যদিও এই সম্পাদক সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই খারাপ ছিল—তাঁকে আমি একটা অপদার্থ মনে করিতাম—তবুও তিনি ডাকিতেছেন শুনিয়া আমার বুক ঢিপঢিপ করিতে লাগিল। আমার মূল্য তিনি বোঝেন না। তিনি যে আমায় ডাকিয়া বলিবেন, "ওহে দাস ঘোষ, তোমার অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মপটুতায় আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি" এবং এই বলিয়া পদোন্নতি ও বেতনোন্নতির জন্য

ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবেন তাহা সম্ভব নয়। সে গুড়ে বালি। তাই তাঁর ডাক আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাইতে লাগিল। পৃথিবীতে শত্রুর অভাব নেই। রাস্তায় হয় ত আমার এই চাকুরীটির জন্য পঞ্চাশজন লোক চিলের মত বসিয়া আছে। আমি সরিলেই তাহারা ছোঁ মারিবে। এরূপ ক্ষেত্রে আমার হৃৎপিণ্ড যে ঈষৎ বেগে ক্রিয়া করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অতঃপর "দুর্গা এবং তস্য পুত্র গণেশ"কে স্মরণ করিতে করিতে আমি গন্তব্য স্থানে গমন করিলাম।

আমি পঁহুছিবামাত্র সম্পাদকপুঙ্গব হাড়িচাঁচা কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার চেয়ে অপদার্থ লোক আজ অবধি আমাদের আপিসে আসে নাই। কি যে সব যাচ্ছেতাই লেখ, তার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু।"

আমি বুদ্ধিমানের মত চুপ করিয়া রহিলাম—প্রতিবাদ করা বিচক্ষণতাহীন হইবে এবং স্বমত প্রকাশ অপ্রয়োজনীয়। আমায় নিরুত্তর দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন, "এ সম্বন্ধে তুমি কি বলিতে চাও?" এবার আমায় কথা কহিতে হইল। আর চুপ করিয়া থাকা ভাল দেখায় না। মনের রাগ ক্ষোভ দমন করিয়া, 'আমি তো কহিনি কিছু, দুয়ার আড়ালে দাঁড়াইয়াছিনু মাথাটি করিয়া নীচু'-ভাব ত্যাগ করিয়া, ঈষৎ কাঁপিয়া, ঈষৎ কাসিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে, আমি যে এতটা অপদার্থ তা তো জানিতাম না। আপনাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমি আরও বেশী চেষ্টা করিব—প্রাণপাত পরিশ্রম করিব। আমার লেখার এ স্টাইলটা যদি আপনার পছন্দ না হয় তবে আর এক রকম স্টাইল আরম্ভ করি—"

আমার কথা শেষ করিতে না দিয়া তিনি বলিলেন, "না না, স্টাইলের কথা বলিতেছি না। যা আছে থাক আর বদলাইতে হইবে না।" আমার মন গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল, যাক্ আমার স্টাইলটা পছন্দ হইয়াছে। কিন্তু সে নিমিষের জন্য। পরমুহূর্ত্তেই তিনি বলিলেন, "আজ পঁচিশ বছর এই কাগজের আমি সম্পাদনা করিতেছি। তোমার চেয়ে খারাপ স্টাইল শুধু এতদিনে একজনের দেখিয়াছি।" আমার হৃদয় আবার পাহাড় হইতে মুষিকরূপ ধারণ করিল। চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি বলিয়া চলিলেন, "তোমার সংবাদ জোগাড় করিবার ক্ষমতা একেবারেই নাই। রিপোর্টারদের সেইটাই সবচেয়ে দরকারী। কাল কি করছিলে সন্ধ্যার সময়?" আমি উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে হাড়গিলেদের (Argyle) সঙ্গে কসবীদের (K.O.S.B.) চর্ম্ম নির্ম্মিত বৃহদাকারের কন্দুক ক্রীড়া দেখিতে গিয়াছিলাম।" তিনি বলিলেন, "বেশ করিয়াছিলে। ভবিষ্যতে ওটাকে ফুটবল ম্যাচ লিখ। মাঠের বাহিরে যে বেটি-এর ফল স্বরূপ একজন খুন এবং দু'জন জখম হইয়াছিল সে খবর রাখিয়াছিলে? না রাখ' নাই—তার কারণ তোমার খবর জোগাড় করিবার ক্ষমতা নাই। এই ক্ষমতা না থাকিলে জার্নালিজ্‌ম্ করা যায় না। পাবলিক আমাদের কাছ থেকে কি চায়—খবর। আমরা যদি তা না দিতে পারি—কি করে তবে চলিবে বল?"

আমি ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "ভবিষ্যতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

তিনি বলিলেন, "হুঁ। আচ্ছা, তোমাকে আরও দু মাস সময় দিলাম। এর মধ্যে যদি তোমার কাজের উন্নতি দেখি—ভাল, নচেৎ তোমাকে দিয়া আর চলিবে না। যাক্—আজ তোমায় একটা কাজে আগরপাড়া পাঠাইতে চাই। সেখানে গঙ্গার ধারে এক জমিদারের বাগানে "কৃষি-প্রদর্শনী" হইতেছে। তার একটা ভাল করিয়া রিপোর্ট লিখিবে—এই আধ কলমটাক্। শেষের এই লাইনটা যোগ করিয়া দিবে। এখন বাঙ্গালী মাত্রেরই —বিশেষ করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর উচিত গ্রামে গিয়া চাষ বাস করা। দেশকে স্বাধীন এবং উন্নত করিতে হলে চাষী হইতে হইবে।"

অতঃপর তিনি একটী প্রুফে মন দিলেন। আমিও তাঁর কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

ইহাই আমার জীবনের একটী উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনীর সূচনা।

তখনও কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর বাস সার্ভিস হয় নাই। শিয়ালদহ হইতে ট্রেনে চাপিলাম এবং আগরপাড়ায় নামিলাম। তখন বেলা তিনটা। যেমন রৌদ্র তেমনি ধূলি। হাঁটিতে হাঁটিতে ধূলাক্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে যখন ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোড অবধি পৌঁছিলাম তখন তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিবার উপক্রম। বড় রাস্তা পার হইয়া গঙ্গাভিমুখে যাইতেছি এবং ভাবিতেছি বুঝি বা আজি গঙ্গালাভ ঘটিবে

এমন সময়ে পথের বাঁ ধারে একটী বিশাল অট্টালিকা দেখিলাম। বাড়ীটা পুরাতন, স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সামনে প্রকাণ্ড বাগান, অনেক রকম ফুল গাছগাছড়ায় পূর্ণ। একটু জল চাহিয়া পান করিব এই অভিলাষে ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম কয়েকটী গাছের আড়াল হইতে এক ভদ্রলোক স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে ঐভাবে চাহিবার জন্য আমি কোন কৈফিয়ত তলব করিতে পারি না। আমি, বাহিরের লোক যদি ওঁর বাড়ীর দিকে চাহিতে পারি তবে উনিই বা বাহিরে চাহিবার অধিকার থাকিবে না কেন? তবুও ওঁর চাউনি আমার বিশেষ পছন্দ হইল না। বাঘের শিকারে ঝাঁপাইয়া পড়ার পূর্ব্বে যে চাউনি হয় অনেকটা সেইমত একটা সন্দেহপূর্ণ ক্রুর হিংস্র ভাব। তৃষ্ণা আমার উবে গেল।

ক্রমে তিনি অগ্রসর হইয়া আমার দিকে আসিতে লাগিলেন। ফটকের ধারে আসিয়া পৌঁছিতে আমার কিছু বলা উচিত মনে হইল। তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "আপনার উদ্যানের স্বর্গীয় শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম।" তিনি আমার কথা বোধ হয় শুনিতে পাননি, কারণ মোটে সে কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না। আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কোথায় থাকা হয়?" আমি আবার মুচকিয়া হাসিয়া উত্তর দিলাম, "আমি কলিকাতায় থাকি।" দেখিলাম তাঁর দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন, "ও। আমিও এখানকার লোক নই। শরীরটা সারাবার জন্য এইখানে বাড়ী ভাড়া করিয়া রহিয়াছি। তা মহাশয়ের এই গরমের দিনে দুপুর বেলা আগরপাড়ায় আসিবার কারণ?" আমি গর্ব্বভরে বলিলাম—"আমি হুক্কাহুয়া" কাগজের লোক। আপনাদের এখানে কি একটা প্রদর্শনী হইতেছে তার রিপোর্ট লিখিবার জন্য আসিয়াছি। আমি কি ছাই এই রৌদ্রে আসিতে চাই, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় কিছুতেই ছাড়িলেন না। বলিলেন আমি ছাড়া এই রকম একটা ইম্পর্টেণ্ট জিনিষের রিপোর্ট আর কেউ লিখিতে পারিবে না। অগত্যা আসিতে হইল। এই মেলাটী কোথায় হইতেছে বলিতে পারেন?"

"আর একটু এগিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে। আচ্ছা নমস্কার" বলিয়া তিনি বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

আমি ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ, হতমান্য হইলাম। আমার মূল্য এ লোকটাও বুঝিতে পারিল না। মনে মনে বলিলাম, "হায় হতভাগ্য বাঙ্গলা দেশ, এখনও রতন চিনিতে শিখিলে না!" এইরূপে নিজেকে প্রবোধ দিতে দিতে প্রদর্শনীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

প্রদর্শনীর রূপ বর্ণনা এবং যাঁহারা দর্শন করিতে আসিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের কথা লিখিলে এক মহাভারত সৃষ্টি হইয়া যাইবে। সে সব বাদ দিয়া শুধু সংক্ষেপে আমার কথা বলি। এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে দেখি একস্থানে অনেক লোক ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমিও অবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, পদ দ্বারা ক্রীড়া নিমিত্ত যে চর্ম্ম-নির্ম্মিত গোলাকার বস্তু তৈরী হয় তার ছ গুণ বৃহৎ একটী প্রায় গোলাকার পদার্থ। চর্ম্ম নির্ম্মিত নহে এবং রঙ ঈষৎ পীতাভ। খোঁজ করিয়া জানিলাম, উহা একটী কুষ্মাণ্ড। সকলে তার চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছে। আমিও সেইমত করিলাম। একজন অতিবৃদ্ধ লোক মধ্যে মধ্যে কুষ্মাণ্ডটীকে জলসিক্ত করিতেছে এবং একটী বস্ত্রখণ্ড গিয়া তাহার গাত্র মর্দ্দন করিতেছে। একটী দানবের তৈলসিক্ত টাকসম কুষ্মাণ্ড শোভা ধারণ করিয়াছে। বার চারেক প্রদক্ষিণের পরে বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিবার সুযোগ হইল। আলাপ বলা ঠিক হইবে না, কারণ শুধু সে-ই বক্তৃতা দিয়াছিল। আমি কেবল শুনিয়াছিলাম এবং মধ্যে মধ্যে শিরসঞ্চালন করিয়াছিলাম মাত্র। বদ্ধ কালা—তাকে শোনাইবার মত কণ্ঠস্বর ভগবান আমায় দেন নাই। তার বক্তৃতা হুবহু লিখিবার উপায় নাই, কারণ সে যা বলিয়াছিল অতি কষ্টে তার একটা মানে করিয়া লইয়াছি। কথাগুলো বুঝিতে পারি নাই। কথা অনেক কহিয়াছিল বটে কিন্তু তাহা বিশেষ কার্য্যকরী এবং অর্থকরী হয় নাই। তার বাঁধান দাঁত একটু ঢিলা থাকার দরুণ হাত দিয়া ধরিয়া কথা কহিয়াছিল। সুতরাং কথার চেয়ে বেশী মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল থুতু। যাই হোক, শুধু সারাংশটুকু আপনাদের জানাইতেছি।

"সে মালী। 'নাম বদল কর' নামক রাস্তার ধারে যে

বড় বাড়ীটা আছে সেইখানে সে কাজ করে। এই অতি বৃহৎ কুষ্মাণ্ড সেই বাগানে উৎপন্ন। তার বয়স এখন পঁচাত্তর। জীবনে কখনও সে কলিকাতা দেখে নাই, তবে নাম শুনিয়াছে। বাড়ীর বাগানটার অবস্থা এখন মোটেই ভাল নয়। সে একলা বুড়া মানুষ সব পেরে ওঠে না। আর দু'টো জোয়ান মালী ছিল আগেকার বাবুর আমলে। তখন বাগানটা খুব ভাল ছিল। বছর খানেক আগে এই নতুন বাবু আসিয়াছেন। আসিবামাত্রই ইনি তাহাদের ছাড়াইয়া দিয়াছেন। কারুর সঙ্গে মেশেন না। বাড়ীতে শুধু একটী মাত্র চাকর আছে। সে-ই রান্না বান্না করে। মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে দু'জন আসে, দু-চার দিন থাকিয়া চলিয়া যায়।" আরও সব অনেক কথাই হয় তো সে বলিয়াছিল কিন্তু মনে নাই। মাথার ভিতর কেবল আমার সেই বাড়ীর কথাই ঘুরিতেছিল—এবং এত জোরে ঘুরিতেছিল যে, আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, তোমার বাবুর চেহারাটা কেমন বল তো। গোটা ত্রিশ বয়স, রুক্ষ চেহারা, রোগা দেখতে—"

সে বল্লে, "না। বাবুর বয়স পঁয়তাল্লিশের ওপর। মাথার চুল কিন্তু সব পাকা। দাড়ী গোঁফ আছে। খুব জোয়ান চেহারা। আপনি যার কথা বলছেন তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আসেন।"

"ওঃ" বলিয়া আমি বিদায় লইলাম। গাছতলায় বসিয়া রিপোর্ট লিখিতে গিয়া দেখিলাম সব ঘুলাইয়া যাইতেছে। খালি সেই বাড়ী এবং সেই লোকটার কথা মনে পড়িতেছে। "দুত্তোর" বলিয়া একটী চায়ের দোকানে গিয়া ঢুকিলাম। চা পান সারিয়া গঙ্গার ধারে একটু বিশ্রাম করিয়া সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ধীর মন্থরগতিতে স্টেশনের দিকে চলিলাম। নিজের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ সেই বাড়ীটার সামনে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। 'ভেতরে আসুন না' এই রকম একটা অস্পষ্ট কোন কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখি সম্মুখে কুষ্মাণ্ড পরিচর্য্যাকারী বৃদ্ধ। ঝাঁপ খুলিয়া আমার নিকট আসিয়া হড়বড় করিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল। মানে বুঝিলাম এই যে, আমার বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা করিলে ভিতরে গিয়া বাগানের শোভা এবং অমূল্য সম্পদ দেখিতে পারি।

মুহূর্ত্তের জন্য আমি ইতস্তত করিলাম। ঘড়িতে দেখিলাম তখন মাত্র পৌনে ছ'টা। সাতটা চল্লিশে আমার ট্রেন সুতরাং সময়ের অভাব ছিল না। যাব কি যাব না গিছে এ ভাবনা। যাওয়াই স্থির করিলাম। আমার রিপোর্টের মধ্যে এই বাগানের কথা এবং এই বৃদ্ধের কথা যদি ঢুকাইয়া দিই তবে সম্পাদক মহাশয় একেবারে থ' হইয়া যাইবেন। 'কৃষি প্রদর্শনীর রিপোর্ট লিখিতে আসিয়া একজন পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধের কথা—যে-সে বৃদ্ধ নয়, এমন এক বৃদ্ধ যে-জীবনে কলিকাতা চোখে দেখে নাই, শুধু কানে শুনিয়াছে মাত্র—লিখিলে তিনি আমার প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। তাছাড়া বাড়ীটা ভিতর থেকে দেখিবার এবং অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করিবার একটা প্রবল ইচ্ছা মনে জাগিতেছিল। সেইজন্য বৃদ্ধের সঙ্গে ফটক পার হইয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

বাগানটা বড়। অনেক রকম ফুল এবং ফলে ভরা। বৃহৎ কুমড়া, লাউ, বেগুন ইত্যাদি অনেক হইয়াছে। বাড়ীর নিকটে পৌঁছিয়া আমি একদৃষ্টিতে বাড়ীর দিকে দেখিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ নিজের মনে বক্তৃতা দিয়া যাইতে লাগিল। আমিও মধ্যে মধ্যে 'হুঁ' 'তাই নাকি' 'সত্যি' ইত্যাদি বলিতে ও মাথা নাড়িতে লাগিলাম। কি বলিল তার এক রত্তি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না।

আমি যেস্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেখান হইতে সম্মুখের কিছু অংশ এবং বাড়ীর একধার দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ ছিল। জনমানবের চিহ্ন কোথাও ছিল না। বৃদ্ধকে গৃহস্বামী বাড়ী আছেন কি-না প্রশ্ন করিতে যাইব এমন সময় দেখি দোতালার একটা জানলা খুলিল। একটী মনুষ্যমূর্ত্তি নয়নগোচর হইল। পক্ককেশ গৃহস্বামীও নন এবং ফটকে যাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়াছিলাম তিনিও নন। আর এক নূতন ভদ্রলোক। মোটা কালো চেহারা, চোখে চশমা। নিবিষ্ট মনে ফটোগ্রাফিক প্লেটের মত কি একটা জিনিষ লইয়া আলোর দিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখা শেষ করিয়া হাতটী নামাইতে আমার উপর তাঁহার নজর পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানলা হইতে সরিয়া গেলেন। আমি কবি কিংবা ভাবুক নহি—তবুও আমার মনে হইল যে, সরিয়া গেলেন বলা ঠিক নয়, তিনি যেন অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এবং এত তাড়াতাড়ি যে আমার মনে হইল যেন ভেল্কী দেখিতেছি। আমি বিস্মিতভাবে ভাবিতে লাগিলাম আমাকে দেখিয়া এত দ্রুত অপসরণের কারণ কি?

আর একটা জিনিষ আমার বিস্ময়কে আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। এতক্ষণ একটা গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ হইতেছিল অনেকটা দূর হইতে মোটরের শব্দের মত—যা আমি ঠিক লক্ষ্য করি নাই। থামিতে টের পাইলাম। লোকটির জানলা হইতে সরিয়া যাবার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজও থামিয়াছিল। চিন্তা যেন আমায় গ্রাস করিয়া বসিল।

কতক্ষণ এই রকম স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না, পিছনে 'আপনি কে' শুনিয়া চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল। পিছন ফিরিয়া দেখি তিনজন ভদ্রলোক। একজনের সঙ্গে প্রদর্শনীতে যাবার সময় দেখা হইয়াছিল, আর একজনকে এইমাত্র জানলায় দেখিলাম। তৃতীয় ব্যক্তির মাথায় সাদা চুল এবং দাড়ী গোঁফ দেখিয়া বুঝিলাম ইনিই গৃহস্বামী। চেহারাটা রাক্ষসের মত ভীষণ এবং দেখে মনে হইল গায়ের শক্তিও ভীষণ। বড় বড় ভাঁটার মত চোখ। আমার দিকে কটমট ক'রে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কে? কাহাকে চাহেন?" আমার প্রাণপাখীর তখন প্রায় খাঁচা-ছাড়া অবস্থা। অনেক কষ্টে তাহাকে আটকাইয়া ঈষৎ মুচকি হাসিয়া (মুচকি হাসি আমার অমোঘ অস্ত্র। সকলে বলেন, আমাকে নাকি মুচকি হাসিলে অতিশয় ভাল দেখায়) বলিলাম, "আপনার অনুমতি না লইয়া আপনার উদ্যানে প্রবেশ করা আমার অন্যায় হইয়াছে। আমি দোষী, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি কলিকাতা হইতে কৃষি-প্রদর্শনী সম্বন্ধে একটী রিপোর্ট লিখিতে এইখানে আসিয়াছি। 'হুক্কাহুয়া' কাগজের নাম আপনি নিশ্চয় শুনিয়াছেন। আমি তাহাদেরই লোক।" ভাবিয়াছিলাম, এই কথার পর তিনি নিশ্চয়ই আমাকে খুব খাতির করিয়া বলিবেন, "তাই নাকি! আমার কি সৌভাগ্য। আসুন, ভিতরে আসুন—" কিন্তু এ ধরণের কিছুই ঘটিল না। তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন, "আমার বাড়ীতে তো আর প্রদর্শনী হইতেছে না। এখানে কি করিতে আসিয়াছেন তাহার উত্তর দিন।" আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, "আপনার মালীর সঙ্গে আমার প্রদর্শনীতে সাক্ষাৎ ঘটে এবং কিঞ্চিৎ পরিচয়ও হয়। সে-ই আমাকে ভিতরে আসিয়া আপনার উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিতে বলে।" পরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "এ রকম বৃহৎ কুষ্মাণ্ড, অলাবু ইত্যাদি জীবনে কখনও নয়নগোচর হয় নাই। দেখিয়া আজ আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। এ সম্বন্ধে আমাদের কাগজে দু' কলম সুখ্যাতি লিখিয়া দিব।" ইহাতেও বিশেষ ফল হইল বলিয়া মনে হইল না। কারণ তিনি অতি উষ্ণভাবে বলিলেন, "তোমার কতকগুলো বাজে কথা শুনিবার আমার প্রয়োজন নাই। মালীর কথায় কেহ কখনও কাহারও বাড়ীতে প্রবেশ করে না। সত্যি করিয়া বল এখানে তোমায় কে পাঠাইয়াছে এবং কেন আসিয়াছে?" বলিতে বলিতে তাঁহার ক্রোধের স্রোতে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি লাফাইয়া আমার নিকট আসিয়া জামার কলার ধরিলেন। আমি তখন মনে মনে ইষ্ট নাম ধ্যান করিতেছি। মনে পড়িতেছে শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা। এমন সময় বাকী দুইজনে আসিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। ফটকে যাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তিনি তাঁহার কানে কানে কি যেন বলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ক্রোধের উপশম হইল। সব রাগ যেন জল হইয়া গেল। আমার দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দেখুন, কিছু মনে করিবেন না—আমার মেজাজটা অতিশয় খারাপ। ক্রমাগত ভুগিয়া ভুগিয়া অতিশয় খিটখিটে হইয়া গিয়াছি। নতুন লোক দেখিলেই আমি চটিয়া উঠি। আপনি কাগজের লোক বলিলেন না—আপনার নামটা কি জিজ্ঞেস করিতে পারি?" আমার মানইজ্জৎ তো আগেই ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। যাই হোক, তাহা আবার ধূলি হইতে তুলিয়া ঝাড়িয়া এক রকম মানান সই করিয়া লইলাম। শ্লেষের সহিত "আর নামে দরকার নাই মহাশয়, ঢের হইয়াছে" বলিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু মুখ হইতে সম্মুখের ত্রিমূর্ত্তি দেখিয়া আপনা হইতেই নিজের অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া গেল, "অধমের নাম গোপীজনবল্লভপদরেণুদাসঘোষ। 'হু ক্কা হু য়া'র রিপোর্টার।" গৃহস্বামী বলিলেন, "আমার দুর্ব্ব্যবহারের জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। আমার বাগানের বড় সখ গোপীবাবু। এই যে সব প্রদর্শনীতে আমার বাগানের বৃহদাকার ফল দেখিলেন তাহা আমার তৈরী একটী সারে উৎপন্ন হয়।

আমার সন্দেহ হইয়াছিল, বুঝি বা আমার মালীর কাছ হইতে আপনি সেই তত্ত্ব জানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। সেইজন্য আমার মেজাজটা হঠাৎ বিগড়াইয়া গিয়াছিল। আশা করি আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন।"

অতঃপর আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি সমস্ত বাগানটী ভাল করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইলেন। প্রত্যেক সব্জীর ইতিহাস, রোজ-নামচা, পরিচর্য্যা ইত্যাদি বলিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। আমিও মনে মনে সে গুলিকে সাজাইয়া কেমন একটী সুন্দর রিপোর্ট লেখা সম্ভব হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। কতক্ষণ এইভাবে কাটাইয়াছি জানি না, হঠাৎ হাত-ঘড়ির দিকে নজর পড়িতে দেখি সাতটা বাজিয়া চল্লিশ মিনিট হইয়াছে। "ঐ যাঃ, ট্রেণ মিস্ করিয়াছি। হ্যাঁ মশাই, এর পরের ট্রেণটা কখন আসে?" আমি বলিয়া উঠিলাম। তিনি উত্তর দিলেন, "পরের ট্রেণ! আজ রাত্রে আর ট্রেণ নাই। আবার কাল সকালে পাইবেন।" আমি হতাশভাবে বলিলাম, "য়্যাঁ, তবে কি হইবে? আমার তো আজ কলিকাতায় না পঁহুছিলেই নয়। এই প্রদর্শনীর একটা রিপোর্ট আজ রাত্রে দিতেই হইবে। না দিতে পারিলে আমার চাকুরী যাইবে।" তিনি বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ। আমার জন্যই আপনার দেরী হইল। আমি বড়ই দুঃখিত। তবে এক কাজ করা যায়। আপনি রিপোর্টটাকে টেলিগ্রাম করে দিন।" আমি তাঁহাকে প্রায় কাঁদ কাঁদ ভাবে [এতে লজ্জার কিছু নাই। চাকুরী যাবার সম্ভাবনায় কার না কান্না পায়] বলিলাম, "অত্যাবশ্যকীয় খবর ছাড়া কাগজ টেলিগ্রামের খরচ দেয় না। আগড়পাড়া কৃষি-প্রদর্শনীর খবরকে তাঁহারা সে পর্য্যায়ে কিছুতেই ফেলিবেন না।" তিনি বলিলেন, "গোপীবাবু, আপনি রিপোর্ট লিখুন। টেলিগ্রামের খরচ আমি দিব। আমিই দোষী, আমার জন্যই আপনাকে এই মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছে। আপনি দয়া করিয়া ওজর আপত্তি করিবেন না। আর আজ রাত্রে এইখানেই আহারাদি করিয়া শয়ন করিবেন। কাল সকালের ট্রেণে কলিকাতা যাইবেন।" এই বলিয়া আমায় লইয়া তিনি অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমাকে দোতালার একটী বড় ঘরে বসাইয়া বলিলেন, "এইটী আমার বসবার ঘর। টেবিলে কাগজ, কালী, কলম সবই রহিয়াছে। আপনি লিখুন। আমি এক কাপ চা আর কিছু মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিতেছি। লেখা হইলে আমায় ডাকিবেন, আমি চাকরকে দিয়া আপনার টেলিগ্রামটী পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি ঘরটী ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। বেশ সুসজ্জিত। গৃহস্বামী ধনী বলিয়া মনে হইল। চারটী জানলা—সবগুলিই বন্ধ এবং মোটা পরদায় আচ্ছাদিত। আমি লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে চাকর আসিয়া চা ও মিষ্টান্ন দিয়া গেল। আমি চা-খোর। চায়ের বাটী সামনে পাইয়া এক চুমুকে তাহা নিঃশেষ করিলাম। পরে মিষ্টি খাইতে খাইতে লিখিতে লাগিলাম। হঠাৎ যেন মাথাটা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। ক্রমেই হাত পা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। চোখে চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম। উঠিবার চেষ্টা করিলাম—পারিলাম না। চীৎকার করিবার উদ্যোগ করিলাম, স্বর বাহির হইল না। মনে হইল কে যেন আমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া আছে। জ্ঞান ছিল কিন্তু নড়িবার বা চক্ষু উন্মীলন করিবার ক্ষমতা ছিল না। এমন সময় ঘরের দরজা খুলিয়া কয়েকজন লোক ঢুকিল। একজন আমাকে দড়ি দিয়া চেয়ারের সঙ্গে খুব ভালভাবে বাঁধিল। আমি তাহাদের মুখ দেখিতে পাই নাই, কিন্তু কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম। যেন মনে হইল তাহারা কোন কারণে ভয় পাইয়াছে। একজন বলিতেছে "ভোঁদার খবরটা ঠিক তো?" আর একজন বলিল—"ঠিকই হোক আর ভুলই হোক, সাবধানের বিনাশ নেই। গঙ্গার ধারে পোড়ো বাড়ীটায় আমরা এখন গিয়ে লুকোই। ভূতের বাড়ী বলে লোকে সে ধারটায় যায় না। কাল যা-হোক একটা কিছু করা যাবে।"

"ইহাকে এখানে রাখিয়া যাওয়াটা কি ঠিক হইবে?"

"কিছুক্ষণ পরে আপনিই অক্কা পাইবে? আর যদি নাও পায়, তাহাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি? এখন আর দেরী করা উচিত নয়।" এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিল।

এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিবার পর বিশ্ব যেন ধীরে ধীরে সুপ্ত হইয়া গেল। অন্ধকার—আরও অন্ধকার। আমার মনে হইল আমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

যখন আবার বাঁচিয়া উঠিলাম তখন দেখি আমার চারিধারে পুলিশ। সম্মুখে একজন শ্বেতাঙ্গ। আমাকে

চক্ষু চাহিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Well Babu, who are you?" আমি বলিলাম—"Your Honour sir, I am an humble reporter of the 'Hukka Hua', Sir. আমি ত এখন dead." তিনি হাসিয়া আমাকে ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন, "You are not dead Babu, you are alive all right. তারপর আপনার নাম কি? এখানে কি করিতেছিলেন?" আমি একে একে সব কথাই বলিলাম, একজন লোক সব খাতায় টুকিয়া লইল এবং যেই যখন আমাকে বাঁধিবার সময় তাহাদের কথোপকথন উল্লেখ করিলাম, সাহেব লাফাইয়া উঠিলেন। "Thank you Babu," বলিয়া তিনি কয়েকজন কনস্টবলকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। দুজন কনস্টবল আমার কাছে রহিল। কিছুক্ষণ পরে আমি আবার চলিয়া পড়িলাম। মাথা ঘুরিতেছিল—বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

হঠাৎ সাড়া পাইয়া চোখ খুলিতে দেখি সামনে সেই সাহেবটী দাঁড়াইয়া ও তাঁহার পিছনে হাতকড়ি বাঁধা সেই তিনজন লোক—যাহারা আমাকে আর একটু হইলেই শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছিল আর কি। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "Can you identify them." আমি উত্তর দিলাম, "Yes, I saw them in the morning, in the evening sir and not identify them."

"Thank you very much, you have helped us immensely. সরকার বাহাদুর এর জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে। আপনার জন্যই আজ এই most notorious forgery gang ধরা পড়িল।"

এই বলিয়া তিনি হাসিলেন, আমিও আমার বিখ্যাত মুচকি হাসি হাসিলাম। এই ব্যাপার সংক্রান্ত হাসি এই আমার শেষ নয়। পরে আরও দুইবার হাসিয়াছি। দ্বিতীয় বার হাসিয়াছি যখন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলাম, কারণ প্রথম হাসির সময় কিছুই বুঝিতে পারি নাই। সাহেব হাসিয়াছিল সুতরাং আমার কর্ত্তব্যবোধে আমিও হাসিয়াছিলাম। তৃতীয় বার হাসিলাম, যখন সরকারের নিকট হইতে একটী প্রশংসা-পত্র পাইলাম। যে ব্যাপারের আমি বিন্দুবিসর্গ জানি না, সেই ব্যাপারে প্রশংসিত হইলে সকলেরই হাসি পায়। আমিও হাসিয়াছি।

সেই থেকে আমি ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করি। প্রথম পাতায় আমার প্রশংসা-পত্রের একটী প্রতিলিপি ছাপাইয়া দিই। কভারের উপর লিখি "শ্রীমাকড়সা রচিত" এবং তলায় "সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে অপূর্ব্ব সাহস এবং গোয়েন্দা কার্য্যের বুদ্ধির জন্য প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত।"

সেই অশ্রুত গোপীজনবল্লভপদরেণুদাসঘোষ আজ আপনাদের সুপরিচিত "শ্রীমাকড়সা"।

আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "মহাশয়, যদি তাহারা আপনাকে পুলিশের লোক বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল তবে হত্যা করিল না কেন? যদি বিষই দিল তবে এত কম দিল কেন যে আপনি বাঁচিয়া উঠিলেন? পুলিশই বা সেই সময়েই কিরূপে আসিয়া হাজির হইল?" ইত্যাদি। আমি তার উত্তরে কেবলমাত্র আপনাদের এই কথা জানাইতে চাই যে, আমি হীরো, নায়ক। কোন ডিটেকটিভ গল্পে নায়ককে মরিতে দেখিয়াছেন কি? নায়কের বুকে গুলি করিলে পকেটস্থিত সিগারেট কেসে লাগিয়া গুলি ফিরিয়া যাইবে, উচ্চ ছাদ হইতে লাফাইলে নীচে দিয়া সে সময়ে তুলোর গাড়ী যাইবে, অকূল অতল জলে হাবুডুবু খাইলে ঠিক সেই সময় একটী খালি নৌকা সেইখান দিয়া ভাসিয়া যাইবে, হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে ইন্দুর আসিয়া রজ্জু কাটিয়া দিবে। এসব না হইলে নায়ক হওয়া যায় না।

আপনারা এইবার আমায় পরামর্শ দিতে পারেন যে, গল্পে একটী নায়িকা থাকিলে ভাল হইত। গৃহস্বামীর একটী রূপসী ষোড়শী, বিদুষী কন্যা। ধীরে ধীরে আমার কক্ষে আসিয়া আমার শুশ্রূষা করিতেন। আমার জ্ঞান হইলে চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিতাম, "আমি কোথায়? আপনি দেবী না মানবী?" তিনি উত্তর দিতেন—"আপনি শত্রুপুরী মাঝে। আমি দেবী নহে—মানবী।" আমি আবার তাঁহার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতাম। এমন সময়ে গৃহস্বামী প্রবেশ করিতেন। রূঢ়স্বরে কন্যাকে বলিতেন, "এস্থানে কি করিতে আসিয়াছ? ইহাকে ছাড়িয়া দিয়া এই মুহূর্ত্তে এই স্থান পরিত্যাগ কর।" তিনি উত্তর দিতেন, "না পিতা, অনেক সহিয়াছি, আর সহিব না। ইহাকে আমি মুক্ত করিয়া দিব।" তাঁহার পিতা তখন থিয়েটারী ভঙ্গিতে বলিতেন, "মূঢ় বালিকা, জীবনের কূট-

নীতি তুমি কি বুঝিবে ? অবিলম্বে এই স্থান কর পরিত্যাগ। কে এই বন্দী, যার তরে পিতৃ সনে করিতেছ তুমি বৃথা বাদানুবাদ ?" তখন তিনি বলিবেন, "শুনিতে কি চাও পিতঃ ? একান্ত বাসনা যদি শুনিতে তোমার, তবে বলি শোন, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।" ইত্যাদি ইত্যাদি। সুবর্ণে সোহাগা মিলিত।

আমিও ইহা অস্বীকার করিতেছি না। আমারই কি মহাশয় মনে সাধ হয় নাই, কিন্তু কি করিব বলুন উপায় নাই। আপনাদের সন্তোষসাধন করিতে গিয়া গৃহে চির অসন্তোষের অনল তো আর জ্বালিতে পারি না। আমার উনি তৃতীয় সংস্করণের। আমাকে অনেক সাবধানে চলিতে হয়।

আপনারা হয় ত আমার বাসস্থান জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন। হওয়াটাও আশ্চর্য্য নয়। আপনাদের নিরাশ করিব না। আমার বাসস্থান—"বাগবাজার, কলিকাতা।"

প্রাচীন ভারত

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

প্রাচীন যুগের এই ভারতের ইতিহাস পড়ি
পরিতৃপ্ত নহে মন, জন্মে ক্ষোভ দৈন্য তার স্মরি'।
ভগ্ন-শীর্ণ শিলালিপি ; জীর্ণ মুদ্রা, ধাতুর ফলক
দূর হতে ভাসাভাসা দেখে শুনে চীন পর্য্যটক
টিপ্পনী লিখিয়া গেছে করচায় করে লীলাচ্ছলে
—ইহাই সম্বল শুধু। তাই দিয়ে গাঁথা অতিক্ষীণ
সূত্রহারা, ছন্নছাড়া, ভাসা ভাসা শৃঙ্খলাবিহীন
কুচ্ছ্রগন্ধ ইতিবৃত্ত, তাতে মন তৃপ্তি নাহি মানে
মনে হয় ধমণীর রক্তধারা ঢের বেশি জানে
এর চেয়ে, উড়ে যায় সেই যুগে কল্পনা আমার
শিল্প সাহিত্যের পথে অবরুদ্ধ নহে গতি তার,
স্বপ্নের মাধুরী দিয়ে ভরে তোলে সব ব্যবধানে
প্রাচীন ভারতে পুন গড়ে' তুলে নব উপাদানে।

সে স্বপ্নভারতে হেরি নরনারী বসন্ত উৎসবে
মাতে ফাল্গুনের দিনে। নব মেঘোদয় হয় যবে
গগন দিগন্ত ভরি' দূতরূপে মেঘেরে বরিয়া
কুটজ কুসুমরাশি অর্ঘ্য দিয়া অঞ্জলি ভরিয়া
পাঠায় বিরহী তার দয়িতার লাগি আকিঞ্চন।
উদয়ন কথা কয় গৃহদ্বারে গ্রামবৃদ্ধগণ।
অভিসারিকারা চলে পুরমার্গে গুণ্ঠিত আননে
সংবরি' মঞ্জীরধ্বনি। কাত্যায়নী আরাধে কাননে
জনপদবধূগণ। সন্ধ্যাপ্রাতে বৈতালিক দল
শ্রদ্ধরা ছন্দের শ্লোকে গায় রাজপ্রশস্তি মঙ্গল।
নাগরী শুকায় বেশ ধূপধূমে, ধারাযন্ত্র জলে
স্নান করি,' যৌবনের জয়লেখা পত্র লেখাচ্ছলে
আঁকে উরসিজতটে। সীধু পান করিয়া সভায়
মুরজবাদনে যত নাগরেরা প্রেমগান গায়।
প্রতিটি মুহূর্ত্ত তারা যৌবনের করে উপভোগ,
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ নাহি দৈন্য নাহি শোক রোগ।

অর্হৎ শ্রমণগণ শ্রাবকের দ্বারে দ্বারে গিয়া
দশশীল ব্যাখ্যা করে। আভরণ সজ্জা তেয়াগিয়া
পরিয়া চীবরবেশ নটীগণ হয় মহাথেরী
মুড়ায়ে মাথার কেশ। ছিন্ন করি সংসারের বেড়ী
জুটে দলে দলে গৃহী সংঘারামে। বুদ্ধের শরণ
লভিয়া তাহারা করে ভিক্ষু ব্রত দৈন্যের বরণ।
এ দিকে স্বগৃহে রচি ব্রাহ্মণেরা অর্দ্ধ তপোবন
পরাবিদ্যা লয়ে করে সারস্বত জীবন যাপন।
প্রতিটি মুহূর্ত্ত তারা জীবনেরে করে যে সফল,
নাহি ক্ষোভ নাহি লোভ নাহি দ্বন্দ্ব নাহি কোলাহল।

আল্পনা ও পিঁড়িচিত্র

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি যখন ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পকলা সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করবার প্রয়াস পাই, সেই সময় আমার নৃতাত্ত্বিক চক্ষের সম্মুখে গৃহে গৃহে পূজাপার্ব্বণ বা কোন উৎসবে মেয়েদের দ্বারে অঙ্গনে আল্পনা বা পিঁড়িতে চিত্রাঙ্কন করা নক্সাগুলির মূল্য এমন বৃদ্ধি পায় যে, সাধারণের নিকট "বাজে সময় নষ্ট করা অকেজো লোক" এইরূপ একটী গালি খেয়েও মেয়েমহল থেকে কতকগুলি আল্পনা সংগ্রহ করি।

এই সময়ে 'গোধূলি সংঘ' বলে আমাদের একটী কাল্‌চার ক্লাব ছিল—সেই সংঘের উদ্যোগে একটী আলিম্পন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে অনেকগুলি নক্সা পাওয়ার সুবিধা হয়। পুস্তক অনুসন্ধানে অবনীবাবুর সাহিত্য পত্রিকাতে ছড়া এবং শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ছড়া ও আল্পনা এই দুটীর বই সাহিত্যপরিষদে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রতের' উল্লেখ পাই। এই বইখানির ইংরেজী অনুবাদ পেলাম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে কিন্তু বাংলা বই কোথাও পেলাম না। শেষকালে আড়াইটী টাকা ব্যয় করে একখানি বই সংগ্রহ করা গেল। পড়ে দেখলাম শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথও এইরকম করে মেয়েদের কাছ থেকে মূল নক্সা জোগাড় করেছিলেন। তখন মেয়েরা এত স্কুলমুখো ছিল না। আমার আল্পনাগুলি বেশীর ভাগ স্কুলের মেয়েদের।

বাছাই করে ত্রিশখানি আল্পনা আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে দেখাই, তারপর দেখেন শিল্পী শ্রীচারু রায়। এঁদের বিচারে যেগুলি দাঁড়িয়ে যায়, সেইগুলি আমি শিল্পীদের উপযুক্ত পারিতোষিক দানের পরে নিজের কাছে রেখে দিই। কিন্তু উপস্থিত সেগুলি নাই—ভাগ্যিস সেগুলির কপি রেখেছিলাম—ক্যামেরা এবং স্কেচের সাহায্যে, তাই এখানে আপনাদের দেখাতে পারছি।

খাঁটি আল্পনা বল্‌তে যা বুঝি, তা অনেকেই আজকাল অনুসরণ করেন না। চিত্রকলার উন্নত উপায় অবলম্বনে কল্‌কাতার আল্পনা অন্যরূপ ধারণ করেছে, ফলে তাদের পিঁড়িচিত্র বল্লেই ঠিক হয়। প্রকৃত আল্পনা যা এখনও পল্লীগ্রামের মেয়েরা দিয়ে থাকে—তাতে শুদ্ধ

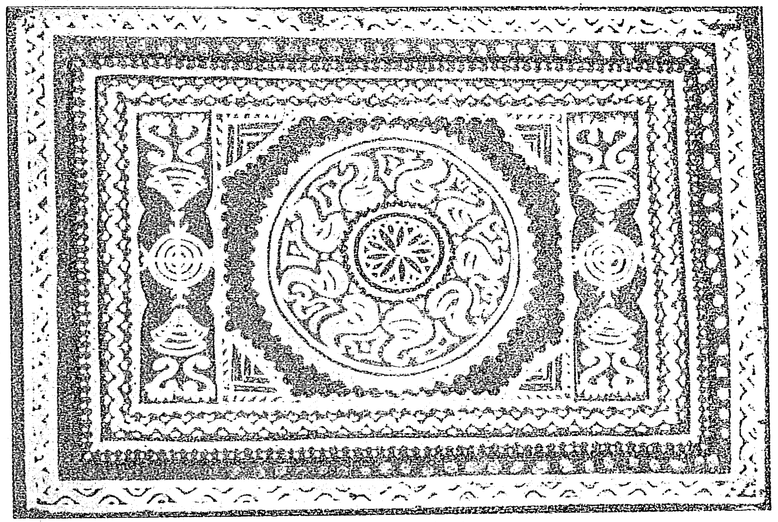

লক্ষ্মীর পিঁড়ি—তমিস্রা গাঙ্গুলী

পিটুলিগোলা সাদা রং, তুলি (ব্রাশ্ নয়) এবং হাতের আঙ্গুল—এই তিনটীর প্রয়োজন। কাঠির সাহায্য চল্‌বে না এবং কারুর নকল করাও চলবে না – সহজাত গতিতে এবং ভঙ্গীতে গতানুগতিক নক্সাগুলি এঁকে যেতে হবে। যাঁরা ভাল আল্পনা দিতে পারেন—তাঁরা এইতেই এমন সুন্দর সুন্দর আল্পনা দেন যে বহু সময়ে সামঞ্জস্য ও ছন্দ এই দুটী জিনিষে আর্ট স্কুলের ছেলেদেরও তাঁদের কাছে হার মান্‌তে হয়।

আল্পনা সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বল্‌বার পূর্ব্বে আমি ছবিগুলির কিছু পরিচয় দিই।

প্রথম চিত্রটী লক্ষ্মীর পিঁড়ির আল্পনার একটী নক্সা। ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, শিল্পী অনেকস্থানে তুলির (brush) সাহায্য নিয়েছেন। মধ্যে পদ্ম, তার চতুর্দ্দিকে শঙ্খ, তুটী পাশে লক্ষ্মীর পাঁড়া। রুল-কম্পাসের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে নিশ্চয়, কারণ সহজ অনাড়ম্বর অঙ্কনের ছাপ নেই, সেইজন্য এটীকে আল্পনা না বলে পিঁড়িচিত্র বল্লেই ঠিক হত।

২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বর চিত্রের চারিটী আল্পনাতেই মেয়েরা

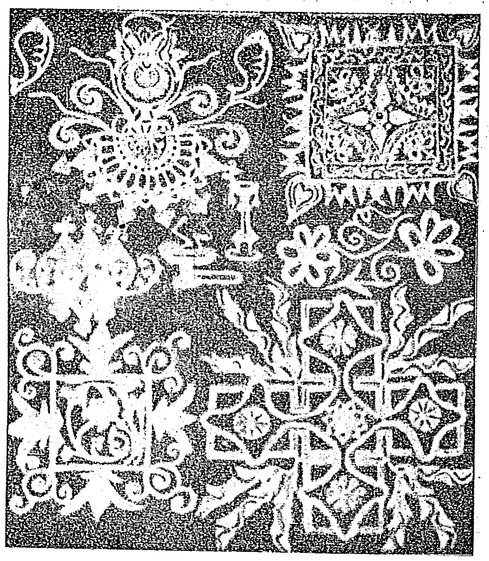

পূজা-পার্ব্বণের নক্সা—মিসেস্ নাগ

সকলেই সরু কাঠির সাহায্য নিয়েছেন। ২ ও ৩ নম্বর আল্পনার নক্সাগুলি মেজে এবং পিঁড়ি উভয়েরই উপর আঁকা চলে। ২ নম্বর আলপনার নক্সাটিতে কতকগুলি গতানুগতিক জৈমিতিক (geometrical figures) আলঙ্কারিক নক্সার সমাবেশ আছে। মধ্যে চারিটী সারি আড়াআড়িভাবে শঙ্খলতা, চার রকমের পদ্ম, লক্ষ্মীর ধানছড়া এবং বিভিন্ন ফুলের চিত্র। প্রচুর পরিমাণে শঙ্খলতা এঁকেছেন শ্রীমতী সরকার চার নম্বর চিত্রে; মাঝখানের পদ্মটিতেও ভারী সূক্ষ্মকাজের পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণে টপ্ করে কিছুতেই শঙ্খলতা আঁকতে পারবেন না—কি মেঝেতে মেয়েদের সঙ্গে পিটুলীগোলা জলে, কি কাগজের উপর পেন্সিলে, আমি ত প্রথম প্রথম কিছুতেই শঙ্খলতার সামঞ্জস্য আন্‌তে পারতাম না—যদিও অতি কষ্টে টানটা দিতে পারতাম। ৬, ৭ ও ৮ এই তিনটী চিত্রের আল্পনাকে পিঁড়িচিত্র বলাই সমীচীন, তবে কি-না আজকাল আল্পনা কথাটী খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে—যার মধ্যে মেয়েদের আঁকা-জোকা অনেক কিছু জড়াজড়ি করে থাকে। ছয় নম্বর চিত্রটী কাজের দিক থেকে অপূর্ব্ব, যিনি এঁকেছিলেন তিনি আল্পনা দিবার প্রয়োজনীয় দক্ষতার অনেক উপরে উঠে গেছেন; কারণ তার ভঙ্গিমা সাধারণ মেয়েদের আল্পনা দেওয়ার চাইতে ঢের উন্নত বা চিত্র-শিল্পীদেরই উপযুক্ত। এই কটী নক্সাতেই নানাপ্রকার রং ব্যবহার হয়েছিল, সেগুলি ফটোতে যতটা পেরেছি তুলে আপনাদের দেখাচ্ছি।

৬ নম্বরটী পাঠিয়েছিলেন বালীগঞ্জের কোন মেয়ে স্কুলের ছাত্রী—অঙ্কনের দিক দিয়ে খুব নিখুঁত, রঙের সমাবেশও মন্দ ছিল না, কিন্তু তুলি এবং কাঠির সাহায্য এতই নিয়েছিলেন শিল্পী ফ্রেস্কোর মত যে, আমরা তাঁকে খাঁটি আল্পনার কোন পুরস্কার দিতে পারি নি।

৭।৮ নম্বরের চিত্র তুটী বরক'নের পিঁড়িচিত্র—আমার কোন বান্ধবীর বিবাহে নক্সা তুটী সংগ্রহ করি। লক্ষ্য করে দেখ্‌লে বিবাহের কতকগুলি মাঙ্গলিক নিদর্শন চোখে পড়ে—চাঁদমালা, চাঁদোয়া, ফুলের মালা, কদলীপত্র ও গুঁড়ি, বরণডালা, শঙ্খ, পদ্ম এবং প্রজাপতি। এই সমস্ত নিদর্শনের স্বাভাবিক চিত্ররূপে পিঁড়ি তুটী বিবাহ অনুষ্ঠানের মাঙ্গল্য এবং অর্থ বহন করে আছে।

আল্পনা সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে প্রথমেই বাংলার পল্লীগ্রামে অধুনা প্রায়শঃলুপ্ত ব্রতানুষ্ঠান, বিশেষ করে কুমারী ব্রতের কথা উল্লেখ করতে হয়। কুমারী ব্রতগুলি ঠিক খাঁটি ধর্ম্মানুষ্ঠান নয়, এগুলি কতকগুলি কল্পিত ব্রত, ধর্ম্মানুষ্ঠানের আচরণে প্রচলিত—যা আমাদের দেশের মেয়েরা বিবাহের পূর্ব্বে কিছুকাল ধরে পালন করত, এখনও পল্লী-গ্রামের মেয়েরা কতকগুলো পালন করে—এতে মেয়েদের মনে ধর্ম্মভাব ফুটে উঠ্‌ত এবং সুগৃহিণী হবার একটা আকাঙ্খা জেগে উঠ্‌ত। এই ব্রতগুলির মন্ত্র হল ছড়া এবং প্রতিচ্ছবি

হল আল্পনা—সেইজন্য আল্পনার উৎপত্তি প্রথমে এই ব্রত থেকেই।

বিবাহ, অন্নপ্রাশন, পূজা-পার্ব্বণ বা কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আল্পনার মূল্য শুধু আলঙ্কারিক কিন্তু কতকগুলি ব্রতে আল্পনার মূল্য অনেক-খানি—যে সব আল্পনাতে বাহারী আঁকাজোকার অর্থ-পূর্ণ ছবি সব। ব্রত অর্থে মনের কোন কামনা পূরণের জন্য একটা অনুষ্ঠান—ধর্ম্মানু-ষ্ঠানের ছাঁচে—ব্রতের আল্পনা সেই সমস্ত কামনার প্রতি-ছবি। এই সূত্রে আল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সারা বৎসরের কতকগুলি ব্রতের উল্লেখ করছি।

লক্ষ্মীপূজা মধুমথামের গোড়ায়—মিসেস্ পুরকায়স্থ

বৈশাখ মাসে হরির চরণ, রণে এয়ো এবং পুণ্যি পুকুর—এই তিনটী ব্রতের মধ্যে রণে এয়ো ব্রতে শুধু মেয়েরা অতি সরল একটী আল্পনা দেয়। আল্পনা দেওয়ার ঘটা জ্যৈষ্ঠ মাসে বসুধারা এবং ভাদ্র মাসে ভাতুলী ব্রত—এই তুটীতে বিশেষ ভাবে দেখা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামের জল আসে শুকিয়ে—বৃষ্টিকে কামনা করে ইন্দ্রদেবের কৃপালাভে অঙ্গনের এককোণে তিনটী গাছের মাঝে আল্পনা এঁকে মাটীর ঘট

পিঁড়ির নক্সা—মিসেস্ সরকার

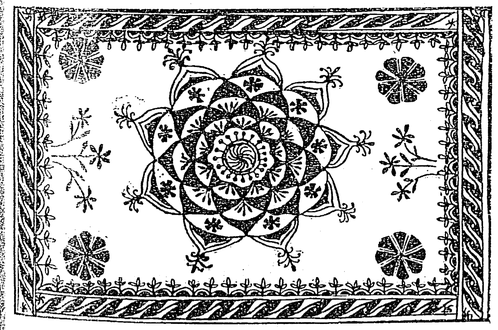

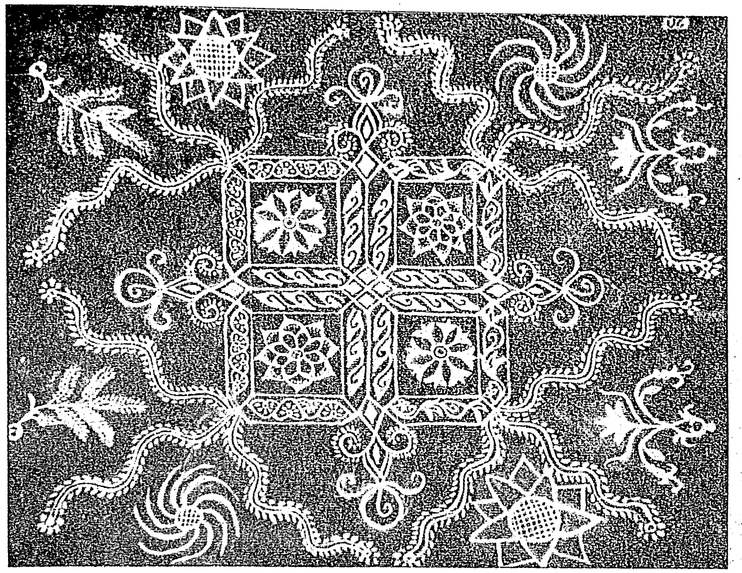

একটী ফুটো করে গাছের মাথায় ঝুলিয়ে দেয়। বৃষ্টির অনুকরণ করে জলের ঝারি করে মেয়েরা বসুদেবকে বারিধারার জন্য মিনতি করে ছড়া বলে যায়, বসুধারা ব্রতের আল্পনায় আটটী তারার উপর ফুল রেখে।

অষ্টবসু, অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী
আটদিকে আটফল আমরা রাখি

* * * *

কামনা— বসুধারা ব্রত করলাম
তিন বৃক্ষের মাঝে
মায়ের কুলে ফুল বাপের কুলে ফল
শ্বশুরের কুলে তারা।
তিন কুলে পড়বে জল
গঙ্গার ধারা॥

এই ব্রতটীতে উর্ব্বরতার তুক্ আছে। তুটী কামনা প্রকাশ পাচ্ছে—বৃষ্টি হয়ে ধরণী শস্যশ্যামলা হোক এবং ব্রতীর পরিবারেও আশীর্ব্বাদ করুক যাতে সংসার ফলে ফুলে বা সন্তানসন্ততিতে ভরে উঠুক। বৃষ্টির আনুকরণিক অনুষ্ঠানটীর মত জাসব ফ্রেজার সাহেবের 'গোল্ডন বুক্

পুস্তকে আদিম কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় উল্লিখিত আছে। আমাদের পাড়াগাঁয়েও অনেক সময় চাষারা এইরূপ করে থাকে। ইহা একটী হোমিওপ্যাথিক ম্যাজিক্।

ভাদ্র মাসে ভদ্রালীব্রত সারা মাস ধরে মেয়েরা উদ্‌যাপন করে। এই ব্রত বৃষ্টিবাদলার পরে আত্মীয় স্বজনের বিদেশ থেকে, সমুদ্রযাত্রা থেকে জলপথে স্থলপথে নিরাপদে ফিরে আসার কামনায় মেয়েরা ভাদুলীঠাকুরাণীর উদ্দেশ্যে ছড়া কেটে এবং আল্পনা দিয়ে পূজা করে।

এ নদী সে নদী একখানে মুখ
ভাদুলী ঠাকুরাণী ঘুচাবেন দুখ।

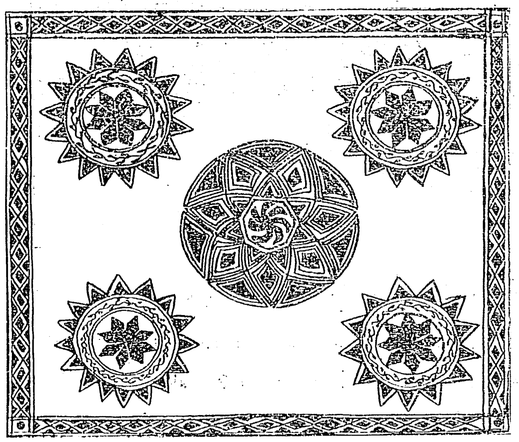

জলচৌকির নক্সা—রাণী সরকার

এ নদী সে নদী একখানে মুখ
দিবেন ভাদুলী তিনকুলে সুখ।

আল্পনাতে তাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়—তেরটী নদীর মুখ একটি বড় নদীর কূলের ফাঁকে ফাঁকে—ভরা ভাদ্র মাসে সবকটীই টলমল অবস্থায় সমুদ্রে মিশেছে গিয়ে—তার উপর ভেলা আঁকা—যেন ব্রতীর পিতামাতা তাতে চড়েই গেছেন বাণিজ্যে।

ভেলা! ভেলা! সমুদ্রে থেকো
আমার বাপ-ভাইরে মনে রেখো।

আল্পনায় একটী ভরা নদীতে দুটী নৌকায় দুটী পা রেখে অঙ্কিত ভাদুলী ঠাকুরাণী (ভাদ্রঋতুকে এইরূপভাবে দেবীর মত পূজা করা হয়) তাঁর মাথায় জোড়া ছত্র (quanti-religious diety).

জোড়-জোড়-জোড় সোনার ছত্তর জোড় নৌকায় পা।
আস্‌তে যেতে কুশল করবেন ভাদুলী মা॥

ভাদুলী ব্রতের আল্পনায় কুমারীমনের অর্থহীন বা অর্থপূর্ণ বহু দ্রব্যের ছবির সমাবেশ থাকে। আল্পনাও কতকগুলি, একটীতে ধরুন বনের ছবি, গাছপালা, তালগাছ, কাক বা বাবুয়ের বাসা, কাঁটার পাহাড়, বন্য মহিষ বা বাঘ ইত্যাদি (zoomorphic) নক্সা। ব্রতীরা জোড় হাত ক'রে বল্‌বে—

"বনের বাঘ বনের বাঘ
তোমরা নিও না আমার বাপ-ভায়ের দোষ।"

পাছে বনের পথে আস্‌তে আসতে পিতা কি ভায়েরা আক্রান্ত হয় এই ভয়ে তাদের মঙ্গলকামনায় ব্যাঘ্রদেবকে আল্পনায় প্রতিমূর্তি করে ছড়ার মন্ত্রে পূজা দেওয়া হচ্ছে। বনদেবীকেও মিনতি—তারা যেন কুশলে ফেরে, তাহলে

'তোমার হোক সোনার পিঁড়ি
যদি কুশলে তারা আসেন আপন বাড়ী।'

আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমায় বাংলাদেশে যে লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান হয় সেটী শস্যশ্যামলা পৃথিবীকে নমস্কার জানানো সাধারণভাবে হৈমন্তিক উৎসব (harvest festival) বল্লেও অন্যায় হবে না। এই দিনে কুমারী এবং বিবাহিতা মেয়েরা শাস্ত্রীয় ব্রত উদ্‌যাপন করে। এই লক্ষ্মীপূজায় আল্পনা একটী প্রধান অঙ্গ। "সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীপূজা, সকাল হতে মেয়েরা ঘরগুলি আল্পনায় বিচিত্র পদ্ম, লতাপাতা এঁকে সাজিয়ে তোলে—লক্ষ্মীর পাঁড়া বা পদচিহ্ন, লক্ষ্মীপ্যাঁচা এবং ধানছড়া হল আল্পনার প্রধান বস্তু।"* মধুমথামের গোড়ায় নানা আল্পনা দেওয়া লক্ষ্মীর চৌকি পাতা—তার উপর আঁকা লক্ষ্মীর মুকুট, পা, পেঁচা, ধানছড়া, গহনা, পদ্ম, কড়ি, ফুল, সিঁদুর-চুবড়ি, চিরুণি, দর্পণ ইত্যাদি। গহনার মধ্যে পুরাতনী তাবিজ, পাসা, হাঁসুলী, বাজু, নূপুর, নথ, কঙ্কন এবং কানবালা কিছুই বাদ যায় না দেখেছি।

লক্ষ্মীদেবী আসবেন তাই তাঁর আগমনের পথে ধানছড়া,

* বাংলার ব্রত—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লক্ষ্মীরচরণ, পদ্ম, কল্মিলতা, শঙ্খলতা, দোপাটিলতা, খুন্তিলতা বা খইয়ে লতা, পদ্মপাতা, কদলীপত্র প্রভৃতি শিল্পীর তুলিগত আঁকা দেখ্‌তে পাই —আমাদের শহরে এটী শুধু চৌকাঠের উপর একটী দুটী করে লতা বা ঢেউ-খেলানো সরল রৈখিক অঙ্কনে এসে ঠেকেছে। তার মাঝে খুন্তিও পাবেন না, ... ও পাবেন না, বড় জোর ... ত কতকগুলি ফোঁটা (punch marks) মাদ্রাজী আল্পনার মত দেখতে পাওয়া যায়। মাদ্রাজী আল্পনা বলাতে আমি তা মিলকোনারী মেয়েদের আল্পনার নিন্দা করছি না—কারণ যেরকম শুনি তাতে দক্ষিণভারতে যে খুব সুন্দর সুন্দর আল্পনা দেওয়ার চলিত আছে তার পরিচয় পাই।

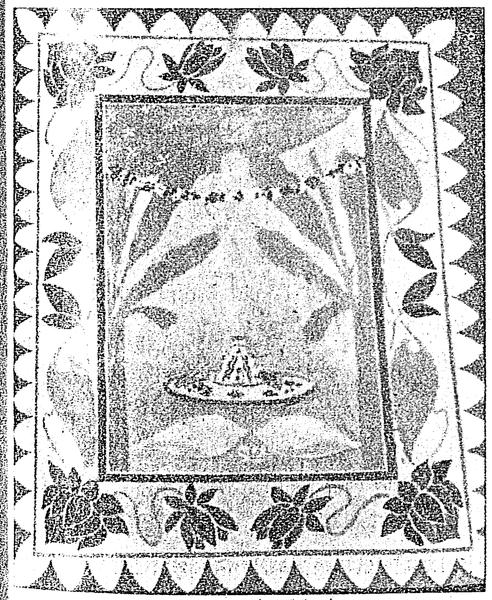

৭। বিবাহে বরের পিঁড়ি—কল্যাণী দেবী

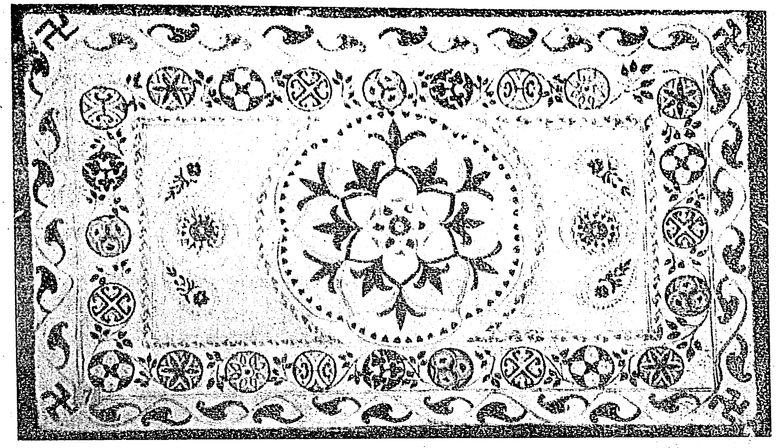

মা-ঠাকুরমাদের কাছে শুনেছি, কার্তিক অগ্রাণ মাসে তাঁরা সেঁজুতি ব্রত করতেন কুমারী বয়সে। পল্লীগ্রামের মেয়েরা কোন কোন জায়গায় এখনও করে থাকে। এই ব্রতটীও একটী মাস ধরে উদ্‌যাপিত হয়। সেঁজুতি ব্রতে আল্পনা হল অন্যতম প্রধান অঙ্গ—বেশ বড় গোছের ব্রত বলে সেঁজুতির আল্পনায় চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের জিনিষ রূপায়িত হয়ে ব্রতীর মনস্কামনা পূরণে ছড়ার সহিত সংযুক্তভাবে সহায়তা করে। এই চল্লিশ-পঞ্চাশ রকম দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি অদ্ভুতের পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য্য, চন্দ্র, গঙ্গা, যমুনা, বেগুনপাতা, কাকুলিগাছ, অশথবৃক্ষ, মাকড়সা, ময়না, উদ্‌বেরালী, সোনার থালে ক্ষীরের লাড়ু প্রভৃতি। সাধারণত গৃহপালিত পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ—যাদের সঙ্গে ব্রতীর চাক্ষুষ পরিচয় থাকে তাদেরই আঁকা আকার সেঁজুতি আল্পনায় চোখে পড়ে।

অন্নপ্রাশনের পিঁড়ি—মাধুরী দাশগুপ্তা

ছড়াগুলিও তেমনি একসুরে ছেলেমানুষী অর্থহীন ভাব প্রকাশ করে—বেগুনপাতায় আল্‌পনার হাত রেখে মেয়েরা বলে—

"বেগুনপাতা ঢোলা-ঢোলা
মার কোলে সোনার তালা।"

মাকড়সায়—"মাকড়সা, মাকড়সা চিত্রের ফোঁটা
মা যেন বিয়োয় চাঁদপানা বেটা।"

অনেক সময় এই সব ধরণের ছড়া কিশোরীদের মুখে

পাকামোর মত শোনায় বটে, কিন্তু তৎকালীন ধনধান্যভরা ফলে ফুলে ভরা বাংলাদেশের সুখী একান্নবর্ত্তী সংসারের মেয়েদের মুখে এমনি সব সরল কামনা ফুটে উঠ্‌ত ছড়াতে।

গঙ্গা যমুনা জুড়ি হয়ে,
সাত ভেয়ের বোন হয়ে,
সাবিত্রী সমান হয়ে
গঙ্গা যমুনা পূজ্যন্
সোনার থালে ভুজ্যন্।

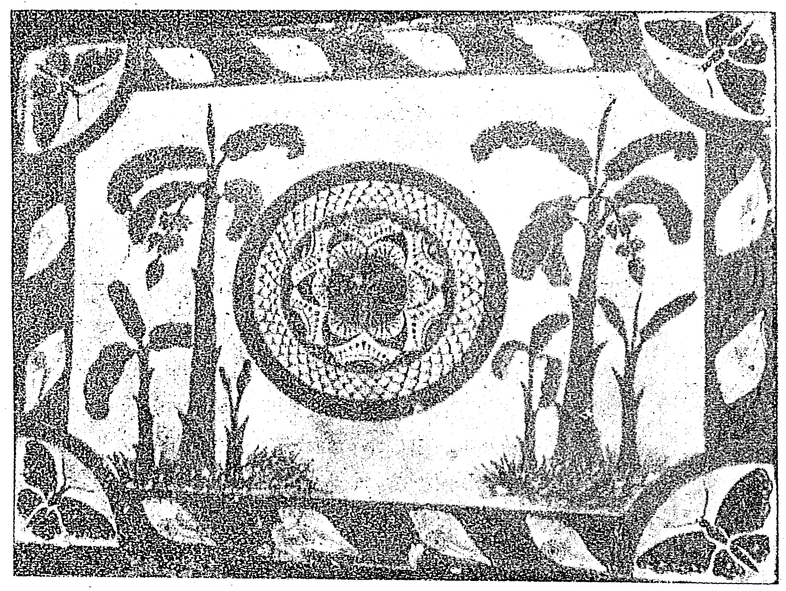

সম্প্রদানে ক'নের পিঁড়ি—প্রতিমা দাশগুপ্তা

চন্দ্র সূর্য্য পূজ্যন্
সোনার থালে ভুজ্যন
সোনার থালে ক্ষীরের লাড়ু,
ইত্যাদি—

ছন্দ মেলাতে বহু বাছাই বস্তুর আবির্ভাব হয়ে থাকে। যেমন—

ময়না, ময়না, ময়না
সতীন যেন হয় না

বিবাহিত জীবনে সতীন থাকা কোন্ মেয়ে সহ্য করে? সেই কামনা প্রকাশ করতে ময়নারই ডাক পড়েছে ছন্দ মেলাবার জন্য—যদিও টিয়া বা কাকাতুয়া ও ব্রতীর বাড়ীর অঙ্গনে আছে। দু-এক জায়গায় শুনেছি, ছন্দ মেলাতে হাতের কাছে চুল বাঁধবার আয়নারও খোঁজ পড়ে আলপনাতেও আঁকা হয়।

আয়না আয়না, আয়না
সতীন যেন হয় না
অশথ কেটে বসত করি
সতীন কেটে আল্‌তা পরি
বঁটী বঁটী বঁটী
সতীনের শ্রাদ্ধে কুট্‌নো কুটি।

ঘরকন্নার কাজে প্রতিদিনকার ব্যবহার্য্য দ্রব্যের ছবি চোখে পড়ে বেশী, কারণ ব্রতীর ক্ষুদ্র পৃথিবীর মাঝে তাদেরই স্থান [illegible]ক।

পৌষ সংক্রা[illegible] থেকে মাঘ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত [illegible]তি সন্ধ্যায় তারা ব্রত পালন করে মেয়েরা। প্রথমে আল্পনা আঁকা—চন্দ্র, সূর্য্য, তারা—সূর্য্য মস্ত গোলাকার, চন্দ্র অর্দ্ধগোলাকৃতি তারা ফোঁটা ফোঁটা। তারা থাকে ষোলটী, সবগুলিই সাঙ্কেতিক চিত্র—এ ছাড়া মান্দার, চিরুনি, কৌটা, আয়না, পালকী, আসন, বলদ, নৌকা প্রভৃতিও আল্পনায় থাকে। আল্পনা এঁকে ব্রতীরা ছড়া বলতে থাকে—

ষোল ষোল তারা তোমরা হয়ো সাক্ষী
ঘৃত দিয়া করি মোরা পঞ্চগ্রাসী
* * * *
চন্দ্র সূর্য্যে দিয়া ফুল
ভরিয়া উঠুক তিন কুল

ম্যালথসের থিওড়ি বোধ হয় তখনও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েনি, নইলে বংশে বংশে সন্তান কামনার অতি-বাহুল্য ব্রতীদের ছড়াতে এতটা প্রকাশ পেত না।

তার পূজা করে যে সাত ভাইয়ের বোন সে
সাবিত্রীর সমান সে।
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী
কাঁখে পুতে সরু শাঁখা জন্ম জন্ম আয়ুষ্মতী।

আল্পনায় তারা ব্রতের ভূমণ্ডল অনেক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে মেয়েরা এঁকে থাকে। পদ্ম এবং অনেক রকমের সূক্ষ্ম আলঙ্কারিক চিত্র বিচিত্রতার সমাবেশে বা খুঁটি নাটি দ্রব্যের অর্থ সহযোগে যাদের অর্থ গ্রহনক্ষত্রদের তৃপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

মাঘ মাসের দুটী চতুর্থী তিথিতে ত্রিভুবন চতুর্থী বলে একটী ব্রত [illegible]ষ্ঠিত হয়। এই ব্রতে চাল, সরা, জল, কাঁটাল পাতা, আমের পল্লব, সলতের আগুন, ফুল, দূর্ব্বা, চন্দন প্রভৃতি পূজার দ্রব্যের সহিত আল্পনারও অস্তিত্ব থাকে। প্রাতঃকালে ব্রতীরা স্নান সমাপন করে শুদ্ধ পট্টবস্ত্র পরিধান করে পরিষ্কার উঠানে আল্পনা আঁকে—যেটী পুরাদস্তুর জেমিতিক নক্সার একটা গোলাকার মণ্ডল ত্রিভুবন বা পৃথিবীকে অর্থ করে। এই ব্রতটাই আমার মনে হয় চৈত্র সংক্রান্তির পৃথিবী ব্রত। ছোট-বড় কুমারী-সধবা সব মেয়ে মিলেই বর্ষশেষ দিনটিতে বসুন্ধরা ত্রিভুবনকে এই ব্রত পালন করে নমস্কার জানায়। আল্পনা সহজ ধরণের হলেও অর্থসূচক এবং ভাবের প্রকাশ তাতে বিশেষ পাওয়া যায়।

পদ্মের ঝাড়, পদ্মের ঝাড়ে পদ্ম পুষ্প—পদ্ম পাতার উপর বসুমতীর মণ্ডল—এই কটী জিনিষের আল্পনায় পৃথিবী সম্বন্ধে এক সুন্দর ভাব বহন করে।

এস পৃথিবী, বস পদ্মপাতে
শঙ্খ চক্র গদা হাতে।

দুঃখিনী ব্রতী বলে—

বসুমতী দেবী গো, করি নমস্কার
পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার।

ব্রতের সঙ্গে জড়িত আল্পনাগুলি মূলত অর্থপূর্ণ এবং প্রতীক ভাবাপন্ন; কিন্তু আলঙ্কারিক আল্পনা যা বর্ত্তমানে বেশী চলতি—তাতে বিশেষ কোন অর্থ সব সময় থাকে না—বরঞ্চ তাদের সৌন্দর্য্যবিধায়ক মূল্যের জন্য মেয়েদের রস-শিল্প-জ্ঞানের উচ্চ পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রতজড়িত আল্পনাগুলিতে বহু সময় দেখেছি একটু আদিম কালোচিত প্রাচীন বা অপরিপক্কতা চোখে পড়ে—সেইজন্যই বোধ করি ব্রতের আল্পনা আজকাল হ্রাস পেয়েছে।

হাতে পো, কাঁখে পো, তোরে পূজলে কি হয়?
শাঁখা হয়, সুখো হয়, সাত পুতির মা হয়।

শহুরে মেয়েদের কাছে এরূপ ছড়া যেমন রুচিবিগর্হিত এর আল্পনাও তেমনি সভ্য মানবের কাছে অচল; হাতে পো, কাঁখে পো এবং মাতা এদের রূপ আল্পনার নক্সায় যা রূপায়িত তার ঠিক সমান মনুষ্য আকার Mas-D-Azilএ (স্পেনের) আজিলিয়ান যুগের গহ্বরে, ঘাটশীলার রক্ কার্ভিং * প্রভৃতি প্রস্তর যুগের অঙ্কন শিল্পে (Palaeolithic

হাতে পো কাঁখে পো—"বাংলার ব্রত"

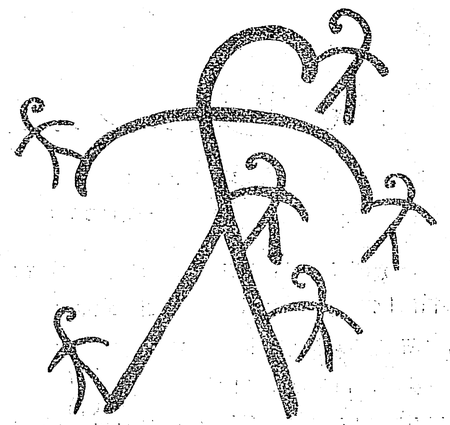

art) পাওয়া গেছে। জন্তু জানোয়ারের মূর্ত্তি ও পাড়াগাঁয়ে ব্রত আল্পনাতে যে রকম পাওয়া যায় তার হুবহু মিল আমি কয়েকটী প্রস্তর যুগের শিল্পে লক্ষ্য করেছি। সেইজন্য ব্রতের আল্পনার কতকগুলি নক্সা যে পল্লীশিল্পের খুব নিম্নস্তরের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু কতকগুলি আবার যেমন পৃথিবী ব্রতের বা তারার ভূমণ্ডলে পল্লীশিল্পের উন্নত নমুনাই মেলে।

আমার সংগৃহীত আল্পনাগুলি অলঙ্কারের দিক থেকে অতি সুন্দর বলতে পারি। এই রকম অসংখ্য ধরণের বাহারী সূক্ষ্ম পদ্ম—বৌছত্র পদ্ম, যাত্রা কলসের পদ্ম, বরযাত্রীর পদ্ম, জোড়া পদ্ম ইত্যাদি সবই মেয়ে শিল্পীরা আঁকেন—যার কদর হয়ত কেউ করেন না, কিন্তু কলারসিক

* Prehistoric India : Panchanan Mitra.

মহলে যে তার দাম কত, তা শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ এবং শ্রীযুক্তগুরুসদয় দত্ত মহাশয়দের কার্য্যাবলীর যাঁরা খোঁজ রাখেন তাঁরাই জানেন।

এই সহজাত শিল্পী মেয়েদের কাছ থেকে যে আমরা কত শত নক্সা পাই তার হিসাব থাকে না—বাহারী করতে পঞ্চাশ রকমের লতারই আমদানি হয়েছে। নামও কেমন—দোপাটি লতা, পদ্ম লতা, খুন্তি লতা, দালানী লতা, খইয়ে লতা, চালতা লতা, করঞ্চ লতা, বাউটি লতা,

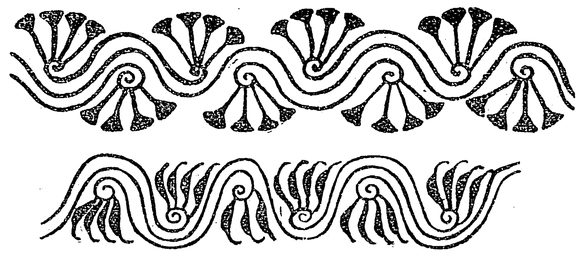

খুন্তিলতা ও কদলীলতা

—সুধাংশু রায়

চাঁপা লতা, শঙ্খ লতা, মুক্ত লতা প্রভৃতি—লতার মত আঁকাবাঁকা ঢেউ (waveline) রেখা এঁকে তার মধ্যে ফুল, পদ্ম ফুল, খুন্তি, চালতা, মুক্ত এই সব আঁকা থাকে বলে অদ্ভুত লতার আবির্ভাব।

নক্সার অন্ত নেই—"New patterns are constantly originated by the women who in this case dream the new designs."—Goldenwiser ছড়াব্রতের আল্পনার ধরণে পল্লীর শিল্প আমরা আদিম সমাজের মেয়েদের মধ্যে প্রচুর দেখ্‌তে পাই, নিকটেই সাঁওতাল পরগণা বা ছোটনাগপুরের সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, বীরোহড়, হো প্রভৃতি আদিম জাতির বসতিতে আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন তাদের মেয়েরা দেয়ালে কত রকমের জ্যামিতিক চিত্র এঁকে থাকে সাদা রঙে। সেইজন্য ব্রত আল্পনার চিত্রগুলি আমি পল্লীশিল্পের খুব আদিম স্তর বলেই ধরে থাকি—সেই সমস্ত চোখে না পড়ায় দুঃখ করবার নেই। তবে আড়ালে তার চর্চ্চা নিতান্তই দরকার এইজন্য যে, চিত্রশিল্পের সঙ্গে যাঁরা (যে সব মেয়েরা) ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত

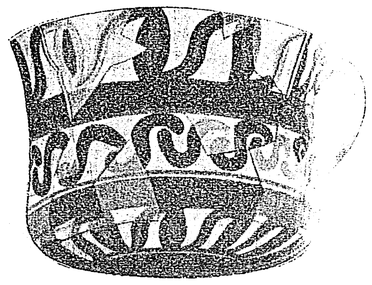

আমেরিকার পুরাতন সভ্যতার

মৃৎশিল্পে আলঙ্কারিক চিত্র

হবেন তাঁদের এই ধরণের আল্পনা এঁকেই হাতে খড়ি এবং শিক্ষারম্ভ হবে।

শহরে শ্বেতপাথরে ফুলকাটা বেদীতে যে দেবীপূজা হয় তার চেয়ে অনেক সুন্দর লাগে সাধারণ মেঝের উপর আল্পনার বেদী। সে সমস্ত প্রসাধনের দাম দেওয়া যায় না, কিন্তু সাধারণে তার কদর করে না বলেই আজ আল্পনা শিল্প লুপ্ত হতে বসেছে। আজকাল মেয়েরা চর্চ্চা করেন না, তার কারণ তাঁরা নিজেরাও শিল্পানুরাগী নন এবং তাঁদের আল্পনার গুণ বুঝবার মত কলারসিকও অতি অল্প।

ঘাটওয়ালা

শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র

ওদিক হইতে দু'খানা নৌকা ছপছপ শব্দ করিয়া দাঁড় বাহিয়া ক্রমশ গঙ্গার দিকে আগাইয়া আসিতেছিল। ঘুমের ঘোরে শব্দ পাইয়া ঘাটওয়ালা বুড়া ফকিরচাঁদ সজাগ হইয়া উঠিয়া সাড়া দিল, কে! কোথায় এতরাত্রে?

নৌকারোহীদের মধ্যে একজন সাড়া দিল, যাত্রী গো—তুমি উঠে এস—

যাত্রী—অর্থাৎ কোন দূর গ্রামের বাসিন্দা তাহার কোন আত্মীয় বা আত্মীয়ার পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাস কামনায় তাহার মৃতদেহ এই সুদূর দেশের গঙ্গাতীরে বহন করিয়া আনিতেছে।

গঙ্গার উভয়তীরে শ্মশান—ফকিরচাঁদের জমিদারী। জায়গা অবশ্য ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের, তবে ফকিরচাঁদ জমা লইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে, এমন কি, বহু দূর দূরান্তর হইতেও লোকে এখানে মৃতদেহ দাহ করিতে আসে। কারণ এদিকে শ্মশান বলিতে এই একটিই। প্রত্যেকটি মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য মৃতদেহ আনয়নকারী ব্যক্তিকে পাঁচসিকা হইতে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত ফকিরচাঁদকে দিতে হয়···অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা। কাহার কি রকম অবস্থা, ফকিরচাঁদ তাহা কথার ধরণেই বুঝিতে পারে।

নৌকারোহীর কথায় ফকিরচাঁদের আনন্দ হইবারই কথা। গোমড়কে মুচির পার্ব্বণ···মানুষ যত মরিবে ফকিরচাঁদের ততই লাভ, কিন্তু ফকিরচাঁদ খুশী হওয়ার পরিবর্ত্তে বিরক্তই হইল; তাহার বিরক্ত হইবার কারণ, তাহার বয়স হইয়াছে, ঘাটেরও উপর তাহার বয়স। এ বয়সে সে আর রাত্রিকালে উঠিয়া মড়ার খবরদারী করিতে পারে না। তাই মাচার উপরকার সুখশয্যা ত্যাগ করিয়া সে আপন মনে বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, "পারি না বাপু, যত লোকের মরণ হতে হয় কি এই রাত্রে? এতবড় দিনটা গেল সেই সময়ে ত আসতে পারতিস, তা নয়··· কোথায় এই শীতের রাত্রে বেশ একটু মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমব, তা নয়, এল জ্বালাতন করতে—"

কিন্তু বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে উঠিয়া বসিল। একটা পুরান কোট গায়ে দিয়া মাথায় একখানা ছেঁড়া গায়ের কাপড় জড়াইয়া সে ঘাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া স্ত্রীকে ডাকিল, "ও ফুলটুসির মা, ফুলটুসির মা, শুনচিস্—আমি ঘাটে চললাম—উঠে দরজাটা দে।"

ফুলটুসির মা'র তখন নাসিকা গর্জ্জন সুরু হইয়াছে। সে ফকিরচাঁদের ডাকে সাড়া দিল না। ফকিরচাঁদ কিছুক্ষণ হতাশভাবে নিদ্রিতা স্ত্রীর পানে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনে বলিল, "মরেছে রে, মাগী নাক ডাকাচ্ছে—এখন কি আর ওর ঘুম ভাঙ্গবে। শালী যেন কুম্ভকর্ণ, পড়েছে কি মরেছে—আর ওর কানের কাছে নখ্যিগণ্ডা জয় ঢাক বাজালিও সাড়া পাওয়া যাবে না। ইচ্ছে করে, দিই ওই মা গঙ্গার জল মাগীর গায়ে ঘড়া ক'রে ঢেলে!"

তখন সে দরজাটা বাহির হইতে ভেজাইয়া দিয়া তাহার য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট রতনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

নিকটেই রতনের ঘর—সেও তখন নিদ্রিত; ফকিরচাঁদের ডাকাডাকিতে রতনের স্ত্রী রতনকে ডাকিতে লাগিল। দুই-তিন ডাকেও যখন রতনের সাড়া পাওয়া গেল না, তখন ফকিরচাঁদ বাহির হইতে রতনের স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও হারামজাদার ঘুম ভাঙ্গানো কি আর তোমার কম্ম মা—ও তোমার কম্ম লয়, তুমি বরং দরজাটা খুলে দাও, আমিই একবার দেখি।"

রতনের স্ত্রী দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। ফকিরচাঁদ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া হাতের মোটা লাঠিটা দিয়া রতনের পশ্চাদ্দেশে গুঁতা মারিতে মারিতে বলিল, "হেই-হেই রত্না, হেই শালা, ওঠ ওঠ, যাত্রী এয়েছে—"

ফকিরচাঁদ সম্পর্কে রতনের খুড়া হয়।

গুঁতা খাইয়া রতনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তন্দ্রাজড়িত চোখ না মেলিয়া একটা শব্দ করিল, "ওঁক!"

ফকিরচাঁদ ভেংচি কাটিয়া বলিল, "ওঁক! সুসুন্ধিরপো

আজও তাড়ি খেয়ে মরিচিস্—ও শূয়োরের গু মুচির গু না খেলেই নয় ?”

এইবার রতনের ঘুম একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিল, “কে, খুড়োমশায় ?”

“হ্যাঁরে শালা হ্যাঁ—মরিচিস্ ত তাড়ি খেয়ে, তবে চ’ আজ তোকেই ওই চিলুতে দিয়ে আসি—”

অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে বধূটি একবার হয় ত শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু ফকিরচাঁদ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না, বলিল, “চ, যাত্রী এয়েছে।”

চোখ রগড়াইয়া রতন বলিল, “হ, এই শীতের রাত্রে যাচ্ছে।”

হাসিয়া ফকির বলিল, “পয়সা পালি যে সব শীত গরম হয়ে যাবে বাপধন। নে চ—”

অগত্যা রতনকেও উঠিতে হইল।

দুইজনে শ্মশানে আসিয়া দেখিল শববাহীর দল ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়াইয়াছে ; এমন কি, সকলে গঙ্গাতীরে অবতরণ করিয়া শবদাহ করিবার জন্য জোগাড় যন্ত্র করিতেও সুরু করিয়াছে। একজন লোক একপাশে বসিয়া বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে নিজের নির্দ্দেশানুসারে সকলকে কাজ করিবার জন্য আদেশ করিতেছিল, ফকিরচাঁদ তাহাকে চিনিল, সে গুরুচরণ বাঁড়ুয্যে ; বহুবার বহু শব লইয়া সে এই ফকিরচাঁদের ঘাটে আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ফকিরচাঁদ আগাইয়া গিয়া বলিল, “পেরণাম দাঁঠাকুর, এত রাত্রে এ গরীব ফকিরচাঁদের কাছে কি মনে করে আসা হল ? দ্যান, একটা বিড়ি দ্যান্—”

বলিয়া গুরুচরণের হাত দুই তফাতে উঁচু হইয়া বসিল। গুরুচরণ একটা বিড়ি বাহির করিয়া ফকিরের প্রসারিত হাতের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, “হ্যাঁ, তোমার কাছেই এলাম ফকিরচাঁদ।”

“আজ্ঞে আসতিই যে হবে—এ সময়ে যে মোর জমিদারী ছাড়া আপনাদের ঠাঁই নেই, মুই যে আপনাদের শ্যাযের দিনের ফকিরচাঁদ···তারপর, ক’গণ্ডা হল ?”

অর্থাৎ এই মৃতদেহটি লইয়া গুরুচরণের কয়টি মৃতদেহ দাহ করা হইল।

গুরুচরণ হাসিয়া বলিল, “শট্‌কে গণ্ডাকের কোঠা অনেক দিন ছাড়িয়ে এসেছি ফকিরচাঁদ, এখন বুড়ি-পণ যদি কিছু থাকে ত তাই বল”।

ফকিরচাঁদ মূর্খ, বুড়ি-পণ কথা দুইটার অর্থ সে বুঝিল না, তথাপি টানিয়া টানিয়া হাসিয়া বলিল, “বুড়ি, পণ, হ হ—”

মৃতদেহকে স্নান করাইবার জন্য তীরে নামান হইল। রমণীর মৃতদেহ,বয়স তাহার উনিশ কি কুড়ি বৎসর, সিঁথিতে সিন্দূর, পরণে লাল পাড় শাড়ী। ফকিরচাঁদ বলিল, “এঃ ! এ যে মেয়েছেলে, একেবারে কচি বাচ্চা—”

দুজন লোক একটু দূরে দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে গুরুচরণের সহিত কি পরামর্শ করিতেছিল। পরামর্শ সাঙ্গ হইলে গুরুচরণ আগাইয়া আসিয়া বলিল, “একটা কাজ করতে হবে যে ফকিরচাঁদ।”

—“আজ্ঞে করেন—”

—“মানে, মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা ছিল, এই দশ মাস, তা ছেলেটা বার করতে হবে ত।”

উৎসাহ সহকারে ফকিরচাঁদ বলিল, “আজ্ঞে, তা হবেনই ত—তা সে আর বেশী কথা কি, আপনি হুকুম করলেই এখুনি সব ব্যবস্থা ক’রে দিচ্ছি, কিন্তু এ কাজে যে আমাদের কিঞ্চিৎ পাওনা-থোওনা আছে দাঠাকুর—”

গুরুচরণ হাসিয়া বলিল, “সে কি আমার জানা নেই—বলে এই ক’রে বুড়ো হলাম।”

“আজ্ঞে, বটেই ত—”বলিয়া সায় দিয়া ফকির ডাকিল, “রত্না, অ রত্না ! এই মরেছে—আবার ঘুমুচ্ছে—”

রতনের বোধ হয় একটু তন্দ্রামত আসিয়াছিল, ডাক শুনিয়া বলিল, “কি কও ?”

—“মা লক্ষ্মীর প্যাট থেকে ছেলেটা বার করতি হবে।”

—“সে আর বেশী কথাডা কি ?” রতন বলিল, “ট্যাকা দাও, আর একখানা ছুরি দাও।”

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একজনের নিকট হইতে একখানা পেন্সিলকাটা ছুরি পাওয়া গেল। রতন ছুরি লইয়া বলিল, “বাবুমশায়রা ট্যাকা আগে দাও, নইলে যে শ্যাযে খচাই করবা, সিটি হবে না—এককুড়ি ট্যাকার কম এ কাজ হবে না।”

কিছুক্ষণ দর কষাকষির পর শেষে একখানি পাঁচ টাকার নোট হাতে পাইয়া রতন ছুরি ধরিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গর্ভস্থ শিশু সুকৌশলে বাহির করিয়া আলোকে শিশুর মুখ দেখিয়া বলিল, “ইঃ ! বেটাছেলে—ছেলে নয় ত যেন

রাজপুত্তুর, মুখখানা নাল টক্‌টক্ করছে, টুস্‌কী মারলে রক্ত পড়বে—”

ভোর রাতে সকল কার্য্য সমাপ্ত হইল। গুরুচরণ চিতা নিভাইয়া আসিয়া ফকিরচাঁদের সম্মুখে টাকা ধরিতেই ফকির-চাঁদ অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিল, “কও কথা, এ তুমি কি দেছ দাঁঠাকুর, এ কাজ এককুড়ি পাঁচের কম হবারই নয়—”

গুরুচরণ গম্ভীর হইয়া বলিল, “ওকথা আর বল না ফকিরচাঁদ।” তারপর একজন প্রৌঢ়কে দেখাইয়া বলিল, “এঁয়ার মেয়ে—এই সেদিন এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, এখনও দুটো বছর পার হয়নি। রাজরাণীর মত মেয়ে চলে গেল, আর উনি বুড়ো বাপ রইলেন —এ ক্ষেত্রে ও কথা আর বল না—”

অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফকিরচাঁদকে পাঁচসিকা পয়সা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। গুরুচরণ তাহার দলবল লইয়া গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ফকিরচাঁদও রতনকে লইয়া তাহার ছোট্ট ডিঙি’খানিতে উঠিয়া বসিল। ডিঙি বাহিতে বাহিতে রতন বলিল, “ইঃ ! কথা কয় কি—বলে কি না এই সিদিনে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে এক কাঁড়ি ট্যাকা খরচ করে ; হ, তাই বুঝি মোদের হক্কের ধন মারা যাবে ? ইঃ ! লো—মোরা এক কাঁড়ি ট্যাকা দে ঘাট জমা নেইনি—”

ফকিরচাঁদ বুঝিল যে শ্রীমান রতনচন্দ্রের তাড়ির নেশা এখনও কাটে নাই ; কিন্তু তাহারও অন্তর হইতে গুরুচরণের কথার ঝঙ্কারগুলি এখনও সম্পূর্ণ দূর হইয়া যায় নাই। যাহারা শবদাহ করিতে আসে তাহারাও মানুষ, আর সেও মানুষ ; যদিও সে দরিদ্র অস্পৃশ্য, তথাপি সেও মানুষ ; কিন্তু তাহাদের সহিত ফকিরচাঁদের কত প্রভেদ। একদল যখন শোকে মুহ্যমান, সে সময়ে সে অন্তরে আনন্দ অনুভব করে। কি, না সে কিছু পয়সা পাইবে। অথচ অপর সকলেরই মত তাহারও সুখ আছে, দুঃখ আছে, অনুভূতি আছে, নিজের প্রিয়জনের বিয়োগে সেও ব্যথা অনুভব করে।

রতন বলিল, “শালার মানুষ মরে কই ? না হয় মার বয়া, না হয় ওলাবিবির পেরকোপ···হি···হি···ওলাবিবির পেরকোপে একেবারে গাঁকে গাঁ উজোড় হয়ে যায় ত হি—হি—কি পয়সাই লুটি খুড়ো—”

ফকিরচাঁদ তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, “তোর মাতলামি এখন বন্দ কর্ রত্না—”

দিন তিন-চার পরে ফকিরচাঁদকে ভোরবেলায় নিজের কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া ধূমপান করিতে দেখা গেল। আজ আবার ভোর রাত্রে একজনেরা শবদাহ করিতে আসিয়াছিল। ফকিরচাঁদ তাহার পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। ফকিরচাঁদের একপার্শ্বে তিনগাছি নীল কাঁচের চুড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। চুড়ি কয়গাছি দেখিলেই বোঝা যায় যে, কোন বালিকার চুড়ি। প্রকৃত ঘটনাও তাহাই। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যাহার মৃতদেহ গঙ্গার পরপারে চিতার আগুনে ভস্মসাৎ হইয়া গেল, সে একটি বছর সাতেকের বালিকা, চুড়ি কয়গাছি তাহারই। বালিকার পিতা সযত্নে কন্যার হাত হইতে চুড়ি কয়গাছি খুলিয়া লইয়া একপার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছিল, নষ্ট করিতে পারে নাই, তাই ফকিরচাঁদ কুড়াইয়া আনিয়াছে। তাহার কন্যা ফুলটুসীর রং ফর্সা—তাহাকে এ চুড়ি পরিলে বেশ মানাইবে।

একটা সমস্যায় পড়িয়াছে ফকিরচাঁদ, একটা কথা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না। বালিকার পিতা, কন্যার মৃতদেহটাকে অনায়াসেই দাহ করিয়া গেল ; অথচ কন্যার হাতের চুড়ি কয়গাছিকে নষ্ট না করিয়া সযত্নে খুলিয়া রাখিয়া গেল কেন ? ভাবিল, হয় ত বা এই বালিকার পিতাও তাহারই মত দরিদ্র। একদিন ফুলটুসি ফকিরচাঁদের কাছে একটি সিল্কের জামা চাহিয়াছিল, কিন্তু ফকিরচাঁদ দরিদ্র বলিয়াই তাহা দিতে পারে নাই। তাহার জন্য ফুলটুসি কত কাঁদিয়াছে, কত উপবাস দিয়াছে। এই বালিকাটির পিতাও হয় ত কন্যার ক্রন্দনে উপবাসে বিচলিত হইয়া এই কয়গাছি কাঁচের চুড়ি কন্যাকে উপহার দিয়াছিল ; সে স্মৃতি যে কত দুঃখের, কত ব্যথার, যে ভুক্তভোগী নয় সে তাহা বুঝিবে না। আজ সে তাহার কন্যাকে সংসার হইতে চিরদিনের জন্য লুপ্ত করিয়া দিয়া গেল, বালিকার অস্থিকঙ্কাল, এই শ্মশানের অস্থিকঙ্কাল করোটির সহিত মিশিয়া গেল, তথাপি সেই দিনের সেই বেদনাহত মুহূর্ত্তটির কথা স্মরণ করিয়া আর সে এই চুড়ি কয়গাছিকে নষ্ট করিতে পারে নাই। ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়া গেল। ফকিরচাঁদ বিকৃত কণ্ঠস্বরে আপন মনে গাহিতে লাগিল—

"জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর—"

ফকিরচাঁদের চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী ফুলটুসির মা নয়নতারা স্বামীর অপূর্ব্ব কলাময় কণ্ঠস্বরে জাগিয়া উঠিয়া সাড়া দিল, "বলি, রাত পোয়াতে না পোয়াতে কি বলদের মত না চেঁচালেই নয়?"

ফকিরচাঁদ, নয়নতারা যাহাতে না শুনিতে পায়, এমন ভাবে আপন মনে বলিল, "এঃ! তেজ দেখ না, যেন নবাবজাদী, তাই এইবেলা তিন পহর পর্য্যন্ত সোনার খাটে গা'দে, রূপোর খাটে পা'দে পড়ে পড়ে ঘুম মারবেন—"

কিন্তু নয়নতারার কানে সে কথা প্রবেশ করিলে এখনই মহাপ্রলয় সুরু হইবে, তাই ফকিরচাঁদ নিজের কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া বলিল, "ভোর কোথায় রে—বাইরে এসে দেখ্ না, চারিদিকে সূর্য্যির আলো ফট্ ফট্ করছে—"

—"হ্যাঁ করছে"—বলিয়া নয়নতারা স্বয়ং সশরীরে ফকিরচাঁদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া 'ছুম্' করিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িল। ফকিরচাঁদ বুঝিল যে নয়নতারা তাহার উপর রাগ করিয়াছে। তাই একখানি হাত নয়নতারার কাঁধের উপর তুলিয়া দিয়া বহু দিন আগে শ্রীকৃষ্ণ যাত্রায় শোনা একটি গানের এককলি গাহিয়া উঠিল,—

"পেরভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখনু
দিন যাবে আজি ভালো—"

নয়নতারা স্বামীর হাত সরাইয়া দিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "যাও যাও, ঢং দেখে আর বাঁচিনে, বয়েস বাড়ছে, না কমছে—"

ফকিরচাঁদ সকৌতুকে নয়নতারার দিকে চাহিয়া বলিল, "আরে আমিই না হয় বুড়ো-হাবড়া হইচি, কিন্তু তুই—তোর তো এখন ভরা যৈবন—হক্ কথা বল্ মাইরি—"

নয়নতারা স্বামীর রকম দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাবাপের সাড়া পাইয়া ফুলটুসিও উঠিয়া আসিল। ফকিরচাঁদ কন্যাকে দেখিয়া সযত্নে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুড়ি তিন গাছি পরাইতে লাগিল। যতক্ষণ চুড়ি পরানোর কাজ চলিল, ততক্ষণ ফুলটুসি মুগ্ধদৃষ্টিতে চুড়ি তিন গাছির সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। পরানো হইয়া গেলেও সে নিজের হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিল তাহাকে কেমন মানাইয়াছে। চুড়ি কয় গাছি দেখিয়া তাহার সাধ মিটিতেছে না!

নয়নতারা বলিল, "চুড়ি কোথায় পেলে?"

—"ঘাটে।"

—"ঘাটে কোথায় পেলে?"

—"ওই ভোর রাত্রে একদল যাত্রী একটা ছোট মেয়েকে নিয়ে এসেছিল, তারই চুড়ি।"

নয়নতারা চুপ করিয়া রহিল, হয় ত বা তাহার মাতৃহৃদয় সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সে কিছু বলিল না। কারণ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর তাহাদেরই অধিকার—আর সেই অধিকারের দাবী তাহার স্বামী বহু বর্ষ ধরিয়া চালাইয়া আসিতেছে। এত দিন যখন কিছু হয় নাই, তখন আজিও কিছু হইবে না। তথাপি সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটা বুঝি খুব ছোট?"

ফকিরচাঁদ গম্ভীরভাবে বলিল, "হুঁ।"

ফুলটুসি ততক্ষণে চুড়ি পরার আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য উঠানে নামিয়া গিয়াছিল। পেয়ারা গাছের ফাঁক দিয়া একটুখানি রোদ উঠানে আসিয়া পড়িয়াছে। ফুলটুসি সেই রৌদ্রটুকুর উপর নিজের চুড়ি ধরিয়া ঘুরাইয়া দেখিতেছে—রৌদ্রে চুড়িগুলি চিক্ চিক্ করিতেছে আর সে আনন্দে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া মাঝে মাঝে নাচিয়া উঠিতেছে। তাহার সেই আনন্দময় নৃত্য দেখিয়া বৃদ্ধ ফকিরচাঁদের অন্তর নাচিয়া উঠিল। সে আনন্দে গাহিয়া উঠিল—

"আমার কালো মেয়ের কালো রূপে
ভোবন করেছে আলো।"

সে মূর্খ সমাজের অস্পৃশ্য জাতি, তবু আজিকার এই আনন্দময় মুহূর্ত্তটিতে তাহারও অন্তরে বোধ হয় নিখিল বিশ্বের আনন্দ সঙ্গীতের সুরের ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে 'ভোবন' কথাটির শেষে একটি অনাবশ্যক ওকারের টান দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাহির হইতে রতন ডাকিল, "খুড়োমশায়!"

—"কি রে রত্না—"

—"আবার যাত্রী আসিতেছে।"

এই আনন্দময় মুহূর্ত্তটি সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে

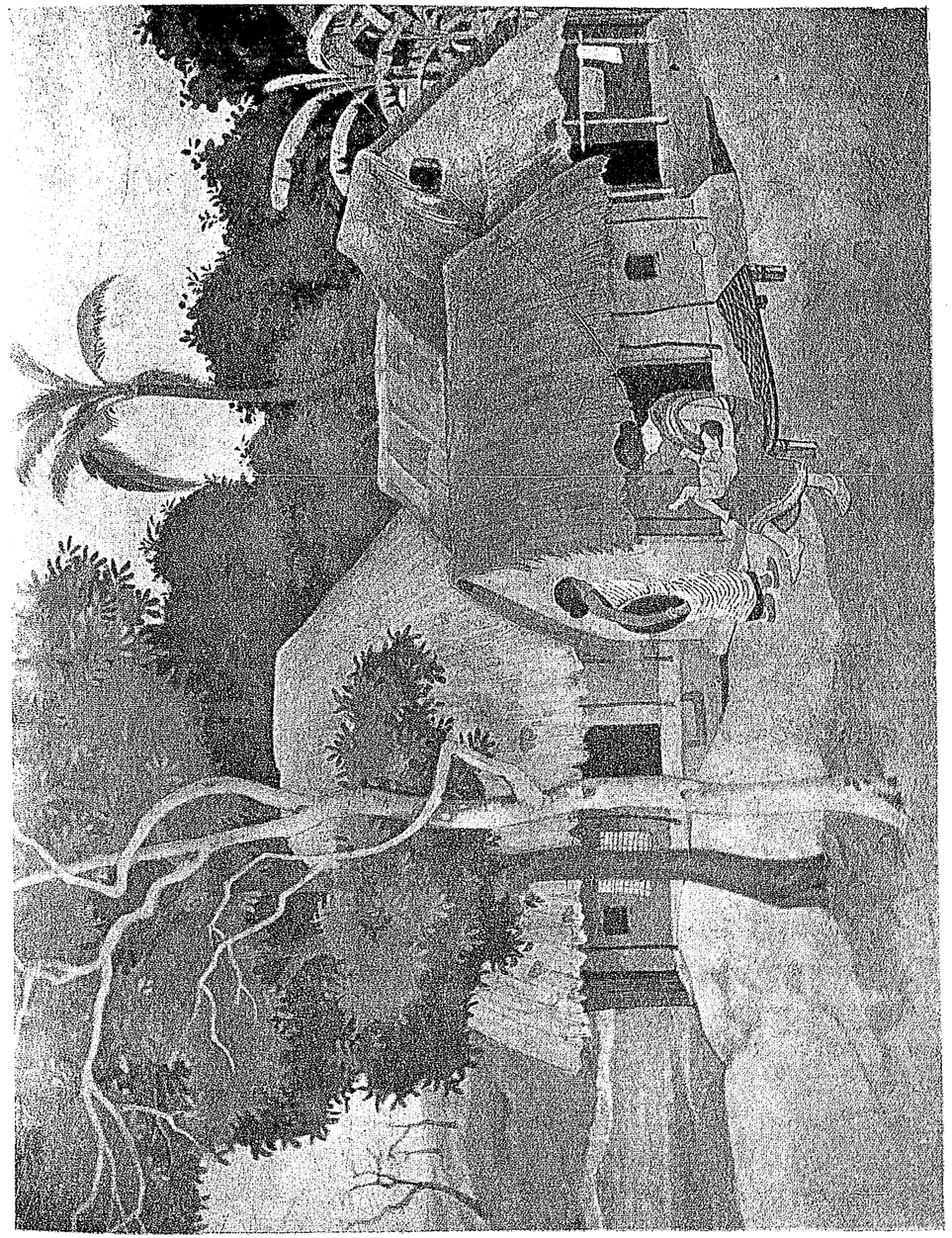

ভারতবর্ষ হাফটোন ওয়ার্কস

পল্লী-সংসার

শিল্পী—শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গারিল না দেখিয়া ফকিরচাঁদ মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইল। মুগ্ধ-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার সাত বৎসরের কন্যা ফুলটুসির পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "চল্ যাই।"

এইভাবে বৃদ্ধ ফকিরচাঁদের দিনগুলি কাটিয়া যায়। তাহার বাল্যের ও যৌবনের ব্যর্থ দিনগুলি যেন আজ বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় আসিয়া ফুলটুসি ও নয়নতারাকে কেন্দ্র করিয়া সার্থক হইয়া উঠিতে চায়, কিন্তু তাহাকে বাধা দেয় তাহার পেশা। তাহারই চোখের উপরে মাতা পুত্রকে ফেলিয়া গৃহে ফিরিয়া যায়, পিতা কন্যাকে রাখিয়া যায়, স্ত্রী স্বামীকে রাখিয়া যায়, ভ্রাতা ভগ্নীকে রাখিয়া যায়। এক দিকে সকলে চিতা ধুইয়া তাহার বক্ষে কলসীপূর্ণ গঙ্গাজল ও পাঁচটি পয়সা রাখিয়া যখন চিরদিনকার মত পার্থিব জীবনের যত কিছু বন্ধন ছিন্ন করিতে প্রস্তুত হয়, তখন অন্য দিকে ফকিরচাঁদ নির্ম্মম পাষাণের মত বলিতে থাকে—আজ্ঞে পাঁচসিকের কি আর এ কাজ হয়, এ কাজে পাঁচটা ট্যাকা তো চাই-ই—কত বধূ স্বামীর মুখাগ্নি করিবার জন্য এই শ্মশান ঘাটে আসিয়াছে, তখনও তাহার সীমন্তে সিন্দুর রেখা, পরণে লাল পাড় শাড়ী। তাহার ব্যথাক্লিষ্ট রোরুদ্যমান মুখ, তবু বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ বুঝিতে পারে যে এই সদ্যবিধবা কাল পর্য্যন্তও ছিল স্বামীসোহাগিনী, স্বামীর সোহাগগর্ব্বে গর্ব্বিতা···সেও ভালবাসিত তাহার স্বামীকে—কত বিনিদ্র রজনী দুইজনে যাপন করিতে করিতে নব নব মুখের, নব নব ভালবাসার কল্পনা করিয়াছে, দুইজনে দুইজনার প্রতি অভিমান করিয়াছে, রাগ করিয়াছে—আবার একে অপরের অনুরোধে সমস্ত রাগ অভিমান ত্যাগ করিয়াছে। এই বধূরই মুখে ছিল হাসি···রূপে গুণে সে ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু সে-ই যখন এই শ্মশান ঘাট হইতে ফিরিয়া যায়, তখন মনে হয় যেন কোন এক বিশ্ববিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক তাহার যাদুদণ্ডের স্পর্শে বালিকা বধূর আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। লাল পাড় শাড়ীর পরিবর্ত্তে সে পরিয়াছে সাদা থান, সিঁথির সিঁদুরের চিহ্ন একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, অধরের শিশির বিন্দুর মত উজ্জ্বল লুতাতন্তুর রহস্যময় সে হাসির রেখা কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে, সে স্থান অধিকার করিয়াছে মুক্তাফলকের ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু। তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন তপঃক্লিষ্টা পার্ব্বতী বহু তপস্যাতেও দয়িতের সন্ধান না পাইয়া অবশেষে সর্ব্বহারা যোগিনীর বেশে গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে। গঙ্গার কূলে ওই যে নূতন চিতাটি কাটা রহিয়াছে, সে চিতা এক যুবকের—তাহার মা নিজে আসিয়াছিল তাহার মুখাগ্নি করিতে। সন্তানহারা জননীর আকুল আর্ত্তনাদ ফকিরচাঁদ যেন আজিও শুনিতে পাইতেছে। ওই যে চিতার লেলিহান শিখা, যাহা শত শত সহস্র সহস্র সোনার দেহকে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে, ফকিরচাঁদ তাহা অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুর।

রতন আসিয়া বলিল, "খুড়ো, পাঁচসিকে পয়সা দাও।"

—"কেন রে কি হবে?"

—"মা ওলাবিবির পূজো দেবো।"

—"তা হঠাৎ?"

—"হঠাৎ?" রতন যেন অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল; বলিল, "হঠাৎ তুমি বলছ কি খুড়ো—গাঁয়ের আশেপাশে যে মা ওলাবিবির দয়া হচ্ছে—ওঃ! কি নোকটাই যে মরছে খুড়ো—হি হি—দু বার দাস্ত আর একবার বমি, বাস্! নাড়ী একেবারে ঠাণ্ডা···হুই হুড় হুড় করে সব ঘাটে পোড়াতি আসবে···হি হি, কি পয়সাই না হুটবো; তুমি কিন্তু আড়াই ট্যাকা করে দর দিবা—হি হি—"

তাহার এই বীভৎস কুৎসিত হাসি ফকিরচাঁদের মোটেই পছন্দ হইল না। সে রতনকে এক তাড়া লাগাইয়া বলিল, "তোর মাতলামি থামা রত্না—বেটা ছোটলোক·· একদিকে গণ্ডালে গণ্ডালে লোক মরতিছে, আর তুই শালা এলি কি-না 'জমির দর আড়াই ট্যাকা কয়'! হাত্তোর ট্যাকার নিকুচি করেচে। ভদ্দরলোকেরা যে মোদের ছোটলোক কয়, সে কি আর মিছে কয়, এই জন্যিই কয়—"

তাড়া খাইয়া রতনের আস্ফালনের সঙ্গে সঙ্গে মা ওলাবিবিও অন্তর্ধান হইলেন। সে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে ফকিরচাঁদের দিকে চাহিয়া রহিল। ফকিরচাঁদ বলিল, "খুব ত ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই-করচিস, তারপর শালা, যদি তোর হয়, তখন তোর কোন্ বাবা ঠ্যাকাবে?"

রতন বলিল, "মোরা গঙ্গা-পুত্তুর—মোদের কি আর কিছু হয়, হয় না। ও শালা কাগের মাংস কি আর কাগে খায়?"

—"তাই খায় কি-না দেখিস, যে দিন যমরাজা 'নুটিস্' দেবে সেই দিন টের পাবি কাগের মাংস কাগ খায় কি-না—"

বলিয়া ফকিরচাঁদ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তামাক খাইতে

লাগিল। রতন গজগজ করিতে করিতে উঠিয়া গেল। বেড়ার বাহিরে আসিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঃ, শালা আমার ধার্ম্মিক হয়েছেন, সেদিনও যে শালা বেশী করে ট্যাকা নেবার জন্য ঝুল পেটাপিটি করতিস্ আর আজ তুমি ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়েছ, আ আঁটকুড়ির পুত, তবু যদি পাঁচসিকের চাকায় আড়াই ট্যাকা না চাইতিস্—"

ফকিরচাঁদের কল্পনাই কিন্তু সত্য হইল। এক দিন কাল ওলাউঠা হইয়া ফকিরচাঁদের সাত বৎসরের কন্যা ফুলটুসি ফকিরচাঁদের মায়া কাটাইল। নয়নতারা হাহাকার করিয়া উঠিল, কিন্তু ফকিরচাঁদ নির্ব্বিকার, অন্তরে অসহ্য বেদনা বোধ করিলেও সে দৃঢ়ভাবে বলিল, "চল্ রে রত্না, মাকে আমার দিয়ে আসি।"

সেই গঙ্গাতীর—সেই শ্মশানঘাট। এখানে বহুলোককেই নিজের কন্যাকে দাহ করিতে আসিতে ফকিরচাঁদ দেখিয়াছে। আজ সে নিজে আসিয়াছে নিজের একমাত্র কন্যাকে দাহ করিতে।

রতন চিতায় কাঠ ঠেলিয়া দিতেছিল, আর বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ মুখাগ্নি সারিয়া অদূরে বসিয়া জ্বলন্ত চিতার লেলিহান শিখার পানে চাহিয়াছিল। ধীরে ধীরে ফুলটুসির সমস্ত দেহটা ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে, তথাপি যেন ওই নরমাংস-লোলুপ লেলিহান অগ্নিশিক্ষার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে না, দারুণ বুভুক্ষায় সে আরও জোরে গর্জ্জন করিতেছে,—সোঁ-সোঁ-সোঁ!

রতন বলিল, "চল খুড়ো, স্নান সেরে নিইগে।"

ফকিরচাঁদ চাহিয়া দেখিল, কার্য্যশেষ, চিতা নিভিয়া গিয়াছে।

—"চল্"—বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

কিন্তু সহসা কোথা হইতে তাহার অন্তরে যেন ওই নির্ব্বাপিত চিতার আগুনের জ্বালা দ্বিগুণ জোরে জ্বলিয়া উঠিল। সে বুঝিল যে এই অগ্নি-চিতার জ্বালাই বহুবর্ষ ধরিয়া বহুলোকের অন্তরে জ্বালিয়া দিয়াছে—তাহা যে কি জ্বালা তাহা সে এত দিন বোঝে নাই, আজ বুঝিতেছে। এ জ্বালা কোন দিনই শীতল হইবে না, এ অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা চিরদিনই জ্বলিবে। সে চলিতে চলিতে বলিল, "কাল থেকে ঘাটের পয়সা তুই-ই আদায় করিস রতন, আমি এ কাজ ছেড়ে দিলাম।"—

সমুদ্র সৈকতে—

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ফেনিল উচ্ছ্বাসময় কোটি বাহু প্রসারিয়া দিয়া
দাবদগ্ধ ধরণীর তপ্ত বক্ষ দাও জুড়াইয়া—
শান্ত ও শীতল তব আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করি;
হে বারিধি—কি স্নিগ্ধতা রাখিয়াছ বক্ষ তব ভরি।
যুগ যুগান্তর গেছে—কালের হল না পরিমাণ
ফুরাল না আজও তব দান।
ঊষর উর্ব্বর করি যুগে যুগে ধরণীর বুক
ধুয়ে দাও সব ব্যথা, মুছে নাও না পাওয়ার দুখ।
প্রাচুর্য্যে করেছো পূর্ণ শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা তাই—
নদ নদী বক্ষপূর্ণ কর যুগে যুগে—
ধরণীরে ধৌত করি জলস্রোত নমিছে তোমায়,
পদতলে পড়ে পৃথ্বী শ্রদ্ধাপূর্ণ চক্ষে তোমা চায়।

ধরণীর পাপ—
যত অকল্যাণ আর অশান্তি ও তীব্র অভিশাপ
ঘুচাইয়া এনে দাও শান্তিপূর্ণ অশেষ কল্যাণ,
হে রাজর্ষি, হে মহৎ, তবু তো ফুরায় নাকো দান।
কত কবি গান রচি বসি তব তীরে গেয়ে গেছে
কত শিল্পী তীরে বসি নম্র চিত্তে চিত্র এঁকে নেছে।
ইন্দ্রনীল আকাশের বক্ষে রচ নব মেঘমালা
এক করে লও তুলি, অন্য করে সুরু হয় ঢালা।
অনন্ত বিশাল সূর্য্যে সযতনে রাখ বক্ষপুটে,
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য যত হে তপস্বী, চরণেতে লুটে।
তোমার চরণে করিলাম,
ভক্তি নম্র চিত্তে প্রভু, একটী প্রণাম।

বেলিনে এক সপ্তাহ

রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ

ষ্টেশন থেকে অনেকখানি রাস্তা পেরিয়ে প্রিন্স্ উইলহেল্ম হোটেলে আসা গেল। কিন্তু সেখানে তারা বল্লে স্থানাভাব। অলিম্পিক উৎসবের জন্য হোটেলে স্থান পাওয়া শক্ত হবে, তারা বললে। নানা দেশ থেকে লোক আগে হ'তে 'বুক' করে রেখেছে। কাজেই বুঝলাম যে ব্যাপার গুরুতর। যা হোক ঐ ষ্ট্রীটেই আর একটি হোটেলে স্থান পেলাম এই বলে' যে অলিম্পিক ক্রীড়া আরম্ভ হবার আগেই ঘর ছেড়ে দেবো। তার নাম Europaischer

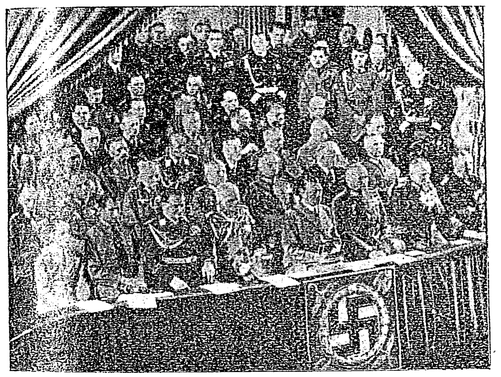

জার্মান অপেরায় হিট্‌লার ও তাঁর পারিষদ্‌বর্গ

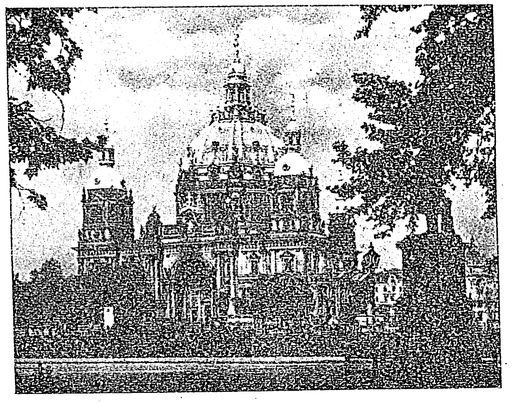

বেলিন গির্জা

Hotel. হোটেল কথাটি আন্তর্জাতিক—অর্থাৎ সব জাতির মধ্যেই প্রচলিত।

গাড়ীতে আমার ডিনার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, কাজেই খাবার তত প্রয়োজন না থাকলেও হোটেলে জিনিষপত্র রেখে বেরিয়ে পড়লাম। রাত্রি তখন ১২টা। কিন্তু রাস্তায় লোক চলাচলের ভীড় এত যে সন্ধ্যার মতই বোধ হ'তে লাগলো। আসবার সময় উন্টার ডেন লিণ্ডেনের বিখ্যাত রাস্তা হয়ে আসা গেল। সেখানে এত লোক চলছে যে মনে হলো এইমাত্র কোনো বড় রকমের সভা বোধ হয় ভেঙ্গে গেছে।

রাত্রি ১২টায় বেরিয়ে বিশেষ কিছু দেখবার সখ ছিল না। সারাদিন গাড়ীতে বসে' হাত পা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই একটু সঞ্চালন করবার ইচ্ছা মাত্র। কিন্তু একটু দূর গিয়েই দেখি এক রেস্তঁরা এবং সেখানে বহু নরনারী পানাহার করছে। আমিও ঢুকে পড়লাম, একটা টেবিলে বস্‌তেই হোটেলের পরিচারক এসে জিজ্ঞাসা করলে 'কি চাই?' আমি সামান্য কিছু খেতে পারি বলতেই সে এক ফর্দ্দ এনে উপস্থিত করলে, যার সবগুলি দফা কটমট জার্মাণ ভাষায় লেখা। একটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো নামটি দেখে। তার গোড়াটা হচ্চে বিসমার্ক। কিন্তু বিসমার্ক কথাটির সঙ্গে আর যে ডজনখানেক ব্যঞ্জন বর্ণ ও স্বরবর্ণ তাকে ঘোরালো করে' তুলেছে, রাত্রি ১২টায় তার অর্থোদ্ধার করা আমার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। শেষটা সেই পরিচারককেই জিজ্ঞাসা করলাম দ্রব্যটা কি? সে জার্মাণ ভাষায় যা বল্‌লে তার অর্থ আমার মস্তকে প্রবেশ করলো না। তখন সে দৌড়ে গেল অন্যত্র। মনে করলাম বোধ হয় জিনিষটা এনে উপস্থিত করবে। কিন্তু তা নয়। সে আর একজনকে সঙ্গে করে' নিয়ে এলো এবং দুইজনে মিলে আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলো। জার্মাণীর রেস্তঁরা-

গুলিতে পরিচারিকা অপেক্ষা পরিচারক বেশী। শেষোক্ত পরিচারকটি ইংরেজি জানে, কিন্তু সে যা বললে তা জার্মাণের চেয়ে কোনও অংশে সহজ বলে মনে হলো না। শুধু অনুমান বা আন্দাজ করলাম যে মাছের কিছু ব্যাপার হ'তে পারে। তখন তাকে আনতে বলে দিলাম। কিন্তু মুখে দিয়ে দেখি—সে কি টক্! মাছ হ'তে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে আগুনের সম্বন্ধ যে কখনও ঘটেছে, তা মনে হলো না। সুতরাং খাওয়া সেখানেই স্থগিত করতে হলো। শেষে এক পেয়ালা কফি আনতে বলে দিলাম। জার্মাণীর কফি খুব ভাল। কিন্তু খাওয়াটাই ও-সব যায়গায় বড় কথা নয়। হরেক রকম লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সময় কাটাবার সুযোগ খুব। সেই জন্যই যাওয়া। খাওয়া শেষ

সরকারী অপেরা—বেলিন

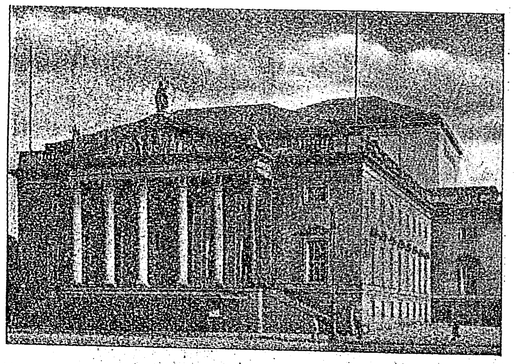

করে' উজ্জ্বল আলোকে শোভিত রাস্তায় কিছুক্ষণ পায়চারি করে' শেষে হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন প্রাতে আমেরিকান এক্‌সপ্রেস্ কোম্পানীতে গিয়ে দেশে এক টেলিগ্রাম্ পাঠালাম—খরচ দিলাম ৬ মার্ক ৪০ ফিনিস্ (Phenigs) অর্থাৎ অর্দ্ধ পাউণ্ডের কিছু অতিরিক্ত। তার আগে ব্যাঙ্কে—ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে—রেজিষ্টার্ড মার্ক ভাঙিয়ে নিতে হয়েছিল। রেজিষ্টার্ড মার্ক মানে এই যে জার্মাণীতে গমনাভিলাষী ব্যক্তিদের সুবিধা করে' দেবার জন্য জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট সস্তাদরে মার্ক বিক্রয় করেন। জার্মাণীর সঙ্গে বাণিজ্য করতে গেলেও বোধ হয় এই সুবিধা পাওয়া যায় অর্থাৎ জার্মাণীর মধ্যে ১টি ইংলিশ পাউণ্ডে যখন ১২ মার্ক পাওয়া যায়, তখন বাইরে রেজিষ্টার্ড মার্ক পাওয়া যায় প্রায় তার ডবল। আমি পেয়েছিলাম ২৩ মার্কের কিছু বেশী। ক'দিন থাকবো, কিরূপ ভাবে খরচ করবো এই সব ভেবে রেজিষ্টার্ড মার্ক কিন্‌তে হয়। বেশী আন্‌লে শেষে ফিরে যাবার সময় জমা দিয়ে যেতে হয় সীমান্তে। তারপর লেখালেখি করে' তার সমান মূল্যের পাউণ্ড শিলিং কবে পাওয়া যাবে, তার ঠিকানা নেই।

কুক কোম্পানীর অফিস, আমেরিকান এক্‌সপ্রেস্ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বড় বড় বাড়ী এই উণ্টার ডেন লিণ্ডেনে। এর অর্থ হচ্চে লিণ্ডেন গাছের তলায়। নামটি কবিত্বময়। একটি বিখ্যাত সঙ্গীতের নামও উণ্টার ডেন্ লিণ্ডেন—বোধ হয় মোজার্টের তৈরী। রাস্তাটি প্রায় দু'শ ফিট

জার্মানী পার্লিয়ামেণ্ট, বিস্‌মার্কের প্রতিমূর্ত্তি

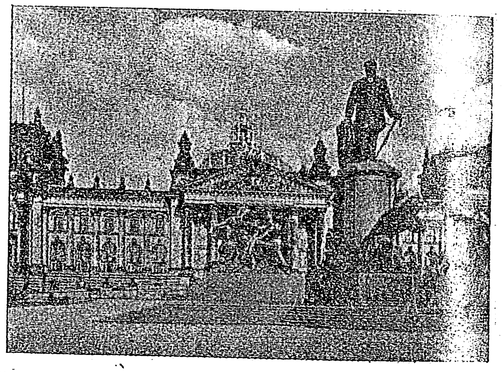

চওড়া। মাঝখানে বেশ প্রশস্ত ঘাসের মনোরম লন্ অর্থাৎ রাস্তার দুধারে ফুটপাথ, দুধারে রাস্তা, গাড়ী ও লোক চলাচলের জন্য, আর তার মাঝে সবুজ দ্বীপ এবং মাঝে মাঝে লিণ্ডেন গাছের ছায়া। চমৎকার! এর এক প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড তোরণ দ্বার। তিনটি বড় বড় খিলানের উপর এই ফটকটি রয়েছে। তার উপরে চারটি তেজস্বী অশ্ব ও বিজয়লক্ষ্মীর মূর্ত্তি। খিলানের মধ্য দিয়ে রাস্তা চলে গেছে একটি পার্কে। কিন্তু উণ্টার ডেন লিণ্ডেনের আরম্ভ এই ব্রাণ্ডেনবুর্গ তোরণ। নেপোলিয়ন যখন জার্মাণী জয় করেছিলেন, তখন এই তোরণটির উপরকার মূর্ত্তিগুলি তিনি প্যারিসে নিয়ে যান। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর ব্লুকার আবার এগুলি নিয়ে এসে যথাস্থানে স্থাপন করেন।

রাস্তাটি পূর্ব্বদিকে সোজা চলে গেছে স্প্রী (Spree) নদীর প্রায় কিনারা পর্য্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়টি এই রাস্তার ধারেই। প্রথম উইলিয়মের সু-উচ্চ মূর্ত্তি তাহারই নিকট। বেলিনের প্রসিদ্ধ অপেরাও এখানে। আর একটু পূর্ব্বে গেলে বিস্মৃত সৈন্যদের স্মৃতিমন্দির। গৃহটি বেশ বৃহৎ ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। চার জন সৈন্য বন্দুক স্কন্ধে পাহারা দিচ্ছে। সেই কক্ষতলে প্রকাণ্ড একটি সমাধি এবং তার পশ্চাতে বহু জাতির ([illegible] ?) পতাকা ঝুলিয়েছে। বহুলোক ভিতরে গিয়ে টুপী খুলে সম্মান দেখিয়ে আস্‌ছে সেই স্মৃতি-সমাধির প্রতি। ইয়ুরোপ থেকে মহাযুদ্ধের স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নি। যে সব অজ্ঞাতনামা বীর দেশমাতৃকার জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে অজ্ঞাত অখ্যাত ভাবে বিদায় নিয়েছে

ফ্রেডারিক দি গ্রেট—উণ্টার ডেন লিণ্ডেন

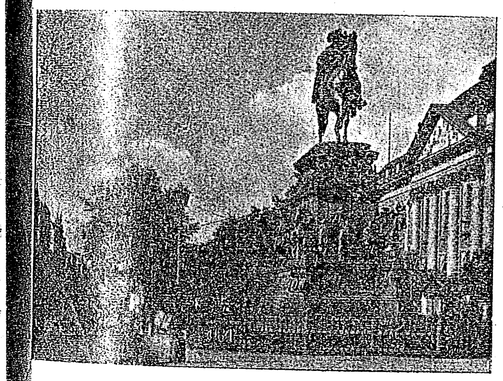

পৃথিবী থেকে—তাদের জন্য সমগ্র জাতির উষ্ণ অশ্রু এখনও প্রবাহিত হচ্চে! উণ্টার ডেন্ লিণ্ডেন রাস্তাটি বড় ভাল লাগলো। রাস্তার দুধারের সৌধগুলি বেশ সুদৃশ্য ও সু-উচ্চ। সবটাই যেন এই সুবৃহৎ রাজপথের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে' গড়ে উঠেছে। কিন্তু আজ এর চেহারা আরও চমৎকার। সমস্ত রাজপথটি আজ জার্মাণীর স্বস্তিক পতাকায় সুসজ্জিত হয়েছে। প্রত্যেক পতাকাটি বোধ হয় [illegible] কি ২০ গজ হবে। সাদা কাপড়ের উপর লাল বৃত্ত। এই বৃত্তের মধ্যে কালো ক্রস্। অনেকের ধারণা যে আমাদের 'স্বস্তিক' ওরা নিয়ে তাকে সম্মান করছে। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। প্রথমতঃ স্বস্তিক যে ঠিক আমাদের ভারতীয় চিহ্ন, তা বলা যায় না। স্বস্তিক চিহ্ন বহু প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আমাদের পূজাঅর্চনায় যে স্বস্তিক-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তা কত পুরাতন এবং কোথা হতে এসেছিল তা বলা যায় না।

আমাদের স্বস্তিক সোজা, ওদের স্বস্তিক বাঁকা।

তার পরে ওদের ঐ চিহ্নের জার্মাণ নাম হচ্চে Hacken Kreuz এবং তার অর্থ বাঁকা ক্রস। যতদূর মনে হয় তাতে নাৎসীরা এই চিহ্ন গ্রহণ করেছিল মহাযুদ্ধের পরে। মহাযুদ্ধে জার্মাণীর একজন সেনাধ্যক্ষ টুপীতে এই চিহ্ন পরেছিলেন—তাঁর থেকেই নবীন জার্মাণী এই রহস্যপূর্ণ

ব্রাণ্ডেনবুর্গ ফটক—উণ্টারডেন লিণ্ডেন

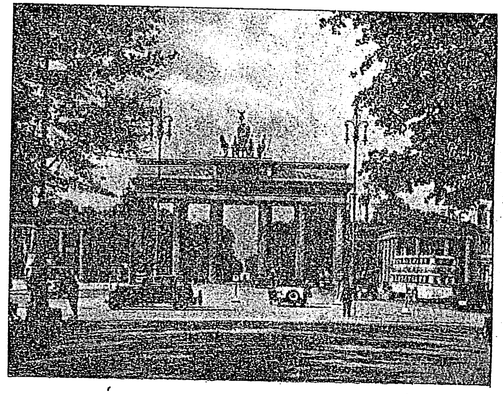

চিহ্ন তাদের পতাকায় গ্রহণ করেছে। আমাদের স্বস্তিক চিহ্ন কেবল মঙ্গলের। আলিপনায় পর্য্যন্ত মাঙ্গলিক রূপে এ চিহ্ন অঙ্কিত হয়। কিন্তু এদের এই চিহ্ন বিদ্রোহের, যুদ্ধবিগ্রহের এবং দৃপ্ত তেজের।

যাই হোক জার্মাণী যেন আজ এই স্বস্তিকে মোড়া। জার্মাণীর রাজধানী থেকে বেরুলে, বহুদূর পর্য্যন্ত সৌধচূড়ায়, স্তম্ভগাত্রে এমন কি জানালায় পর্য্যন্ত স্বস্তিক চিহ্ন ঝুল্‌ছে দেখা যায়। এই পতাকামণ্ডিত রাজপথে জার্মাণীর নৌসৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে' ব্যাণ্ড বাজিয়ে চলে গেল। আমি তখন রাস্তার ধারে এক রেস্তরাঁয় বসে' কফি পান করছি। এই রেস্তরাঁগুলি বিশেষতঃ উণ্টার ডেন লিণ্ডেনের ধারে সব সময়ে লোকে গিস্ গিস্ করে। প্যারিসে রেস্তরাঁগুলি

যেমন ফুর্ত্তিবাজের দলে পূর্ণ থাকে, এখানে তা দেখলাম না। অনেকে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে এসেছেন সেখানে। জার্মাণরা ফরাসীদের অপেক্ষা বোধ হয় পারিবারিক জীবনের প্রতি বেশী অনুরক্ত। মেয়েদের বেশ-বিন্যাসেও সেটা লক্ষ্য করা যায়। আমি দুই একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্তে এদের সম্বন্ধে কুৎসাজনক বর্ণনা পড়েছি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। জার্মাণীর মেয়েরা ফরাসী মেয়েদের মত বিলাসী নয়। এমন কি ইংরেজ মেয়েদের মধ্যে যতটা ঠোঁট রঙানো দেখতে পাওয়া যায়, এদের মধ্যে বোধ হয় তার চেয়েও কম। তার একটি কারণ হচ্চে এই যে এদের চেহারা অনেক সময়

বের্লিনের বিজয়স্তম্ভ

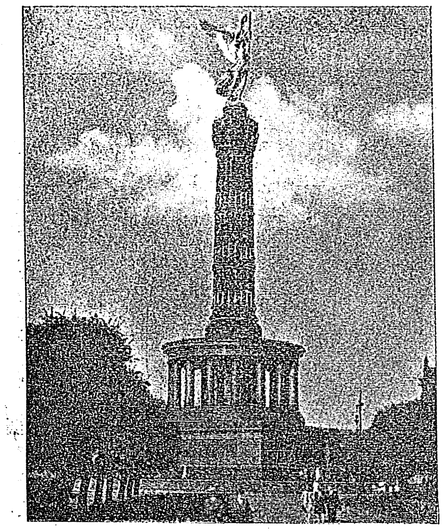

বিলাসিতার অনুকূল নয়। জার্মাণ স্ত্রী পুরুষ প্রায় সকলেই ওজনে ভারি। তলো-পানা মুখে রঙের বাহার দিয়ে আর কতদূর এগোবে? এও একটা কারণ হতে পারে। চেহারা ভারি বলে' এদের মেয়েরা তেমন হাল্‌কা চালে চলে না। বিলাতে ও ফ্রান্সে যা দেখে ও শুনে এসেছি, সে অনুপাতে জার্মাণরা কতকটা সংযত মনে হলো।

সেদিন সান্ধ্যভোজনের পরে ফ্রিড্‌রিশ ষ্ট্রাসে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। ফ্রিডরিশ ষ্ট্রাসে (Fredrisch Strasse) বের্লিনের একটি নামজাদা রাস্তা। অনেক বড় বড় দোকান এই রাস্তায় আছে। বের্লিনের সবচেয়ে বড় রেলওয়ে ষ্টেশন (Banhof) এই রাস্তার শেষে। রাত্রি ১২টার সময় সিনেমা যখন ভাঙ্গলো, তখনও রাস্তার জনতা বিশেষ কমে নি। আসবার সময় কতকগুলি মেয়ে দেখলাম; তাদের ঐ সময়ে রাস্তায় বিচরণ আমার মোটেই ভাল লাগলো না। মোটের উপর সময়টা সিনেমায় মন্দ কাটে নি। তার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যা কেটেছিল হিন্দুস্থান হাউসে। আমাদের দেশের যুবকেরা অনেকে সেখানে থাকেন। কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ হলো। মিঃ চক্রবর্ত্তী বৈদ্যুতিক শিক্ষা লাভ করবার জন্য বের্লিনে রয়েছেন। বের্লিনের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুব ভাল শুনেছি। ওরা যে শিক্ষা দেয় তার দাম আছে। মিঃ চক্রবর্ত্তী এদেশে কৃতবিদ্য হয়ে ওখানে গিয়ে প্রায় চার বছর আছেন। মিঃ গুপ্ত ওখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি রাঁধাবাড়ার ভার থেকে আর সকলের তত্ত্বাবধান পর্য্যন্ত সমস্তই নিজে করেন। তিনি আমাদের চা দিলেন। রাত্রের খাবারও সেখানে নিষ্পত্তি করেছিলাম। বাঙ্গালীর খাদ্য পেয়ে মুখটা অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করেছিল।

আমি বেশীক্ষণ হিন্দুস্থান হাউসে থাকতে পারি নি। কিন্তু যতটুকু সময় ছিলাম, তার মধ্যে দেশীয় লোকের সঙ্গ পেয়ে অনেকটা আরাম অনুভব করেছিলাম। দু'জন মাদ্রাজী ও একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকও সে সময়ে সেখানে ছিলেন। মিঃ রক্ষিত বলে' আমার একজন আলাপী ভদ্রলোক জার্মাণীতে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে' সেই দিনই দেশে রওনা হলেন। আর একজন শিক্ষার্থীকে দেখে দুঃখ হলো। তিনি সেখানে শিক্ষালাভ করেছেন এবং চাকরীও পেয়েছেন। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা তাঁর যে ভাবে কাটানো উচিত, ঠিক সেভাবে যেন কাটাচ্ছেন না। তিনি বাঙালী, তাই আরও দুঃখ হলো যে যারা অজস্র অর্থব্যয় করে' উচ্চ আশার স্বপ্ন দেখে' আদরের ছেলেদের দুলালদের বিদেশে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন, তাদের দুর্ভাগ্যের আর অন্ত নাই।

জার্মাণীর নৈতিক আদর্শ যে খারাপ, তা মনে হলো না। বরঞ্চ অনেক জাতি অপেক্ষা ভাল বলেই বোধ হলো। তবে এর ভিত্তি খুব দৃঢ় কিনা সে বিষয় সন্দেহ হ'তে পারে। কারণ জার্মাণীর একমাত্র দেবতা এখন State রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই তাদের সব। রাষ্ট্রের জন্য তারা না করতে পারে, এমন

কর্ম্ম নেই। সমগ্রজাতিটা এই রাষ্ট্রদেবতার পূজার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। ওরা মিলনের, ঐক্যের পন্থা আবিষ্কার করেছে জাত্যভিমানের ভিতর দিয়ে। জার্মাণীর বর্ত্তমান প্রবল পক্ষের অভিমান এই যে তারা সব একটি উত্তর দেশাগত (Nord) আর্য্যজাতি হতে উদ্ভূত এবং যারা একই জাতির লোক, তাদের মধ্যেই ঐক্য সম্ভব। সুতরাং জার্মাণীতে যে সকল বিদেশী আছে, তারা এই ঐক্য প্রচেষ্টা থেকে বাদ পড়লো। আর বাদ পড়লো লক্ষ লক্ষ ইহুদী—যারা বহু শতাব্দী ধরে' জার্মাণীতে বাস করে' জার্মাণ জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

জার্মাণীর বর্ত্তমান জাত্যভিমান এত উৎকটরূপে দেখা দিয়েছে যে আমাদের দেশের জাতিভেদ বা তার অনুষঙ্গী

শার্লটেনবুর্গ দুর্গ

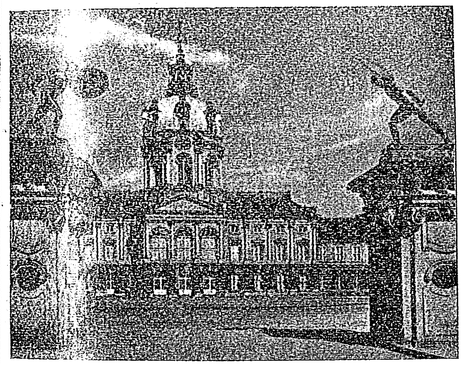

হিংসাদ্বেষ কর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। এরা ইহুদীদের দেশ থেকে তাড়াবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে। শুধু তাই নয়, যাদের রক্তে ইহুদীদের কোনো গন্ধ আছে তাদের পর্য্যন্ত তাড়িয়ে দেওয়া হচ্চে। এইরূপে অসংখ্য ইহুদী পৃথিবীর নানা স্থানে ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টায় বেরিয়েছে—দেশে তাদের স্থান নেই। বিলাতে বহুলোক আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েচে। আমাদের দেশেও অনেক পরিবার চলে' এসেছেন। প্যালেষ্টাইনে এই সব ইহুদীরা গিয়ে ভীড় করেছে এবং সেখানকার রাজনীতিক সমস্যা জটিলতর করে' তুলেছে। জার্মাণীর বিখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর আপেক্ষিকতত্ত্ব (Theory of Relativity) জগতের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ও জ্ঞানমন্দিরে আলোচিত, ব্যাখ্যাত ও সযত্নে পঠিত হয়। কিন্তু তিনিও ঐ ইহুদী রক্তের অভিযোগে নির্ব্বাসিত হয়েচেন। জ্ঞানের পবিত্র মন্দিরেও এই বৈষম্যের বিষাক্ত বায়ু প্রবেশ করেছে। জার্মাণীর দু'জন পণ্ডিত ফিলিপ লেনার্ড এবং জোহানেস্ ষ্টার্ক—দুজনই নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত—তাঁরা আইনষ্টাইনের বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, কারণ সে বিজ্ঞান ইহুদীর দ্বারা কলুষিত (Jewish Physics)। বের্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব্বে ছাত্রসংখ্যা একলক্ষের উপর হয়েছিল, এখন তার অর্দ্ধেকের কিছু বেশী। সমস্ত ইহুদী ছাত্র ও অধ্যাপক বিতাড়িত।

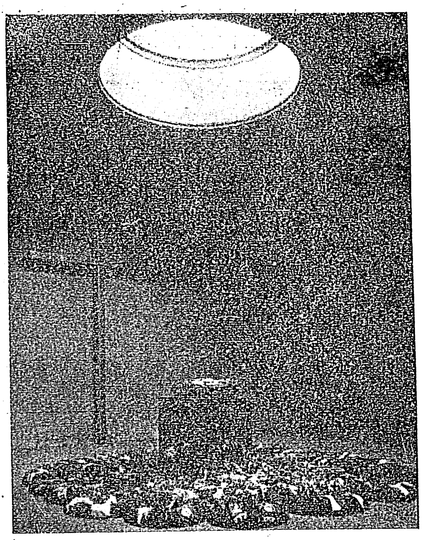

অজ্ঞাত সৈনিকের সমাধি অভ্যন্তর

বোধ হয় ১৫০০ অধ্যাপক এই ভাবে বিতাড়িত হয়ে অন্নের জন্য ছুটে ছুটে বেড়াচ্চেন।

ভারতবর্ষের আদর্শ চিরদিনই এই যে ম্লেচ্ছর কাছ থেকেও বিদ্যা গ্রহণীয় এবং বিদ্যার মন্দিরে জাতিবিচার নাই। জার্মাণী জগতে এই এক নূতন ভেদবাদের শিক্ষা প্রচার করছে। এর ফলে সব দিকেই যেন অশান্তি, সব দিকেই আশঙ্কা, সন্দেহ ও বিদ্বেষের ছায়া। কিন্তু মুখে কারও টুঁ শব্দ করবার জো নেই। বড় কড়া শাসন। গুপ্ত সমিতি যে নেই, তা বলা যায় না। লোকের মনোভাব

প্রকাশ করবার বাধা যেখানে, সেখানেই গুপ্ত সমিতির আবির্ভাব হবে, এ বিষয় সন্দেহ নেই। জার্মাণীর সংবাদপত্র সমস্ত গভর্ণমেণ্টের হাতে। সমস্ত সংবাদ, সমস্ত আলোচনা, সমস্ত মন্তব্য কড়া পাহারার বিষয় (censorship)। যদি কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে, তবে সে বিদেশে গিয়ে বলতে পারে। কিন্তু সেখানেও বিপদ্। জার্মাণীর মিত্র রাজ্যে বসে' জার্মাণীর তীব্র নিন্দা করা বেআইনী হ'বার আশঙ্কা আছে। জার্মাণীর এই যে ইহুদীবিদ্বেষ—বিশেষতঃ জ্ঞানের চর্চ্চায়—এটা জগতের শিক্ষিত সমাজে যে নিন্দিত হচ্চে না, তা নয়। কিছুদিন পূর্ব্বে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫০ তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ওরা বহু বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যানিকেতনে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিল। কিন্তু কেম্ব্রিজ

অজ্ঞাতসৈনিকের সমাধি—রক্ষীর দল

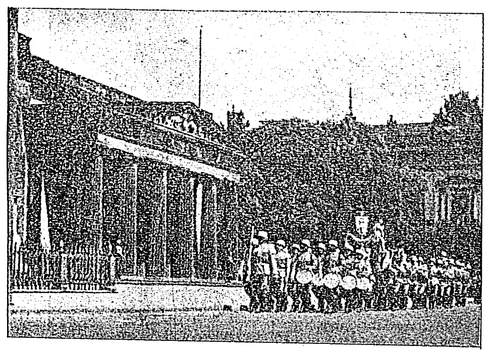

ও বার্মিংহামের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি। মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায় যে হের হিট্লার নিজেও এই ইহুদী-দোষে দুষ্ট। তাঁর মায়ের দিক্ থেকে ইহুদী রক্ত এসেছে!

পরদিন সকালে বেড়াতে গেলাম উইলহেল্ম্ ষ্ট্রাসে। এই রাস্তাটি বেরিয়েছে উণ্টার ডেন লিণ্ডেন থেকে। এই রাস্তাটি জার্মাণীর ডাউনিং ষ্ট্রীট—অর্থাৎ রাষ্ট্রসচিব এবং অধ্যক্ষদের অফিস এবং প্রাসাদ। একটি প্রকাণ্ড সুসজ্জিত ভবন জার্মাণীর প্রেসিডেণ্টের। বিখ্যাত সেনাপতি হিণ্ডেন্বার্গ ছিলেন এই পদে। তিনি ১৯৩৩ সালে পদত্যাগ করবার পর এডল্ফ্ হিট্লার এ পদ তুলে দিয়েছেন—অথবা চ্যান্সেলার ও প্রেসিডেণ্টের পদ মিশিয়ে এক করে' দিয়েছেন। এখন হের হিট্লার প্রেসিডেণ্টও বটে, চ্যান্সেলারও বটে। কিন্তু তিনি চ্যান্সেলার নামেই বেশী পরিচিত। কাজেই প্রেসিডেণ্ট্ পদটি একরূপ উঠে গেছে বললেই হয়। হিট্লার জার্মাণীতে চ্যান্সেলার অপেক্ষা 'ফিউরার' (Führer) বা জননায়ক নামেই বেশী পরিচিত। পররাষ্ট্রে তিনি 'ডিক্টেটার' নামেই সাধারণতঃ অভিহিত হন। এই Fuhrer Prinzip এর পূর্ব্বে ছিল না। এর অর্থ নেতৃত্ববাদ। উইলহেল্ম্ ষ্ট্রাসের কাইসার হোটেলের সম্মুখেই চ্যান্সেলারের প্রাসাদ। একটি বারান্দা আছে, সেখানে হিট্লার এসে যখন দাঁড়ান, তখন রাস্তায় জনতা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সেদিন প্রায় পাঁচ হাজার লোক রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল 'দর্শনে'র জন্য। এর মধ্যে বিদেশী অনেক ছিলেন। লোকের কি উৎসাহ এই দর্শনের ব্যাপারে।

ভাবলাম বিধাতার ভাগ্যচক্র কি রহস্যময়! যারা একদিন গণতন্ত্রের মন্ত্র জগতে দুন্দুভি-নিনাদে ঘোষণা করেছিল, যারা স্বাধীনতা বল্তে গণমতের প্রাধান্য বুঝ্তো, তারাই আজ 'নেতৃত্ববাদ'কে সমর্থন করছে। শুধু সমর্থন করছে নয়, সমস্ত ক্ষমতা তুলে' দিচ্ছে একজনের হাতে। কোনও রাজা রাজড়ারও এত ক্ষমতা ছিল না। সমস্ত সৈন্য, সমস্ত শাসনতন্ত্র, সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য—একজনের অঙ্গুলি-সঙ্কেতের উপর নির্ভর করে। হিট্লার প্রথমে ছিলেন, কুলি, তার পরে ছুতোর ও গৃহ-চিত্রকর (house painter); তার পরে রাজদ্রোহের জন্য তিনি জেলে যান। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জেল থেকে ফিরে' এসে তিনি বক্তৃতা দিতে লাগলেন। সমস্ত জার্মাণী তাঁর বক্তৃতা কান পেতে শোনে। এমন বক্তৃতা তাঁর, যে লোক সে ওজস্বিনী বাগ্মিতা শুনে' ক্ষেপে ওঠে। বক্তৃতার শক্তি চিরদিনই অসাধারণ। শেক্স্পীয়র পর্য্যন্ত দেখিয়ে গেছেন যে রোমে বক্তাদের বক্তৃতায় কি অসম্ভব রকমে জনতা (mass) ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্তো (Julius Cæsar)।

এই উইল্হেল্ম্ ষ্ট্রাসেতে আরও অনেক বড় বড় বাড়ী আছে, যথা রাসীয়ার রাজদূতের প্রাসাদ, কৃষ্টি-সচিবের অফিস (Culture Ministry), প্রচার-সচিবের অফিস (Propaganda Ministry) এবং বায়ুযান-সচিবের অফিস (Air Ministry) ইত্যাদি। প্রচার-বিভাগ জার্মাণীর এক অদ্ভুত নূতন কার্য্যক্ষেত্র। জনমত বা গণমত যেখানে শাসন-যন্ত্রের চরম নিয়ামক, সেখানে প্রচারের প্রয়োজন আছে

এ কথা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের বিবাহের মন্ত্রে আছে :—অন্যা দোষাঃ ক্ষন্তব্যাঃ গুণাঃ প্রকাশয়িতব্যাঃ, অর্থাৎ দোষ গোপন করব এবং গুণ প্রকাশ করব। প্রচার-বিভাগের কার্য্যও তাই। আরও ব্যাপকভাবে এই কাজ করতে হলে দেশের মুদ্রাযন্ত্র অর্থাৎ সংবাদপত্র হাতে থাকা আবশ্যক। জার্মাণী যে ভাবে তার শাসন যন্ত্র পরিচালন করছে, তাতে সংবাদপত্রের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করা, সরকারী কার্য্যের প্রতিবাদ করা বা বিরুদ্ধ সমালোচনা করা—এ সকল জার্মাণীতে অপরিজ্ঞাত বললেই চলে।

জার্মাণীর বায়ুজান বিভাগ এক বিরাট ব্যাপার। জার্মাণরাই সেপলিন (Zepplin) প্রথমে আবিষ্কার করেছিল। এখনও বোধ হয় জার্মাণীর বায়ব শক্তি সব জাতি অপেক্ষা বেশী। ক্রমেই আরও বাড়াচ্চে। আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, তখন বিলাতের সরকারী বাজেটে বহু কোটী টাকা মঞ্জুর করিয়ে নিতে হয়েছিল—কারণ পার্লামেণ্টে ষ্ট্যান্লি বল্ডুইন পরিষ্কার বললেন যে আত্মরক্ষার বন্দোবস্তে তাঁরা এতদিন নিশ্চেষ্ট ছিলেন। এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না। সেই সময়ে এক নূতন পদেরও সৃষ্টি হলো, তার নাম Ministry of Co-ordination. প্রথম মন্ত্রী হলেন সার চার্লস্ ইনস্কিপ্। তিনি এসে এরোপ্লেন অনেক বাড়িয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ইংলণ্ড জার্মাণীর সমকক্ষ হতে পারবে কি? জার্মাণী ত নিশ্চিন্ত নেই। তার বায়ব-সচিবের কার্য্যালয়টি এত বড় যে, কোনও জরুরি প্রয়োজন থাকলে দুই একখানা এরোপ্লেন তার ছাদের উপর নামতে পারে। ঐ প্রাসাদটিতে নাকি দু হাজার ছয় শত কক্ষ আছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধবিগ্রহ যে আর জলে বা ডাঙ্গায় নয়, তা সকলেই বুঝতে পারছে এবং সেই জন্য উড়্কু জাহাজের জন্য সব দেশে মারামারি কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে।

উইলহেল্ম্ ষ্ট্রাসে দেখে এলাম উণ্টার ডেন লিণ্ডেন দিয়ে ব্রাণ্ডেনবুর্গ তোরণে। এ তোরণের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। গোল গোল থামের উপর সোনালি রঙের চারটি ঘোড়া রৌদ্রকিরণে ঝল্মল্ করেছিল। খিলানের মধ্য দিয়ে যে প্রশস্ত রাস্তা চলে গেছে, তাতে অনায়াসে বড় বড় বাস চলে—একটি খিলানের মধ্য দিয়ে বাইরে যাবার পথ, আর একটি দিয়ে প্রবেশ করবার পথ। এতদ্ভিন্ন পদাতিকদের জন্যও সুপ্রশস্ত রাস্তা রয়েছে।

উণ্টার-ডেন-লিণ্ডেনের প্রত্যেক স্তম্ভগাত্রে বিভিন্ন রাজ্যের পতাকা রয়েছে। এ সজ্জা অলিম্পিক উৎসবের জন্যই। সমস্ত জাতির পতাকা দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে ভাবছি যে ভারতবর্ষ কি এই পতাকা-সভায় অপাংক্তেয়? বিচিত্র কি? তার পরেই একটি পতাকা দেখ্লাম, তার নীচে লেখা রয়েছে 'Indien'; দেখে' যেমন আনন্দ হলো, তেমনি দুঃখও হলো। কেন না ভারতবর্ষের পতাকা Union Jackই! শুধু তার মধ্যে একটি তারকা। বুঝলাম যে ভারতবর্ষের ভাগ্যনক্ষত্র ঐ ইউনিয়ন্ জ্যাকের অন্তরালে অস্ত গেছে!

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তোরণের অপর দিকে। এখান থেকে বের্লিনের বিখ্যাত উদ্যান টিয়ার গার্ডেনের আরম্ভ। এরই মধ্যে রিপাব্লিক্ প্লাজা (Plaza de Republique); এই পার্কটির ধারেই জার্মাণীর পার্লামেণ্ট-ভবন (Reichstag), পার্লামেণ্ট্ ভবনের সম্মুখে একটি বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত হয়েছে এবং তার গায়ে জার্মাণীর বিজয়-কাহিনী উৎকীর্ণ রয়েছে। এর কাছেই দেখলাম কতকগুলি বড় বড় রাজ্যের রেসিডেণ্টের অফিস। এগুলি ছাড়িয়ে গিয়ে একটি বড় রাস্তা পড়ে—তার নাম বোধ হয় টিয়ার গার্ডেন ষ্ট্রাসে। এখানে অনেক বড় লোকের বাস এবং রাস্তাও বেশ চওড়া। অনেক প্রস্তর এবং ধাতুমূর্ত্তি এই রাস্তায় রয়েছে—বীরপুরুষ ও স্মরণীয়-কীর্ত্তি ব্যক্তিগণের প্রতিমূর্ত্তি। এর পরে বিস্তৃত উদ্যান চলেছে এবং তার মধ্য দিয়ে একটি ছোট খাল গিয়েছে এঁকে বেঁকে।

এখানে নতুন প্রণালীতে রাস্তা ও বাড়ী তৈরী হচ্ছে দেখলাম। রাস্তা খুব প্রশস্ত। একধারে শুধু অশ্বারোহীর জন্য, একধারে ট্রামের জন্য, একধার বাস ও মোটরের জন্য ও একটি ধার পাদচারীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। সুতরাং একটি রাস্তা কতকগুলি রাস্তার সমষ্টি। আর তার মাঝে মাঝে ঘাস ও গাছ লাগিয়ে বেশ বাগানের মত করা হয়েচে। রাস্তার ধারে ধারে পার্ক বা প্লাজা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোকের নামেই এগুলির নামকরণ হয়েচে। দেখলাম একটির নাম 'হিট্লার প্লাজা', আর সেই পার্কটিকে রক্ত

পতাকায় এমন করে’ ঢেকে দিয়েছে যে বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। হিট্‌লারের জন্য জার্ম্মাণীর অনুরাগের রক্তিম লেখা সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলে গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি বাড়ী করে দিয়েছেন নতুন প্ল্যানে। যারা খেটে খায় বা অল্প উপার্জ্জন করে, তাদের বাসের জন্যই এই প্রকাণ্ড ভবনগুলি কল্পিত। দেখ্‌তে বড় বড় রাজপ্রাসাদের মত। কিন্তু অতি সামান্য যাদের আয়, এমন কি মুটে মজুররাও এখানে বাস করতে পারে। অথচ বন্দোবস্ত সমস্তই প্রথম শ্রেণীর। দীনহীন গণনারায়ণের জন্য এমন দরদ না থাকলে নেশন্যাল সোসালিষ্ট গভর্ণমেণ্ট কি দেশের হৃদয়ে এমন গভীর রেখাপাত করতে পারতো? যারা গরীব, যারা দীন দরিদ্র তারাই যে দেশের মেরুমজ্জা এ কথা আমরা বহু দিন ভুলে গেছি।

(আগামী বারে সমাপ্য)

মীর্ণা

শ্রীগৌতম সেন

যাহার রচনা লাগি সৃষ্টি মোর হ’ল উতরোল
আপন সৃজন-বেদনায় ঃ
আপনার দেহাতীত দানে, মোর তিলোত্তমা
আপনি উঠেছে ফুটি প্রস্ফুটিতা যৌবন-চঞ্চলা
তারে তুমি করিও না হেলা!
তুমি তো এসেছো বন্ধু ধরার ধূলায়—
হয়ত বেসেছো ভাল, তোমারে যে বেসেছিলো ভাল ;
কিম্বা ভ্রম’ ফুলে ফুলে—
একেরে করিয়া জয় আর জয়ে উল্লাস তোমার ঃ
দেহের বেদীতে তুমি বলি দাও নিত্য আপনারে।
হয়ত বেসেছো ভাল—
কাঁদিয়াছ আপনার প্রেমে ;
কিন্তু সখি, মোর ছবি তারো ঊর্দ্ধে চলে ঃ
সে যেন অনন্ত নীল আকাশের বিহগ-সঙ্গীত
মূর্চ্ছিয়া পড়েছে ধরাতলে
লক্ষ শত গ্রহের আঘাতে কক্ষচ্যুত দেবতা-প্রেয়সী।
জানি বন্ধু জানি—
আমারি রচনা কাঁদে মাটির আঁধারে,
যেন কোথা দূরে যুগ-যুগান্তের পারে
গুমরি উঠিছে তার লক্ষ শত ফণা!
তারি লাগি বেদনা প্রচুর
আপনি বহিয়া চলি জীবনান্ত কাল ঃ
মৃত্যুসম করি অনুভব—
সে যন্ত্রণা, সেই ক্ষমা, সেই প্রেম তার।
তাহারে বেসেছি ভাল—
তার লাগি করিও না রোষ ঃ
যে আঘাত হানিবারে চাও, লব বক্ষ পাতি
করিব না ক্ষোভ।
যদি বল ঐ নামে ডাকিতে তোমারে,
কানে কানে বলা মোর দুটি ছোট কথা
কেহ জানিবে না, শুধু তুমি আর আমি—
বিশ্বের ভ্রূকুটি রবে পশ্চাতে তোমার।
বল, ডাকি ঐ নামে?—
মীর্ণা তোমারই নাম, কণ্ঠলগ্না আমারই মানসী—
আমারই কল্পনা ল’য়ে বধূ শুচিস্মিতা ঃ
স্বপ্নে তুমি লোকোত্তরা, কবির প্রেয়সী।

জঙ্গম

‘বনফুল’

৪

এই ট্যাক্সি!

ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইতেই শঙ্কর তাহাতে চড়িয়া বসিয়া প্রফেসার মিত্রের বাড়ীর ঠিকানাটা বলিয়া দিল এবং জোরে চালাইতে বলিল। গলা বাড়াইয়া রাস্তার একটা ঘড়িতে দেখিল আটটা বাজিয়া দশ মিনিট। বেশী সময় ত নাই!

ড্রাইভারকে সে আবার বলিল—জোর্‌সে হাঁকাও।

প্রফেসার মিত্রের বাড়ী পৌঁছিয়া শঙ্কর সোজা ড্রয়িং রুমের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়াই সোনাদির সঙ্গে দেখা। মোটর থামিবার শব্দে তিনি বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন—শঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

এ কি শঙ্করবাবু, আবার ফিরলেন যে! আমি ভাবলাম জামাইবাবু বুঝি ফিরে এলেন স্টেশন থেকে।

প্রফেসার মিত্র বাড়ীতে নেই নাকি?

না, তিনি তাঁর বন্ধুদের স্টেশনে তুলে দিতে গেছেন। আপনি এলেন যে আবার?

শঙ্কর বলিল, চলুন ফিল্‌ম্‌টা দেখে আসি।

সোনাদিদির মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন এমনই কিছু একটা তিনি প্রত্যাশা করিতেছিলেন। মুখে কিন্তু সে কথা বলিলেন না। একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, এই না তখন বললেন, হস্টেলের ছুটি পাওয়া যাবে না?

শঙ্কর কিছু না বলিয়া হাসিমুখে শুধু চাহিয়া রহিল।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনি একটু বসুন তাহলে, ওদের খবর দি আমি—

সোনাদিদি ভিতরে চলিয়া গেলেন। শঙ্কর নিকটস্থ সোফাটায় বসিয়া পড়িল। তাহার রগের শিরগুলা দপদপ করিতেছিল।

ম্যান, উওম্যান, ম্যারেজ।

অদ্ভুত ছবি।

আদিম অসভ্য মানব-মানবী হইতে সুরু করিয়া মানব সভ্যতার প্রতি স্তরে নর-নারীর প্রেমলীলা নানা বর্ণে অপূর্ব্ব শিল্পসম্পদে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর তন্ময় হইয়া দেখিতেছিল। একপাশে রিণি, অন্য পাশে সোনাদিদি। রিণির পাশে মিষ্টিদিদি বসিয়াছিলেন। রিণির হাত মিষ্টিদিদির হাতের মধ্যে ছিল। ছবি দেখিতে দেখিতে অজ্ঞাতসারে রিণির হাতখানা মিষ্টিদিদি সজোরে চাপিয়া ধরিলেন, এত জোরে যেন নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিতে চান। রিণি কাতরোক্তি করিয়া উঠিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে?

সলজ্জ রিণি কোন উত্তর দিল না।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, ও কিছু নয়।

ছবি চলিতে লাগিল। রোমের দৃশ্য। সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরূঢ় রোম তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য দুই হাতে মুঠা মুঠা করিয়া ছড়াইয়াও শেষ করিতে পারিতেছে না। বিলাসসজ্জার প্রধান উপকরণ নারী নানা রূপে নানা ভঙ্গীতে স্বপ্নলোকে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে, লাবণ্যময়ী জ্বলন্ত-যৌবনা রূপসীর দল সবল পেশী বলিষ্ঠ দেহ পুরুষদের দৃপ্ত মহিমার নিকট নিজেদের বিলাইয়া দিয়া হাসিকান্নার ক্ষিপ্রস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কেহ ক্রীতদাসী, কেহ সাম্রাজ্ঞী। শঙ্কর অনুভব করিল তাহার দক্ষিণ জানুটায় কিসের যেন চাপ লাগিতেছে। যদিও সে বুঝিতেছিল ইহা কিসের চাপ—তথাপি সে ভাল করিয়া একবার দেখিল, হ্যাঁ সোনাদিদির জানুটাই এদিকে একটু বেশী সরিয়া আসিয়াছে যেন। সোনাদিদি একেবারে আত্মহারা হইয়া ছবি দেখিতেছেন। শঙ্কর একটু সরিয়া বসিল, সরিয়া বসিতে গিয়া আবার রিণির গায়ে গা ঠেকিয়া গেল। রিণি সলজ্জভাবে একটু সরিয়া বসিল। ছবি চলিতে লাগিল।

ইণ্টারভ্যাল।

চতুর্দ্দিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্কর দেখিল মিষ্টি-দিদির চক্ষু দুইটি চকচক্ করিতেছে, সোনাদিদি চঞ্চল

হইয়া উঠিয়াছেন। রিণি সাধারণতই একটু স্থিরস্বভাব, ছবি দেখিয়া সে আরও গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। শঙ্কর নিজেও কেমন যেন উন্মনা হইয়া পড়িয়াছিল। সোনাদিদির বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে বলিলেন, একটু চা খেলে হ'ত। রিণি খাবি?

রিণি মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বাহিরে যাইতে যাইতে শঙ্করের হঠাৎ চোখে পড়িল যে, প্রথম শ্রেণীতে কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গৈরিকধারী ভণ্টুর মেজকাকাও বসিয়া রহিয়াছেন। শঙ্কর হঠাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, চেহারার বেশ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শঙ্করকেও মেজকাকা দেখিতে পাইলেন না। শঙ্কর বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়া চায়ের ফরমাস দিতে দিতে আচম্বিতে শঙ্করের মনে পড়িল—তাহার যে আজ ভণ্টুর সহিত বোস সাহেবের বাড়ী যাওয়ার কথা, মেজকাকার চাকুরির জন্য। হাতঘড়িটা দেখিল, দশটা বাজিয়া গিয়াছে। এখনও ভণ্টু নিশ্চয় তাহার জন্য হস্টেলে বসিয়া নাই। এতরাত্রে হস্টেলে ফিরিয়াই বা সে কি জবাবদিহি করিবে, কানাইটা কি ভাবিবে কে জানে। তাহাদের ব্লকের মনিটার রামকিশোরবাবু লোকটিও ভরসা করিবার মত নহেন। যে স্বপ্নলোকে সে বিচরণ করিতেছিল বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তাহা চুরমার হইয়া গেল। কবিতার যে দুইটি লাইন মনের নিভৃত কোণে গুঞ্জন তুলিয়াছিল তাহারা হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।···একটি ট্রে-তে তিন পেয়ালা চা লইয়া একটি খানসামা একটু পরেই মিষ্টিদিদির সম্মুখীন হইল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও আসিল, তাহার হস্তে একটি প্রকাণ্ড ঠোঙায় ডালমুট।

ইণ্টারভ্যাল শেষ হইল।

আবার ছবি আরম্ভ হইয়া গেল। শঙ্করের কিন্তু মনের সুর কাটিয়া গিয়াছিল। এই যৌবনমত্ত নর-নারীদের নর্ত্তনকুর্দ্দন আর তাহার ভাল লাগিতেছিল না। সমস্ত ছাপাইয়া তাহার মনে হইতেছিল ভণ্টু হয় ত আপিস হইতে ফিরিয়া তাহার আশায় প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ভণ্টুর বৌদিদির মুখখানিও তাহার মনে পড়িল, দারিদ্র্য-নিপীড়িতা—মুখের হাসিটি কিন্তু মরিয়া যায় নাই।

শঙ্কর আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল। সোনাদিদিকে চুপি চুপি বলিল, আমি বাইরে থেকে এখুনি আসচি, আপনারা দেখুন।

সে বাহিরে আসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল যে বিশ্বাসযোগ্য চেনা-শোনা কাহাকেও যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে এই তিনটি নারীকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া সে ভণ্টুর খোঁজে বাহির হইবে।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—অপূর্ব্ববাবু বারান্দার একধারে দাঁড়াইয়া আছেন। শঙ্কর আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনিও ছবি দেখ্‌তে এসেছেন দেখছি।

অপূর্ব্ববাবু কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, এইমাত্র এলাম আমি। টুইশনি থেকে ছুটি পেতেই বড্ড দেরি হয়ে গেল, তার ওপর ওঁদের ওখানে গিয়ে দেখি ওঁরা সব চলে এসেছেন এখানে, রাস্তায় ট্রামটাও এমন আটকে গেল—ভাবছি এখন টিকিট কিনে আর ঢোকাটা কি ঠিক হবে!

শঙ্কর বলিল, না এখন আর ঢুকে কি হবে, ছবি ত প্রায় শেষ হয়ে এল।

শঙ্কর আবার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। অপূর্ব্ববাবুকে দেখিয়া সে মুহূর্ত্তমধ্যে স্থির করিয়া ফেলিল যে ভণ্টুর খোঁজে যাওয়াটা এখন বৃথা। অপূর্ব্ববাবু অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বড়বাবুর অনেক খোসামোদ করিয়া চায়ের নিমন্ত্রণটা তিনি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু সিনেমার নিকট হইতে ছাড়া পাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গেল। তাছাড়া ট্রামটা···

সিনেমা শেষ হইল প্রায় রাত্রি বারোটায়।

ট্যাক্সি করিয়া শঙ্কর যখন মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি ও রিণিকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল তখন প্রফেসার মিত্র ফিরিয়াছেন। রিণি মৃদুকণ্ঠে বলিল, দাদা এখনও লাইব্রেরিতে রয়েছেন, আলো জ্বলছে—

শঙ্করের মনে একটু শঙ্কা ছিল হয় ত প্রফেসার মিত্র রাগ করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে এ ভাবে সকলে মিলিয়া সিনেমায় চলিয়া যাওয়াটা শঙ্করের নিজের কাছেই একটু খারাপ লাগিতেছিল। কিন্তু শঙ্করের শঙ্কা শীঘ্রই অপসারিত হইল। মোটরের শব্দে প্রফেসার মিত্র বাহির হইয়া আসিলেন এবং নাক হইতে চশমাটা কপালের উপর তুলিয়া বলিলেন, ও শঙ্করবাবুর সঙ্গে তোমরা গিয়েছিলে!

আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম অপূর্ব্ব বুঝি এই হুজুগ তুলেছে। কিন্তু তোমরা চলে যাওয়ার একটু পরেই অপূর্ব্বও এসে হাজির, তখন বেয়ারাটা বললে যে তোমরা শঙ্করবাবুর সঙ্গে গেছ! বলিয়া তিনি মোটা বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া বিকশিত দন্তপাঁতিকে আরও বিকশিত করিয়া বলিলেন, কেমন লাগল ছবিটা!

সকলেই একবাক্যে বলিল যে ছবিখানি সুন্দর।

প্রফেসার মিত্র তখন শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমি এখন কোথায় ফিরবে?

হস্টেলে।

শঙ্কর তাহার হস্টেলের নামটাও বলিল।

মিষ্টিদিদি হাসিয়া বলিলেন, তুমি এখন ওঁকে উদ্ধার করো, উনি হস্টেল থেকে ছুটি না নিয়েই চলে এসেছেন।

মিত্র মহাশয়ের চোখে ক্ষণিকের জন্য একটা কৌতুকদীপ্তি জ্বলিয়া নিভিয়া গেল। ভালমানুষের মত হাসিয়া তিনি বলিলেন, আচ্ছা, ফোনে বলে দেব আমি।

রিণি উপরে চলিয়া গেল।

প্রফেসার মিত্র মিষ্টিদিদির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমরা এবার শুয়ে পড় গিয়ে। আমার শুতে আজও রাত হবে; সোফার ওপরে ক্রিটিসিজ্‌মের এ বইখানা ভারি চমৎকার লিখেছে, শেষ না করে শোব না।

মুচকি হাসিয়া সোনাদিদি বলিলেন, দেখবেন, কালকের মত আবার ইজিচেয়ারে শুয়েই ঘুমিয়ে থাকবেন না যেন—

প্রফেসার মিত্রের হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হইয়া উঠিল।

শঙ্কর নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের প্রতি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার আসছেন কবে?

আসব একদিন।

শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল।

প্রায় জনহীন রাজপথ দিয়া শঙ্কর একাকী হাঁটিয়া চলিয়াছে। কলিকাতা নগরী নিদ্রাচ্ছন্ন। রাস্তার দুই ধারে ইলেকট্রিক বাতিগুলি শূন্য পথটিকে আলোকিত করিয়া কাহার যেন অপেক্ষা করিতেছে। সম্মুখের একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর দ্বিতল কক্ষে সহসা একটা নীল আলো দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কাচের জানালা দিয়া অস্পষ্ট দেখা গেল, সেই নীলালোকিত আবেষ্টনীতে দুইটি মূর্ত্তি সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। কলিকাতার পিচঢালা রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে শঙ্করের মনে হইল সে যেন তেপান্তরের মাঠ পার হইতেছে। আর একটু গেলেই যেন জটিল জটাজুটধারী বটবৃক্ষের দেখা পাওয়া যাইবে এবং তাহার শাখায় রূপকথার বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী যেন বিশেষ করিয়া তাহারই জন্য কোন অপরূপ বার্ত্তা লইয়া বসিয়া আছে।

টুং টুং টুং টুং।

একটা রিক্‌শাওয়ালা মন্থরগতিতে বামদিকের গলিটা হইতে বাহির হইল। শঙ্কর রূপকথার রাজ্য হইতে সহসা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ফুটপাথে নামিয়া আসিল।

৫

ঝামাপুকুরের একটি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে একটি ছোট বাড়ী। সেই বাড়ীর বাহিরের ঘরে একটি চৌকির উপর বসিয়া গভীর মনোনিবেশসহকারে এক ব্যক্তি কোষ্ঠিবিচার করিতেছিলেন। বামহস্তে একটি জ্বলন্ত সিগারেট। সম্মুখেই বোতলের মুখে গোঁজা একটি মোমবাতি জ্বলিতেছে। গভীর রাত্রি। ঘরটির মধ্যে আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই নাই। চৌকিটির কাছেই একটি শ্রীহীন কাটের টেবিল এবং ঘরের কোণে প্রকাণ্ড একটা কাঠের আলমারি। আলমারির কপাট দুইটি খোলা রহিয়াছে। আলমারিতে বই ছাড়া বিশেষ কিছুই নাই। বইও নানারকম। অধিকাংশই অবশ্য পুরাতন পঞ্জিকা, কিন্তু অন্য নানা প্রকার পুস্তকেরও অভাব নাই। ডিটেকটিভ উপন্যাস, শেক্সপীয়ারের একখানা নাটক, প্যারাডাইস লস্ট, ক্যালকুলাস, অ্যাষ্ট্রনমি, ঘোড়দৌড় বিষয়ক দুই-চারিখানি পুস্তক, ছবির য়্যালবাম প্রভৃতি নানাজাতীয় বহি অগোছাল ভাবে আলমারিটিতে ঠাসা রহিয়াছে। আলমারির ঠিক নীচেই মেঝের উপরও দুই-একখানা বই পড়িয়া আছে। মেঝের উপর অসংখ্য সিগারেট ও বিড়ির টুকরা ছড়ানো। টেবিলের উপর খানকয়েক বিলাতি মাসিকপত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং রহিয়াছে একবোতল মদ ও তাহার পার্শ্বে কাচের একটি গ্লাস। গ্লাসটিও ফাটা। তক্তাপোষটি নিতান্ত ছোট নয়, বেশ প্রশস্ত। তক্তাপোষের উপর

কোষ্ঠিবিচারক ব্যতীত আরও একজন ছিলেন। তিনি ওপাশে শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন; এত ঘুমাইতেছিলেন যে তাঁহার নাক ডাকিতেছিল। বেশ জোরেই ডাকিতেছিল। কিন্তু এই নাসিকাগর্জ্জন সত্ত্বেও কোষ্ঠিবিচারক নিবিষ্ট মনে আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছিলেন।

কোষ্ঠিবিচারকের নাম করালীচরণ বক্সি। ভদ্রলোকের চেহারা এমন যে, দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকে দীর্ঘ অবিন্যস্ত কেশ, শীর্ণ লম্বা দেহ। একটি চক্ষু কাণা, অপরটি একটু বেশীরকম প্রদীপ্ত, যেন দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। চিবুকটা সূচালো এবং বক্রভাবে সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, মনে হইতেছে যেন তাহা সূক্ষ্মাগ্র সুবৃহৎ নাসাটার অনুকরণ করিতেছে। মুখমণ্ডলে বসন্তের দাগ সুস্পষ্ট। বসন্তরোগেই একটি চক্ষু তাঁহার গিয়াছে। সমস্ত মুখে কোন রোম নাই। শ্মশ্রু গুম্ফ ত নাইই, ভ্রূরও অভাব। অত্যধিক সুরাপানের ফলে ঠোঁট দুইটি হাজিয়া গিয়াছে। করালীচরণ বক্সিকে সকলেই ভয় পাইত, কিন্তু অনেকেই তাঁহার কাছে আসিত; তাহার কারণ, মন দিয়া গণনা করিলে তাঁহার গণনা নাকি একেবারে নির্ভুল। জ্যোতিষশাস্ত্রে এতবড় গুণীলোক সচরাচর নাকি দেখা যায় না।

পাশের বাড়ীর একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল। চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে একবার তাকাইয়া বক্সি মহাশয় সিগারেটটা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং উঠিয়া গিয়া টেবিল হইতে মদের বোতল তুলিয়া লইয়া গেলাসে খানিকটা মদ ঢালিলেন এবং নির্জ্জলাই সেটুকু পান করিয়া ফেলিলেন। বিকৃত মুখটা র‍্যাপার দিয়া মুছিতে মুছিতেই তিনি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিলেন এবং নিপুণভাবে সেটি ধরাইয়া স্বস্থানে আসিয়া পুনরায় বসিলেন। একটি পুরাতন পঞ্জিকা খোলা অবস্থাতেই কাছে পড়িয়াছিল। সেটি হইতে একটি খাতায় তিনি নানারূপ অঙ্ক টুকিতে সুরু করিলেন। টুকিতে টুকিতে তাঁহার চোখে বিচিত্র এক কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ কোষ্ঠিখানি আরও খানিকটা প্রসারিত করিয়া নিবিষ্টমনে কি যেন তিনি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্রায়িত চিবুকটা কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল। উত্তেজিত হইলেই করালীচরণের চিবুকটা কুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়, অধরোষ্ঠ দৃঢ় নিবদ্ধ হইয়া ওঠে। কিছুক্ষণ কোষ্ঠিখানির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পর নীরব হাস্যে করালীচরণের মুখমণ্ডল ভরিয়া গেল। হাসিমুখে কিছুক্ষণ কোষ্ঠিখানির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া আবার তিনি উঠিলেন, বোতলটা হইতে আরও খানিকটা সুরাপান করিলেন এবং বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন যে আর কতটা অবশিষ্ট আছে। তাহার পর হঠাৎ তিনি ডাকিলেন, ভণ্টুবাবু, উঠুন, কত ঘুমুবেন!

চেরা বাজখাঁই আওয়াজ।

ভণ্টুর নাসিকা-গর্জ্জন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। পায়ের পাতাটা মৃদু মৃদু নাচাইতে নাচাইতে ভণ্টু বলিল, না, আমি ঘুমুই নি ত।

কর্কশ কণ্ঠে হাস্য করিয়া করালীচরণ বলিলেন, কি করা হচ্ছিল তাহলে এতক্ষণ? বাই নারায়ণ, এ নাম যদি ঘুম না হয়, তাহলে—

ভণ্টু উঠিয়া হাই তুলিয়া বলিল, থিঙ্ক্ করছিলাম।

করালীচরণ এই কথায় অত্যন্ত জোরে হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইতে লাগিল শুষ্ক শক্ত কাষ্ঠখণ্ডে কে যেন করাত চালাইতেছে।

ভণ্টু বলিল, লদ্‌কা-লদ্‌কি রাখুন, কুষ্টির কি বল?

দুটো কুষ্টিই দেখেছি।

দাদারটা কি রকম দেখলেন?

ভালই, কোন ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবেন। আপনার এই বন্ধুর কুষ্টি কিন্তু ভয়ানক, বাই নারায়ণ!

শঙ্করের? কেন?

উত্তরে করালীচরণ চিবুকটি একবার কুঞ্চিত ও প্রসারিত করিলেন এবং একমাত্র চক্ষুটির তীব্র দৃষ্টি ভণ্টুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এর বেশী এখন আর কিছু বলব না!

ভণ্টু আর একবার হাই তুলিয়া বলিল, কি দেখলেন?

করালীচরণ নীরবে হাসিতেই লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। ভণ্টু হাসিমুখে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল, দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্।

হঠাৎ করালীচরণ উঠিয়া টেবিল হইতে মদের বোতলটা তুলিয়া লইলেন এবং বোতলেই মুখ লাগাইয়া বাকি মদটুকু

নিঃশেষ করিয়া বিকৃত মুখে বলিলেন, শেষ হয়ে গেল! পকেটও আজ একদম খালি। কিছু দেবেন না কি ভণ্টুবাবু?

ভণ্টু দ্বিরুক্তি না করিয়া বুক পকেট হইতে মণিব্যাগটি বাহির করিয়া করালীচরণের হাতে দিল এবং হাসিয়া বলিল, আমার সর্ব্বস্ব দিচ্ছি! কালকের বাজার করবার জন্যে কিছু রেখে বাকি সবটা আপনি নিয়ে নিন—

করালীচরণ সাগ্রহে ব্যাগটি খুলিয়া মোমবাতির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর ব্যাগটি টেবিলের উপর উপুড় করিয়া ধরিলেন। একটি সিকি ও দুইটি পয়সা বাহির হইল।

করালীচরণ ভণ্টুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কত চাই আপনার বাজারের জন্য?

যা দেবেন,

দু আনায় হবে?

হবে।

যান তাহলে এই সিকিটা ভাঙিয়ে দু আনার সিগারেট আনুন, আর বাকি দু আনা আপনি নিয়ে নিন—

কোন্ সিগারেট আনব?

যা খুশি।

করালীচরণ প্যাকেট হইতে শেষ সিগারেটটি বাহির করিয়া ভণ্টুর দিকে পিছন ফিরিয়া সেটি ধরাইতে লাগিলেন। সেই সুযোগে ভণ্টু পিছন হইতে নানা রূপ মুখভঙ্গী করিয়া করালীচরণকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। করালীচরণ সিগারেট ধরানো শেষ করিয়া বাকি পয়সা দুইটিও ভণ্টুর হাতে দিয়া বলিলেন, এ দুটোও নিয়ে যান, একটা ছোট পাঁউরুটি কিনে আনবেন।

দিন।

ভণ্টু বাহির হইয়া গেল।

ভণ্টু চলিয়া গেলে করালীচরণ বামহস্তে জ্বলন্ত সিগারেটটি ধরিয়া নিজের দক্ষিণ করতলটি নির্ব্বাপিতপ্রায় মোমবাতির আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং সেইদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সহসা তাঁহার নজরে পড়িল মোমবাতিটি আর বেশীক্ষণ টিকিবে না। আপন মনেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, দু-একটা মোমবাতি আনতে বললে ঠিক হত! বাই নারায়ণ, হাতে একদম কিছু নেই আজ!

নির্ব্বাণোন্মুখ শিখাটি কাঁপিতে লাগিল। একচক্ষু মেলিয়া করালীচরণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ক্যাঁচ করিয়া একটা মোটর বাহিরে থামিল।

করালীবাবু বাড়ী আছেন?

আছি।

করালীচরণ বাহিরে গেলেন। বাহিরে একটি প্রকাণ্ড মোটর দাঁড়াইয়াছিল। মোটরের ভিতর একজন মোটা গোছের ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহার পাশে আর একজন যিনি ছিলেন—করালীবাবু আসিতেই তিনি নামিয়া আসিলেন এবং সবিনয়ে প্রশ্ন করিলেন, আপনার নামই কি করালীচরণ বক্সি? রেস সম্বন্ধে আপনিই কি গণনা করেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শাল্‌কের পরেশবাবুকে কি আপনিই গণনা করে দিয়েছিলেন? তাঁর কাছে আপনার নাম শুনে আমরা এসেছি।

কি দরকার—

গোণাতে চাই।

করালীচরণ একেবারে কাজের কথা পাড়িলেন।

বলিলেন, আমার কাছে গোণাতে হলে পঞ্চাশ টাকা লাগে। আপনাদের নির্দ্ধারিত বলে দেব, রেস খেললে জিতবেন কি-না।

মোটরে উপবিষ্ট স্থূলকায় ভদ্রলোকটি এবার নামিয়া আসিলেন। ভদ্রলোক স্থূলকায় হইলেও অল্পবয়স্ক, মুখখানি নিতান্ত কচি। কচি মুখটিতেই বিজ্ঞতার ভাব ফুটাইয়া তিনি বলিলেন, আপনার দক্ষিণা নিশ্চয়ই দেব। তবে আমরা হলাম মধ্যবিত্ত লোক, ঠকতেও চাই না, ঠকাতেও চাই না—

করালীচরণ তাঁহার এক চক্ষুর দৃষ্টি তুলিয়া এমনভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন যেন কোন মহারাজা কোন গরীব প্রজার নিবেদন শুনিতেছেন।

আমি পঞ্চাশ টাকা নিয়ে থাকি, তবে কাউকে পীড়ন করতে আমি চাই না। যা সাধ্যে কুলোয় দেবেন, দর কষাকষি করা আমার স্বভাব নয়।

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করিয়া দুইখানি দশ টাকার নোট বাহির করিলেন এবং বলিলেন, এই আমার প্রথম

কাজ আপনার সঙ্গে, যদি পরস্পর পটে যায়, টাকার জন্যে আটকাবে না।

আচ্ছা, দিন।

করালীচরণ হস্ত প্রসারিত করিয়া নোট দুইটি লইয়া তাঁহার ছিন্ন জামার পকেটে রাখিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, কাল সকালে আসবেন তাহলে, আজ এত রাত্রে হবে না। নোট দুইটি এভাবে করালীচরণের পকেটে অগ্রিম চলিয়া গেল দেখিয়া স্থূলকায় ভদ্রলোকটি মনে মনে বোধ হয় একটু বিচলিত হইলেন। বলিলেন, কাজটা আজ রাত্রেই মিটে গেলেই ভাল হ'ত না?

করালীচরণ উত্তর দিলেন—আজ হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে নোট দুইখানি ফেরত দিয়া বলিলেন, কালও আর আসবার দরকার নেই আপনার। আপনার কাজ আমি করব না। আমার ওপর যখন বিশ্বাসই নেই, তখন আমার কাছে আসাই আপনার পণ্ডশ্রম হয়েছে! বাই নারায়ণ, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ আমি করি না!

সে কি কথা—সে কি কথা—

ত্রস্ত হইয়া উভয় ভদ্রলোকই আগাইয়া আসিলেন। স্থূলকায় ভদ্রলোক নোট দুইটি করালীচরণের পকেটে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, রাগ করবেন না করালীবাবু, টাকাটা রাখুন। বেশ, কাল সকালেই হবে, কখন আসব বলুন।

করালীচরণ বক্সি কখনও কাউকে কথা দেয় নি আজ পর্য্যন্ত! কাল সকালে দশটার ভেতর আসবেন যদি বাড়ীতে থাকি এবং মেজাজ ঠিক থাকে দেখা হবে—

স্থূলকায় ভদ্রলোকের সঙ্গীটি আড়াল হইতে চোখের কি একটা ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত অনুসারে স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন—আচ্ছা বেশ, বেশ, তাই হবে! কাল সকালেই আসব এখন। আচ্ছা, চলি তবে—নমস্কার!

তাই আসবেন, নমস্কার!

মোটরকার চলিয়া গেল। মোটরখানার দিকে তাকাইয়া করালীচরণ স্বগতোক্তি করিলেন—শ্‌শালা!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভণ্টু আসিয়া পড়িল। পাঁউরুটিটা করালীবাবুর হাতে দিয়া ভণ্টু বলিল, দু'আনায় হাতী ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না।

করালীবাবু সঙ্গে সঙ্গে ভণ্টুর হস্তে নোট দুইখানি দিয়া বলিলেন—এই নিন। হাতী ফেরত দিয়ে আসুন। এক টিন নাইন নাইন নাইন আর এক বোতল হুইস্কি চট করে এনে দিয়ে যান। আপনার পয়সাটাও ফেরত নিয়ে নেবেন, নিতান্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলাম বলেই আপনার কাছে হাত পাততে হয়েছিল, বাই নারায়ণ!

ভণ্টু চট্ করিয়া হেঁট হইয়া করালীচরণের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। করালীচরণ একটু সরিয়া গিয়া বলিলেন, আঃ কি যে করেন আপনি রোজ!

ভণ্টু হাত জোড় করিয়া কহিল, এ সুখ থেকে বঞ্চিত করবেন না দাদা।

করালীচরণ বলিলেন, আপনার কাছ থেকে পয়সা নেওয়াটা সত্যিই আমার উচিত নয়। আমার সন্তরোগে আপনি যে সেবাটা করেছিলেন তার তুলনা হয় না। নৈহাটি স্টেশনে আপনার সঙ্গে দেখা না হলে মরেই যেতাম আমি, বাই নারায়ণ! সে কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

ভণ্টু আবার তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

করালীচরণ পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া বলিলেন, দেরি হয়ে গেছে। চিৎপুর অঞ্চলে না গেলে মাল পাবেন না।

ভণ্টু জিজ্ঞাসা করিল, টাকাটা পেলেন কোথা থেকে হঠাৎ?

করালীচরণের প্রদীপ্ত চক্ষুটি টর্চের মত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, এসেছিল দু শালা—

ভণ্টু আবার বাইকে চড়িয়া রওনা হইয়া পড়িল।

ভণ্টু চলিয়া গেলে করালীচরণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই সেই শুকনো পাঁউরুটিটা কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতে লাগিলেন। নিমেষের মধ্যে রুটিটা শেষ হইয়া গেল। জল খাইবার জন্য ভিতরে ঢুকিয়া করালীচরণ দেখিলেন যে মোমবাতি নিভিয়া গিয়াছে, ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার এবারও ভণ্টুকে মোমবাতি আনিতে বলা হইল না—বাই নারায়ণ!

স্বল্পালোকিত গলিটির মধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত করালীচরণ একা একা প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। করালীচরণের পৃথিবীতে আপনার জন কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে আছে এই জীর্ণ বাড়ীখানা। বিধবা মা কাশীতে ছিলেন, সেদিন দেহরক্ষা করিয়াছেন। বিধবা মা-ই বহুকষ্টে করালীচরণকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। বাবার

কথা করালীচরণের মনেও পড়ে না। বাল্যকাল হইতে যতদূর মনে পড়ে সবই মা। করালী একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। গণিতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.। কিন্তু একথা আজ কেহ জানে না। করালীচরণও ইহা কাহাকেও বলেন না। আধুনিক পরিচিত মহলে করালীচরণ বক্সি বুদ্ধিমান জ্যোতিষী বলিয়া বিখ্যাত। কেহ বলে লোকটা পাগল, কেহ বলে পণ্ডিত, কেহ বলে শয়তান।

ভণ্টু সেদিন রাত্রে যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। বউদিদি জাগিয়া ছিলেন। তিনি উৎকণ্ঠিত মুখে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

উঃ, কত রাত তুমি করলে ঠাকুর-পো!

ঘোর কেতুর পাল্লায় পড়েছিলাম, বাইকটা একটু ধর ত।

ভণ্টু বাইকটা দুই হাতে ধরিয়া বউদিদির সাহায্যে সেটা বারান্দার উপর তুলিয়া ফেলিল।

তোমার দাদার কুষ্ঠিটা নিয়ে গেছলে না কি জ্যোতিষীর কাছে?

হ্যাঁ, কেতুশ্রেষ্ঠ করালীই ত ডোবালে আজ! বিরাট কেতুকি আক্কেয়ারে ঢুকেছিলাম।

বউদিদির কোলের ছেলেটা ঘরের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল। বউদিদি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন ও ছেলেটাকে চাপড়াইতে চাপড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বললেন দেখে, কোন ভয় নেই ত!

না।

বউদিদি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ না ত, লুকিয়ো না লক্ষ্মীটি—

ইহার উত্তরে নেপথ্য হইতে ভণ্টু ঠোঁট দুইটি বিকৃত করিয়া বউদিদিকে ভ্যাংচাইতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে বউদিদি আবার প্রশ্ন করিলেন, কোন উত্তর দিচ্ছ না যে?

ভণ্টু মুখটা বিকৃত করিয়া রাখিয়া বলিল, বাইরে এসো।

বউদিদি বাহিরে আসিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

লদ্‌কা-লদ্‌কি রেখে এখন খেতে দাও।

খাবার ত ঢাকা রয়েছে, ওই সামনেই দেখতে পাচ্ছ না! আর একটা থালায় কার খাবার?

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, আমিও এখনও খাইনি।

ভণ্টু আর একবার মুখবিকৃতি করিয়া ভ্যাংচাইল।

আহা, মুখ করা হচ্ছে দেখ না!

ভণ্টু হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। বউদিদি বাতিটা একটু উস্কাইয়া দিয়া বলিলেন, জ্যোতিষীর নাম করালীচরণ! কি অদ্ভুত নাম গো!

সেই কানা করালী!

ও, সেই যাকে তুমি নৈহাটি স্টেশন থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলে? খুব ভাল জ্যোতিষী?

অসাধারণ! চাম লদ্—

উভয়ে খাইতে বসিল।

খাইতে খাইতে বউদিদি হঠাৎ বলিলেন—ওহো, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, শঙ্কর ঠাকুরপো এসেছিল, রাত বারোটার পর!

ভণ্টু বলিল, চোর কোথাকার! সমস্ত সন্ধ্যেটা আমার মাটি করে দিয়ে রাত বারটার পর আসা হয়েছে! কিছু বলে গেছে নাকি!

একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।

কোথায় চিঠি?

বউদিদি এঁটো হাতেই উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটি পত্র আনিয়া ভণ্টুর হাতে দিলেন। ক্ষুদ্র পত্র।

ভাই ভণ্টু,

সন্ধ্যের সময় এক জায়গায় আটকে পড়েছিলাম। কাল সকালে উঠেই বোস সায়েবের ওখানে যাব। তুই বিকেলে আসিস শঙ্কর।

ভণ্টু পুনরায় বলিল, চোর কোথাকার!

কিছুক্ষণ পরে ভণ্টু জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজির খবর কি?

বাবাজি আজ সিনেমা দেখতে গেছে, কে কে সব ডাকতে এসেছিল যেন, কোথায় নেমন্তন্ন আছে, বলে গেছে সকালে ফিরবে।

পাশের ঘরে খুট খুট করিয়া আওয়াজ হইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেশলাই কাঠি জ্বালার শব্দ পাওয়া গেল। বাকু উঠিয়া তামাক সাজিতেছেন। একটু পরেই দরাজ গলায় কাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, বড় বৌমা, উঠেছ না কি? চা চড়াও তাহলে—

কাজ আপনার সঙ্গে, যদি পরস্পর পটে যায়, টাকার জন্যে আটকাবে না।

আচ্ছা, দিন।

করালীচরণ হস্ত প্রসারিত করিয়া নোট দুইটি লইয়া তাঁহার ছিন্ন জামার পকেটে রাখিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, কাল সকালে আসবেন তাহলে, আজ এত রাত্রে হবে না। নোট দুইটি এভাবে করালীচরণের পকেটে অগ্রিম চলিয়া গেল দেখিয়া স্থূলকায় ভদ্রলোকটি মনে মনে বোধ হয় একটু বিচলিত হইলেন। বলিলেন, কাজটা আজ রাত্রেই মিটে গেলেই ভাল হ'ত না?

করালীচরণ উত্তর দিলেন—আজ হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে নোট দুইখানি ফেরত দিয়া বলিলেন, কালও আর আসবার দরকার নেই আপনার। আপনার কাজ আমি করব না। আমার ওপর যখন বিশ্বাসই নেই, তখন আমার কাছে আসাই আপনার পণ্ডশ্রম হয়েছে! বাই নারায়ণ, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ আমি করি না!

সে কি কথা—সে কি কথা—

ত্রস্ত হইয়া উভয় ভদ্রলোকই আগাইয়া আসিলেন। স্থূলকায় ভদ্রলোক নোট দুইটি করালীচরণের পকেটে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, রাগ করবেন না করালীবাবু, টাকাটা রাখুন। বেশ, কাল সকালেই হবে, কখন আসব বলুন।

করালীচরণ বক্সি কখনও কাউকে কথা দেয় নি আজ পর্য্যন্ত! কাল সকালে দশটার ভেতর আসবেন যদি বাড়ীতে থাকি এবং মেজাজ ঠিক থাকে দেখা হবে—

স্থূলকায় ভদ্রলোকের সঙ্গীটি আড়াল হইতে চোখের কি একটা ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত অনুসারে স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন—আচ্ছা বেশ, বেশ, তাই হবে! কাল সকালেই আসব এখন। আচ্ছা, চলি তবে—নমস্কার!

তাই আসবেন, নমস্কার!

মোটরকার চলিয়া গেল। মোটরখানার দিকে তাকাইয়া করালীচরণ স্বগতোক্তি করিলেন—শ্‌শালা!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভণ্টু আসিয়া পড়িল। পাঁউরুটিটা করালীবাবুর হাতে দিয়া ভণ্টু বলিল, দু'আনায় হাতী ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না।

করালীবাবু সঙ্গে সঙ্গে ভণ্টুর হস্তে নোট দুইখানি দিয়া বলিলেন—এই নিন। হাতী ফেরত দিয়ে আসুন। এক টিন নাইন নাইন নাইন আর এক বোতল হুইস্কি চট করে এনে দিয়ে যান। আপনার পয়সাটাও ফেরত নিয়ে নেবেন, নিতান্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলাম বলেই আপনার কাছে হাত পাততে হয়েছিল, বাই নারায়ণ!

ভণ্টু চট্ করিয়া হেঁট হইয়া করালীচরণের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। করালীচরণ একটু সরিয়া গিয়া বলিলেন, আঃ কি যে করেন আপনি রোজ!

ভণ্টু হাত জোড় করিয়া কহিল, এ সুখ থেকে বঞ্চিত করবেন না দাদা।

করালীচরণ বলিলেন, আপনার কাছ থেকে পয়সা নেওয়াটা সত্যিই আমার উচিত নয়। আমার বহুমূত্ররোগে আপনি যে সেবাটা করেছিলেন তার তুলনা হয় না। নৈহাটি স্টেশনে আপনার সঙ্গে দেখা না হলে মরেই যেতাম আমি, বাই নারায়ণ! সে কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

ভণ্টু আবার তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

করালীচরণ পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া বলিলেন, রাত দেরি হয়ে গেছে। চিৎপুর অঞ্চলে না গেলে মাল পাবেন না।

ভণ্টু জিজ্ঞাসা করিল, টাকাটা পেলেন কোথা থেকে হঠাৎ?

করালীচরণের প্রদীপ্ত চক্ষুটি টর্চের মত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, এসেছিল দু শালা—

ভণ্টু আবার বাইকে চড়িয়া রওনা হইয়া পড়িল।

ভণ্টু চলিয়া গেলে করালীচরণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই সেই শুকনো পাঁউরুটিটা কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতে লাগিলেন। নিমেষের মধ্যে রুটিটা শেষ হইয়া গেল। জল খাইবার জন্য ভিতরে ঢুকিয়া করালীচরণ দেখিলেন যে মোমবাতি নিভিয়া গিয়াছে, ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার এবারও ভণ্টুকে মোমবাতি আনিতে বলা হইল না—বাই নারায়ণ!

স্বল্পালোকিত গলিটির মধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত করালীচরণ একা একা প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। করালীচরণের পৃথিবীতে আপনার জন কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে আছে এই জীর্ণ বাড়ীখানা। বিধবা মা কাশীতে ছিলেন, সেদিন দেহরক্ষা করিয়াছেন। বিধবা মা-ই বহুকষ্টে করালীচরণকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। বাবার

কথা করালীচরণের মনেও পড়ে না। বাল্যকাল হইতে যতদূর মনে পড়ে সবই মা। করালী একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। গণিতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.। কিন্তু একথা আজ কেহ জানে না। করালীচরণও ইহা কাহাকেও বলেন না। আধুনিক পরিচিত মহলে করালীচরণ বক্সি বুদ্ধিমান জ্যোতিষী বলিয়া বিখ্যাত। কেহ বলে লোকটা পাগল, কেহ বলে পণ্ডিত, কেহ বলে শয়তান।

ভণ্টু সেদিন রাত্রে যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। বউদিদি জাগিয়া ছিলেন। তিনি উৎকণ্ঠিত মুখে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

উঃ, এত রাত তুমি করলে ঠাকুর-পো!

ঘোর কেতুর পাল্লায় পড়েছিলাম, বাইকটা একটু ধর ত।

ভণ্টু বাইকটা দুই হাতে ধরিয়া বউদিদির সাহায্যে সেটা বারান্দার উপর তুলিয়া ফেলিল।

তোমার দাদার কুষ্ঠিটা নিয়ে গেছলে না কি জ্যোতিষীর কাছে?

হ্যাঁ, কেতুশ্রেষ্ঠ করালীই ত ডোবালে আজ! বিরাট কৈতুকি ম্যাফেয়ারে ঢুকেছিলাম।

বউদিদির কোলের ছেলেটা ঘরের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল। বউদিদি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন ও ছেলেটাকে চাপড়াইতে চাপড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বললেন দেখে, কোন ভয় নেই ত!

না।

বউদিদি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ না ত, লুকিয়ো না লক্ষ্মীটি—

ইহার উত্তরে নেপথ্য হইতে ভণ্টু ঠোঁট দুইটি বিকৃত করিয়া বউদিদিকে ভ্যাংচাইতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে বউদিদি আবার প্রশ্ন করিলেন, কোন উত্তর দিচ্ছ না যে?

ভণ্টু মুখটা বিকৃত করিয়া রাখিয়া বলিল, বাইরে এসো।

বউদিদি বাহিরে আসিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

লদ্‌কা-লদ্‌কি রেখে এখন খেতে দাও।

খাবার ত ঢাকা রয়েছে, ওই সামনেই দেখতে পাচ্ছ না! আর একটা থালায় কার খাবার?

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, আমিও এখনও খাইনি।

ভণ্টু আর একবার মুখবিকৃতি করিয়া ভ্যাংচাইল।

আহা, মুখ করা হচ্ছে দেখ না!

ভণ্টু হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। বউদিদি বাতিটা একটু উস্কাইয়া দিয়া বলিলেন, জ্যোতিষীর নাম করালীচরণ! কি অদ্ভুত নাম গো!

সেই কানা করালী!

ও, সেই যাকে তুমি নৈহাটি স্টেশন থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলে? খুব ভাল জ্যোতিষী?

অসাধারণ! চাম লদ্—

উভয়ে খাইতে বসিল।

খাইতে খাইতে বউদিদি হঠাৎ বলিলেন—ওহো, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, শঙ্কর ঠাকুরপো এসেছিল, রাত বারোটার পর!

ভণ্টু বলিল, চোর কোথাকার! সমস্ত সন্ধ্যেটা আমার মাটি করে দিয়ে রাত বারটার পর আসা হয়েছে! কিছু বলে গেছে নাকি!

একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।

কোথায় চিঠি?

বউদিদি এঁটো হাতেই উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটি পত্র আনিয়া ভণ্টুর হাতে দিলেন। ক্ষুদ্র পত্র।

ভাই ভণ্টু,

সন্ধ্যের সময় এক জায়গায় আটকে পড়েছিলাম। কাল সকালে উঠেই বোস সায়েবের ওখানে যাব। তুই বিকেলে আসিস শঙ্কর।

ভণ্টু পুনরায় বলিল, চোর কোথাকার!

কিছুক্ষণ পরে ভণ্টু জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজির খবর কি?

বাবাজি আজ সিনেমা দেখতে গেছে, কে কে সব ডাকতে এসেছিল যেন, কোথায় নেমন্তন্ন আছে, বলে গেছে সকালে ফিরবে।

পাশের ঘরে খুট খুট করিয়া আওয়াজ হইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেশলাই কাঠি জ্বালার শব্দ পাওয়া গেল। বাকু উঠিয়া তামাক সাজিতেছেন। একটু পরেই দরাজ গলায় কাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, বড় বৌমা, উঠেছ না কি? চা চড়াও তাহলে—

বউদিদি হাস্য-দীপ্ত চক্ষে ভণ্টুর পানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি স্টোভটা ধরিয়ে দিয়ে শোও ঠাকুরপো! আমি ও ভাল ধরাতে পারি না—বড্ড তেল উঠে পড়ে! তোমাকে বলে বলে হেরে গেছি, কিছুতেই তুমি ওটা সারিয়ে আনলে না!

ভণ্টু উত্তরে কিছু না বলিয়া বউদিদির পাত হইতে মাছের একটা কাঁটা তুলিয়া লইয়া চিবাইতে লাগিল।

বাঃ, ওটা আমি চিবোব বলে আলাদা করে রেখে দিয়েছি, বেশ ত তুমি!

ভণ্ট বলিল—খুজবুজ্!

ক্রমশঃ

একা

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

পিছনের বন্ধনেরে দূরে দূরে দূরে ফেলে চলিতেছি কোথা যাযাবর ?
নয়নের প্রান্তে কেন ঘনাতেছে গাঢ় মেঘ ? সে কি নহে মায়ার নিশ্বাস ?
এপারে বৈশাখী ঝড়ে চলিতেছি পথবাহি, ওপারেতে এলো মধুমাস ;
কঠিন পর্ব্বতশিরে প্রণাম জানাতে গিয়ে বক্ষ পাতি নিনু বিষ-শর ?
চলিতেছি কোথা যাযাবর ?

পুষ্পবিতানে বসি' স্বপন দেখেছি শুধু বিলাসের মধুর স্বপন—
আকাশের চাঁদ যেন বালুবেলাতটে পড়ি' ডেকেছিল তাই বারেবার—
স্বপন-যমুনা জলে অযুত স্বপনী বালা মালা দেছে গলে বেদনার ;
কুতূহলি আঁখি মেলি নিরালা বিতানে বসি' মধুময় করেছি লগন।
বিলাসের মধুর স্বপন।

সব কি রে টুটে গেছে, এমন রূপালী রাতে, এত ত্বরা নিভে গেছে সব ?
মানুষ মানুষী হেরে নয়নে শিহর কই ? দাবানলে পুড়িল কি বন ?
গানের পিঞ্জর হ'তে চলে গেছে সুরপরী, শ্মশান যে হ'ল তপোবন !
কোথায় হারানো মেঘ ? তৃষিত চাতক সম বৃথা কাঁদা, বৃথা কলরব।
এত ত্বরা নিভে গেছে সব ?

কুঞ্জদুয়ারে বুঝি এখনো জোনাকি কাঁদে, গভীর আঁধার রাতে হায়
আমার হারানো বাঁশি অনামী রাধার নামে কেঁদে কেঁদে ফিরিতেছে যেন ;
লজ্জাবতীর পাতা বিমলিন আঁখি তুলি বলিল কি 'দশা কেন হেন ?'
নগরে ফেলিয়া দূরে সরোবর তীরে কেউ বাজালো কি বেহাগে সানাই ?
গভীর আঁধার রাতে হায় ?

শ্রমের অনেক দাম, স্বপনেতে জ্বালা শুধু আজ যেন সবি বুঝিলাম।
'ঝড় এল, ঝড় এল, তপ্ত বালুকা ওড়ে, ঘরে এস, এস যাযাবর ?'
আমারে মরণ মাঝে ঠেলে দিয়ে সাবধানী, দাম কোথা রহে এ কথার ?
তোমাদের বিষ-শরে অবশ হতেছে দেহ, শুভাশীষ বলে মানিলাম।
আজ যেন সবি বুঝিলাম।

তোমাদের এ শ্যামল প্রান্তর ছাড়িয়া আমি চলিতেছি আজ কেন একা,
সেকথা স্মরণে এলে কাজল মেঘের পানে আমার ছায়ারে দেখে নিয়ো।
পার তো নিভৃতে বসি' আমার নামেরে ডাকি' বহুবার অভিশাপ দিয়ো ;
সকলি থাকিতে তবু হারানু সবারে ভাই ; মুছে যায় স্মরতির রেখা।
চলিতেছি আজ কেন একা!

জাপান

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জাপান! আজ সারা দুনিয়ার নজর পড়েছে তার উপর। তার শিল্প, তার বাণিজ্য, তার সংস্কৃতি, তার শৌর্য্য, আজ সারা বিশ্বের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আজ সে তার মস্তিষ্কের উর্ব্বরতায়, কর্ম্মের পটুতায়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিকল্পনায় সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে।

অথচ বেশীদিনের কথা নয়, জাপানের এ সব কিছুই ছিল না। না ছিল তার সাহিত্য, না ছিল তার শিল্প; বাণিজ্য ত' কিছু, সে ছিল তার নিজের সীমানায় সীমাবদ্ধ। শৌর্য্য তার ছিল, সে শুধু "সামুরাই" বা সামন্ত-রাজাদের খেয়োখেয়ি—যেমন ছিল মধ্যযুগে ভারতবর্ষে। সে একটা উৎকট আত্মাভিমানের যুগ—পরস্পরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের অপচেষ্টার কাহিনী,—যেমন ছিল একদিন আমাদের দেশে রাজপুতানায়!

প্রথম বাইরের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করলে রুষ-জাপান যুদ্ধের সময়। সেই সময়, জাপানে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁর নাম সম্রাট মেইজি! তাঁর প্রভাবে জাপান যেন রাতারাতি বদ্‌লে গেল—ঠিক যেন যাদুকরের যাদুদণ্ডের স্পর্শে! বদ্‌লে গেল তার রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা, তার সামাজিক বিধি-নিষেধ, বদ্‌লে গেল তার অশন, বসন, এমন কি তার ব্যক্তিগত জীবন পর্য্যন্ত! তার প্রাচ্য সংস্কার-বহুল ভাবপ্রবণ জীবনের উপর লাগ্‌ল পাশ্চাত্য জড়বাদী জীবনের রঙ! কলাকুশল জাপান সে রঙকে সুন্দর মানান-সই করে' তুল্‌লে তার নিপুণ তুলিকা দিয়ে! কোথায়ও খাপছাড়া রঙের আঁচড় রইল না।

এ জিনিসটা আমাদের দেশে আমরা পারিনি। যেখানেই আমরা পাশ্চাত্যের রঙ লাগিয়েছি, সেইখানেই হয়ে আছে তা খাপছাড়া, বেমানান। আমাদের প্রাচ্য পটভূমিকায় উপর পাশ্চাত্য রঙের তুলি যেখানেই আমরা টেনেছি, সেইখানেই মিল খাওয়াতে পারিনি! ছবির রূপ-বিন্যাসের সঙ্গে সে টানগুলি সর্ব্বত্রই অতি তীব্র, অতি উগ্র হয়েই দেখা দিয়েছে। রবিবর্ম্মার তুলি দিয়ে রাফায়েলের ছবি আমরা আঁক্‌তে পারিনি!

কিন্তু জাপান তা পেরেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার এই সুশোভন সম্মিলনই জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব। কেমন করে দিনের পর দিন সে বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে সে ইতিহাসের কথা। কিন্তু ইতিহাসের গবেষণা ঐতিহাসিকের উপরেই থাকুক্। বর্ত্তমানে কি রূপ নিয়ে সে চিত্র ফুটে উঠেছে, প্রাচ্যের বনিয়াদের উপর পাশ্চাত্য ইমারত কি ভাবে গড়ে উঠেছে, তাই দেখ্‌বার জন্যই আমি জাপান গিয়েছিলাম এবং দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

মুগ্ধ হয়েছি তার ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য্য দেখে—তার শৌর্য্যে নয়, রাজনীতিতে নয়। গত কয়েক বৎসর ধরে' তার রাজনীতির অভিযান যে পথে চলেছে, তার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে নানারকমের মতামত আছে, যেমন সকল ব্যাপারেরই থাকে। স্যর রোজার-এর জ্ঞানগর্ভ অমূল্য উক্তি—Much may be said on both sides জগতের কোন ব্যাপারেই অপ্রযোজ্য নয়। জাপানের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির বিপক্ষে যেমন জাহাজ-প্রমাণ যুক্তি আছে—স্বপক্ষেও তেম্‌নি। সে জাহাজের খবরে আমার মত আদার ব্যাপারীর আবশ্যক নাই।

সকল দেশেই রাজনীতির একটা আলাদা জাতি থাকে। তাদের পেশাই রাজনীতি। সাধারণ লোকের সঙ্গে তার বড় একটা সম্বন্ধ নেই। তাদের উদর-নীতির কাছে রাজনীতির স্থান নেই। সর্ব্বত্রই তাই। যেমন রাজতন্ত্রের দেশে, তেম্‌নি প্রজাতন্ত্রের দেশে; যেমন প্রাচ্যে, তেম্‌নি পাশ্চাত্যে।

প্রাচ্যের লোক, যেরূপেই হোক, একভাবে না একভাবে তারা আদর্শবাদী, আর সেই জন্যই তারা প্রতিমাবাদী! হিরো-ওয়ারশিপ তার অতি নিকৃষ্ট রূপ নিয়েই তাদের রক্তে-মাংসে জড়িয়ে আছে। সংস্কৃতির দিক দিয়ে তাদের অধিকাংশ এখনও—এই বিংশশতাব্দীতেও, সেই মধ্যযুগের

মিষ্টিসিজ্‌ম্‌-এর গণ্ডী পেরিয়ে যেতে পারেনি। তাই যেখানেই তারা দেখ্‌তে পায় কোন অনন্য-সাধারণ শক্তির বিকাশ—সে ধর্ম্মের হোক, নীতির হোক, জ্ঞানের হোক, অথবা অর্থেরই হোক, সেইখানেই তারা মস্তক অবনত করে শ্রদ্ধায়! তারা ভুলে যায় তাদের ইষ্টানিষ্ট, ভুলে যায় তাদের ব্যক্তিগত মতামত। মানুষের এই প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার হাত থেকে কোন দেশই বাদ পড়েনি। সেই জন্যই, মানুষের এই দৈহিক ও মানসিক গঠন-ত্রুটির ফলেই, গণতন্ত্রবাদ সর্ব্বত্রই শুধু ডিক্টেটরশিপ প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। মহাত্মা রুষো বলেছিলেন, গণতন্ত্র স্বাধীনতা ভোগ করে কেবল একদিন—শুধু ভোটের দিন। বোধ হয় তাও সত্য নয়। ভোটাধিকারের অস্ত্রে তারা বলি দেয় স্বাধীনচিন্তার অধিকারকে তাদের শ্রদ্ধার প্রতিমার চরণ-তলায়!

অতি পুরাতন যুগে আমাদের দেশে যে গণতন্ত্রের কাঠামো ছিল, তারও মূলে ছিল এই হিরো ওয়ারশিপ; ভোটের বলে গ্রাম-প্রধানগণের নির্ব্বাচন হ'ত না, তাদের প্রধানত্ব আপনিই গড়ে উঠ্‌ত গ্রামবাসিগণের শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর। তার পুষ্টি ও বৃদ্ধি হ'ত রাজতন্ত্রের আওতায়। যেমন বর্ত্তমানে আছে বৃটেনে, যেমন আছে জাপানে!

কিন্তু বৃটেনের পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সঙ্গে জাপানের প্রাচ্য গণতন্ত্রের তফাৎ আছে। প্রাচ্যের এই হিরো-ওয়ারশিপ মনোবৃত্তি জাপানে যতখানি আছে, বৃটেনে তা নেই। জাপানের শাসনতন্ত্র গড়ে উঠেছিল অনেকটা ভারতের জাতিভেদ প্রথার ভিত্তির উপর। এখনও সেই কাঠামো আছে, শুধু রূপের কিছু রকমফের হয়েছে মাত্র। জাপানী ব্রাহ্মণ দেবমন্দিরে পূজা-অর্চ্চনা, শাস্ত্রালোচনা নিয়েই এখনও দিন কাটান—ভারতের ব্রাহ্মণের মতই। কিন্তু রাজারা রাজকার্য্যে আর তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন না, যেমন ভারতে তেম্‌নি জাপানে! জাপানের ক্ষত্রিয়—মিলিটারী। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যবিস্তার তাঁদের কাজ। তা তাঁরা পূরাদস্তরই কর্‌ছেন। জাপানী বৈশ্য সারা দুনিয়ায় আজ তাদের বাণিজ্য বিস্তার করেছে। জাপানী শূদ্র অতি উষর পর্ব্বতগাত্রকেও শস্য-শ্যামল ক'রে তুলেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই কর্ম্ম-বিভাগ তাদের বংশগত হয়ে দাঁড়ায়নি, অথবা তাদের ভিতর বর্ণ-বৈষম্যের সৃষ্টি করেনি।

রাজা তাদের সমস্ত জাতির উপর। তাঁকে জাপানীরা ভক্তি করে দেবতার মত। রাজপ্রাসাদের বহুদূরে দাঁড়িয়েই রাজভক্ত জাপানী অদৃশ্য রাজার উদ্দেশে তার অভিনন্দন জানিয়ে আসে। আধুনিক জাপানের অনেকে দেবতা মানে না, কিন্তু রাজা মানে। রাজার উপর এই দেবোচিত শ্রদ্ধা জাপানী চরিত্রের একটা মস্তবড় বিশেষত্ব!

প্রাচ্যের এই প্রকৃতিগত রাজভক্তির সঙ্গে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রবাদের সুশোভন সংমিশ্রণ করেছে এই জাপানীরা। তার পেছনে আছে তাদের প্রচণ্ড দেশাত্মবোধ, আর আছে তাদের অতি তীব্র আত্মসম্মানজ্ঞান। সে জ্ঞান এত তীব্র যে তার জন্য জাপানীরা 'হারিকিরি' বা আত্মহত্যা করাও গৌরবের মনে করে। এক কথায়, হ্যামলেটের সঙ্গে নেপোলিয়ানকে এক কড়ায় চাপিয়ে, তাতে টলষ্টয়ের ফোঁড়ন দিলে যে পদার্থটি তৈরী হয়—তাই জাপানী চরিত্র!

কিন্তু রাজনীতির কথা থাক্‌। রাজনীতির গবেষণা কর্‌তে আমি জাপান যাইনি। ইচ্ছা থাক্‌লে, আমাদের দেশেই সে আলোচনা কর্‌বার যথেষ্ট সুযোগ আছে। প্রবুদ্ধ ভারতে 'ইজ্‌ম্‌'-এর এখন আর অন্ত নাই। একদিন শুভ সুপ্রভাতে ভারতের যে-কোন দুর্ভাগ্য নাগরীড়িতের জন্য প্রাণটাকে কাঁদিয়ে তুল্‌তে পার্‌লেই নাম-যশের আর অভাব থাকে না—দুর্ভাগ্যের দুঃখ-বিমোচন যতটা হোক্‌ আর নাই হোক! অনাহারীর দুঃখের চেয়েও আমরা বড় ক'রে তুলেছি স্বল্পাহারীর দুর্গতিকে! তাই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা না বাড়িয়ে আমরা বেশী ঝুঁকে পড়েছি ট্রেড-ইউনিয়নের সংখ্যা বাড়াতে! জীবন-সংগ্রামের পদাতিক সৈন্যদের সন্তোষের সুধা পান না করিয়ে আমরা তাদের মাতাল করে তুল্‌তে চাই ধর্ম্মঘটের সুরা দিয়ে! সে জন্য জাপান যাওয়ার আবশ্যক ছিল না। গিয়েছিলাম দেখতে দেশটাকে, আর তার ছোট্ট বেঁটে মানুষগুলোকে!

শুনেছি, বেঁটে লোকগুলোই নাকি খুব চালাক হয়। কোন্‌ চালাকির বলে এই বেঁটে জাপানীরা সারা পৃথিবীকে তাক্‌ লাগিয়ে দিয়েছে, তার সন্ধান নেওয়ার বড় একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁদের সেই আধ-বোঁজা চোখের ভিতর কি এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লুকিয়ে আছে, যার প্রভাবে হঠাৎ তারা এমন বড় হয়ে উঠেছে, জানবার বড় আগ্রহ ছিল।

সেই আগ্রহ নিয়ে যখন জাপানে উপস্থিত হলাম, তখন

মার্চ্চের শেষাশেষি। তখনও সেখানে প্রচণ্ড শীত। তাপমান যন্ত্র ৩৮ ডিগ্রীতে নেমে ব'সে আছেন, গরম হওয়ার কোন লক্ষণই নাই। এক বন্ধু বল্‌লেন—জাপানের যন্ত্র কি না, এদের প্রকৃতিও জাপানীদের মত। সহজে এরা গরম হয় না।

হংকং থেকেই শীত সুরু হয়েছিল। আমাদের জাহাজে একজন হনলুলু-যাত্রী আমেরিকান ছিলেন সস্ত্রীক। হিটারের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্টতা কর্‌তে গিয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাঁর ট্রাউজার পুড়িয়ে ফেল্‌লেন। এই উপলক্ষে তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী পুরুষের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর এমন সব মন্তব্য প্রকাশ কর্‌লেন, যা এই নারী-প্রগতির যুগে সচরাচর আমরা যেখানে-সেখানে শুনে থাকি। তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই ছিল না। শুধু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম এই ভেবে যে, নারীদের যুক্তিগুলি কি এতই মামুলি! নতুবা সকল নারীর মুখ থেকে গোটা কয়েক বাঁধাবুলি ছাড়া আর নতুন কিছু কখনও শুন্‌তে পাওয়া যায় না কেন?

পথের পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। বল্‌তে বসেছি জাপানের কথা, পথের কথা নয়। অতএব কোথায় কোন্‌ বাঙালী কত যত্ন ক'রে আমাদের চুনা মাছের ঝোল খাইয়েছিলেন, কোন্‌ হিন্দুস্থানী হিন্দুস্থানের লোক দেখে আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়েছিলেন ডাল-রুটি খাইয়ে, কোন্‌ জাপানী কতবার আমাদের দুধ-চিনির বালাই-বর্জ্জিত চা পান করিয়েছিলেন—অকৃতজ্ঞ আখ্যা পাওয়ার ভয় থাক্‌লেও সে পরিচয় দেওয়ার আমি চেষ্টা কর্‌ব না। আমার আগে, অনেক মুগ্ধ অতিথি তা সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে ভাষার এবং আতিথ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেছেন।

জাপানের দর্শনীয় স্থানগুলির বিবরণ দিতেও আমি বিরত থাক্‌ব। জাহাজ কোম্পানিগুলি তা' সরবরাহ করে থাকে প্রত্যেক দ্রষ্টব্য এবং অদ্রষ্টব্য স্থানের তালিকা-সহিত। কিন্তু অনেকস্থলেই দেখা গিয়েছে—দ্রষ্টব্য বস্তু এতই সাধারণ, এতই অকিঞ্চিৎকর যে তা' দেখবার আনন্দের চেয়ে পরিশ্রম ও ট্যাক্সি ভাড়ার আপ্‌শোষটা মাত্রায় অনেক বেশী ব'লে মনে হয়।

প্রত্যেক প্রগতিশীল দেশই ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করবার জন্য বিজ্ঞাপনের বহর ছুটিয়েছে। সামান্য জিনিসটাকেও রং-ফলিয়ে তারা এমন অসামান্য ক'রে উপস্থিত করে যে, সকলেরই আগ্রহ হয় তা দেখ্‌তে। তাতে দেশের লাভের পরিমাণ বড় কম হয় না। তাই, সে-সব দেশে Tourist Industry ব'লে একটা জিনিস গড়ে' উঠেছে। তারা একে শিল্পপর্য্যায়ে স্থান দিয়েছে। আমাদের দেশে এ শিল্প নেই। অথচ আমাদের যা আছে, জগতের আর কোথায়ও তা নাই। কোথায়ও নাই তাজমহল, কোথায়ও নাই অজন্তা! কোথায়ও নাই দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস! কোথায়ও নাই মাদুরার তুঙ্গ মন্দির, ভুবনেশ্বরের স্থাপত্য! কোথায়ও নাই কাশ্মীরের কান্ত বনশ্রী, অথবা বিগলিত-হেমকান্তি কাঞ্চনজঙ্ঘা! অতীতের সমাধিস্তূপে সমাকীর্ণ ভারতভূমির মালমশলা আছে প্রচুর, নাই শুধু তা কাজে লাগাবার শিল্প-প্রতিষ্ঠান! ভ্রমণকারীকে আকর্ষণ কর্‌বার কোন বন্দোবস্তই আমাদের নাই। শুনেছি, কিছুদিন আগে আমেরিকায় এক টুরিস্ট আফিস খোলা হয়েছিল। কিন্তু সে পয়সা রোজগারের জন্য কি খরচের জন্য, সে খবর নিতে হ'লে রীতিমত নোটিস্‌ চাই—কেন না, অনেক দপ্তর ঘাট্‌তে হবে!

টুরিস্ট যারা এখানে আসেন, তাঁরা দেখ্‌তে আসেন আজব ভারত। আমাদের হিতৈষী বন্ধুরা অনেক আজগুবি গল্প এদেশ সম্বন্ধে তাঁদের শুনিয়েছেন। তাই তাঁরা দেখ্‌তে আসেন, এ দেশের লোক সাপ খায় কি ব্যাং খায়, এ মেয়েরা সন্তানের জননী হয় নয় বৎসরে কি সাত বৎসরে! এ দেশের দেব-মন্দিরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক'টা ক'রে নরবলি হয়! শুধু আজব ভারতই তাঁরা দেখে' যান—প্রকৃত ভারত দেখ্‌তে পান না।

ভারত সম্বন্ধে এই আজগুবি ধারণার সদ্ব্যবহার আমরা কর্‌তে পারিনি। সে সুযোগ আমরা হেলায় হারিয়েছি। সমস্ত ভারতজোড়া অতীতের যে সম্পদ আমাদের আছে, তাকে ঠিকমত টুরিস্টের সাম্‌নে উপস্থিত ক'রে এ শিল্পকে আমরা গড়ে' তুল্‌তে পারিনি। অথচ ভারতের যেখানে সেখানে যে সিঁদুরমাখা বটগাছগুলো আছে, তাদেরও দ্রষ্টব্য বস্তু ক'রে তোলা হয় ত আমাদের পক্ষে খুব অসম্ভব হ'ত না।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে জাপানের তুলনা নাই। প্রত্যেক সুন্দর জায়গাটিকে অতি বিচিত্ররূপে তারা বিদেশীর সাম্‌নে উপস্থিত করে। তারপর, ঋতুর আকর্ষণও তাদের চমৎকার।

তাদের চেরীফুলের কথা, ম্যাপেলের কথা, ক্রিসান্থিমামের কথা, যারা জাপান দেখেনি তাদেরও মুখে মুখে ফেরে!

এই চেরীফুলের বসন্তঋতু আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি জাপানে উপস্থিত হয়েছিলাম। জাপানের চেরীফুল নিয়ে গর্ব্ব কর্‌বার কারণ আছে। বাস্তবিক জাপানের এ একটা মস্ত বড় সম্পদ। জাপানের বৃক্ষ-সম্পদ খুব বেশী নাই। পাহাড়ের গায়ে ছোট-বড় পাইন গাছের সারি ছাড়া অন্য জাতীয় গাছের সংখ্যা জাপানে খুব কম। বাংলা-দেশের মত—"পথের দুধারে কত গাছ আর গাছে গাছে কত ফুল"—জাপানের নাই। তাই বৃক্ষবিরল জনস্থলীতে সযত্ন-রক্ষিত চেরিগাছগুলির নিষ্পত্র শাখা বিদীর্ণ করে' যখন ফুলগুলি ফুটে ওঠে, তখন সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। মনে হয় তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ফুলের সওগাত উপহার দেওয়ার জন্যই বুঝি সে তার পাতার ঝামেলাকে সযত্নে ঝেড়ে ফেলেছে—পাছে তার সম্পূর্ণতার এতটুকুও ব্যাঘাত হয়! মনে হয়, ওই বিশুষ্ক-প্রায় শাখাগুলির ভিতর কোথায় লুকিয়েছিল এত ফুলের সম্ভার! ছোট ছোট ফুলগুলি রাতারাতি সমস্ত গাছটাকে যেন হঠাৎ ছেয়ে ফেলে, আবার তেম্‌নি হঠাৎ-ই তার সমস্ত উপহার নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে একেবারে রিক্ত হয়ে যায়।

আমাদের দেশে চেরীফুল নাই। অথবা এমন আর কোনও ফুল নাই, যাকে চেরীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ছোট্ট সাদা ফুল—অনেকটা শিউলি ফুলের মত—কিন্তু তার পাঁপড়ির স্তবক আছে, যেমন থাকে বেল-ফুলের! তার মাঝে আছে ছোট ছোট কেশর, যা বেলফুলের নাই। কেশরের চারিপাশে আছে সুন্দর লাল্‌চে আভা—যা শিউলির নাই, বেলের নাই। আবার শিউলি-বেলের গন্ধ আছে, চেরীর তা নাই। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, যে ফুলের—"গন্ধ নাই কেহ তাকে করে না আদর!" আমাদের দেশে হ'লে কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু চেরীকে সকলেই ভালবাসে!

আমাদের দেশেও নিষ্পত্র গাছে ফুল ফোটে। কিন্তু চেরীর সৌন্দর্য্য শিমুল-পলাশে নাই। তারা যেন প্রকাণ্ড পালোয়ান, টেকো মাথায় লালফুলের জালি পরে দাঁড়িয়ে থাকে। কমনীয়তা না আছে তাদের দেহে, না আছে তাদের ফুলে! তারা যেন যাত্রাদলের গোঁফ-কামানো সখী, প্রাচ্যনৃত্যের কস্‌রৎ দেখাবার জন্য দখিন হাওয়ায় সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকে—না আছে তাদের শীলতা, না আছে সম্ভ্রম। কিন্তু চেরীফুলের পাতার ঘোম্‌টা না থাক্‌লেও, তার লাবণ্য আছে, কমনীয়তা আছে!

এক দেশের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আর এক দেশের সৌন্দর্য্যের তুলনা কর্‌তে যাওয়াই বোধ হয় ভুল—কি মানুষের, কি ফুলের! প্রত্যেক দেশের সৌন্দর্য্য তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সুন্দর হ'য়ে ওঠে। সাধারণ সূত্র দিয়ে বিচার কর্‌তে গেলে তার কোন্‌টির ভিতর কতখানি মিল পাওয়া যায়, তা বলা বড় শক্ত। সৌন্দর্য্যকে অস্ত্রোপচার করা চলে না। পৃথক্ ভাবে প্রতি অঙ্গে তার সন্ধান কর্‌তে গেলে হয় ত রূপ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য্য পাওয়া যায় না। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে রূপ, তার মানান-সই সম্মিলনই সৌন্দর্য্য। দেশভেদে তার প্রকার-ভেদ হ'তে পারে, কিন্তু প্রকৃতি-ভেদ হয় না।

কিন্তু সৌন্দর্য্যতত্ত্বের গবেষণার ভার বিশেষজ্ঞদের উপরেই থাকুক। আমরা জাপানের যে সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে এসেছি—তা চেরী নয়, ম্যাপেল নয়, ক্রিসান্থিমাম নয়। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশ বা বিনাশ নাই। যুগ-যুগান্তর ধরে' সে সৌন্দর্য্য জাপানে গিরিদরী-সাগরে, তার স্বচ্ছতোয়া সরোবরে, তার নীলাম্বু-পরিসরে, তার গগনচুম্বী তরুবিতানে, কলনাদিনী স্রোতস্বিনীতে চিরন্তন হয়ে আছে! সে সৌন্দর্য্য অনাদিকালের সংস্কার নিয়ে তার ভদ্র, নম্র, ভাবপ্রবণ, রূপবিলাসী, সৌন্দর্য্য-পিয়াসী জনগণের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনে ভাস্বর হয়ে আছে। সে সৌন্দর্য্য বিকশিত হ'য়ে আছে প্রোদ্ভিন্ন স্থলকমলের মত তার শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে, কলাবিদ্যায়—তার জীবন-যাত্রার প্রতিপাদক্ষেপে, তার জীবন-নাটকের প্রতি অঙ্কে-গর্ভাঙ্কে! তার উৎসাহে, তার নিষ্ঠায়, তার শ্রমে, তার কর্ম্মে, সেই সৌন্দর্য্যরসের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি! আমরা পান কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব সেই রস—

"মানব-জীবন-রসে যত আছে স্বাদ
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হ'তে
আনন্দ-মদিরা-ধারা নব নব স্রোতে!"

জাপানের বর্ত্তমান আব্-হাওয়ায় সে আনন্দ-রসধারা-পানের কতখানি সুযোগ পাওয়া যাবে, সে সম্বন্ধে বড় সন্দেহ ছিল। আশঙ্কা ছিল, ব্রিটিশ-ভারতের কালা-আদ্‌মি আমরা, সাধারণত পাশ্চাত্য দেশে যে সৌজন্যের পরিচয় পেয়ে থাকি, নব-অভ্যুদয়ের নেশায় মত্ত জাপানের কাছে হয় ত পাওয়া যাবে তারই একটা রাজ-সংস্করণ! হয় ত বা আনন্দের সুধা পান কর্‌তে গিয়ে এই পীত জাতির কাছ থেকে অপমানের বিষ পান ক'রে ফিরে আস্‌তে হবে। কিন্তু সে ভুল ভাঙ্‌তে বেশীক্ষণ লাগেনি।

জাপানের লোক ভারতকে মনে কর্‌ত দেবভূমি। ভগবান বুদ্ধের দেশকে তারা শ্রদ্ধা কর্‌ত, সম্মান কর্‌ত। আধুনিক জাপানের কথা বল্‌ছি না—যে যুগে জাপান খৃষ্টান পাদরীদের তার ত্রিসীমানায় ঢুক্‌তে দেয়নি সেই যুগের কথা বল্‌ছি। আধুনিক জাপান দেবতাকে জীবনে বড়-একটা আসন না দেওয়ার চেষ্টায় আছে। সুতরাং দেবভূমির নাম কর্‌লে দু হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকানো তার কাছ থেকে আর আশা করা যায় না। আমরা তবুও, আমাদের স্বর্গকে সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে রেখে, এখনও তার উদ্দেশে কল্পনার ধূনো জালিয়ে রেখেছি! কিন্তু জাপান বাস্তব চোখে তার তেজাকু বা স্বর্গ থেকে ভারতের যে দুর্গতি দেখ্‌তে পাচ্ছে, তাতে প্রত্নতাত্ত্বিকের খনন-খাতের ভিতর তার শ্রদ্ধা যদি বিকৃত অঙ্গ নিয়ে গবেষণার বস্তু হয়ে পড়ে থাকে, তাতে দুঃখ কর্‌বার কিছুই নেই।

আধুনিক জাপানের বাপ-ঠাকুর্দ্দারা যে ভারতকে শ্রদ্ধা কর্‌ত, সে বৌদ্ধ-ভারত; যে ভারত দেশ-দেশান্তরে তার ধর্ম্মের, তার কৃষ্টির, তার সংস্কৃতির শুভ্র বৈজয়ন্তী উড়িয়ে-ছিল; যে ভারত সারা দুনিয়ার সাম্‌নে ধরেছিল সভ্যতার পঞ্চ-প্রদীপ! সেই মহিমান্বিত ভারতকে তারা জানে। আজও তাকে মনে মনে তারা শ্রদ্ধা করে। তারা জানে, ভারত ছিল কালিদাসের যক্ষপুরীর মতই সুন্দর। তার ছিল ভ্রমর-মুখর নিত্য-পুষ্প পাদপ-শ্রেণী, মরাল-মেখলা নিত্য-কমল নীল-সরোবর! তার ছিল "নিত্য-জ্যোৎস্না-প্রতিহত-রূঢ় বৃক্তি-রম্যা প্রদোষাঃ।" এখন সে ভারত আর নাই! তার পাদপ আছে, পুষ্প নাই! সরোবর আছে, মরাল নাই, জ্যোৎস্না আছে, রমণীয়তা নাই! তার স্মৃতি আছে, সংস্কৃতি নাই। তার বিগত গৌরবের বিকৃত মূর্ত্তি শুধু জিয়োনো আছে যাদুঘরে! কিন্তু জাপানের সে সংস্কার এখনও যায় নি। তাদের বংশধরেরা ভারতে এলে, ভগবান্ বুদ্ধের দেশে যাচ্ছে বলে' তারা গৌরব অনুভব করে। কিন্তু বিগত-বৈভব ইণ্ডিয়াকে জাপান সে শ্রদ্ধা দেখাবার কোন কারণ খুঁজে পায় না।

জাপান ইণ্ডিয়াকে জান্‌ত না—জান্‌ত হিন্দুস্থানকে। যে দুর্ভাগ্যের ফলে হিন্দুস্থান ইণ্ডিয়ায় পরিণত হয়েছে, সেই দুর্ভাগ্যই তাদের শ্রদ্ধাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে অবশেষ রেখেছে মাত্র কৌতূহল। তাই আধুনিক জাপানের ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে যতখানি আছে কৌতূহল, ততখানি নেই শ্রদ্ধা! আর এই কৌতূহলটুকু অবশিষ্ট আছে বলেই, শ্রদ্ধার অভাব এখনও ঠিক অশ্রদ্ধাকে জাগিয়ে তুল্‌তে পারে নি। অতীত সম্পদের তক্‌মা দেখে, এখনও তারা ধূলোয় আমাদের আসন পেতে দেয়নি।

জানি না, কোন্ অশুভ দিনে হিন্দুস্থান ইণ্ডিয়ায় পরিণত হয়েছিল। কার দুষ্কৃতির ফলে সর্ব্বহারা দেশের একমাত্র শেষ সম্বল, তার বিগত বৈভবের একমাত্র নিদর্শন, তার লুপ্ত ইতিহাসের একমাত্র স্মৃতি, দেশের নামগুলো পর্য্যন্ত এমনভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছে! রাজনৈতিক পরাধীনতায় দেশের তত সর্ব্বনাশ হয় না, যত হয় সংস্কৃতির ধ্বংস-সাধনে। ভারতের সমৃদ্ধ অতীতকে ভোলাবার এ প্রচেষ্টা কার দ্বারা হয়েছিল, জানি না। এ কি ক্ষমতাশালী বিদেশীর পর-ভাষা উচ্চারণের অক্ষমতা, না বিজিত দেশকে সর্ব্বপ্রকারে আত্মবিস্মৃত করবার এ একটা অতি হীন পরিকল্পনা—যেমন হিট্‌লার বর্ত্তমানে কর্‌ছে চেকোশ্লোভাকিয়ায়!

যে জাতি বার্চগার্ডেন উচ্চারণ কর্‌তে পারে, কাম্‌স্কাট্‌কা, মাসাসিচিউট, ভ্লাডিভাষ্টক্ উচ্চারণ কর্‌তে যাদের জিহ্বায় এতটুকু জড়তা আসে না, তারা যে হিন্দুস্থান উচ্চারণ কর্‌তে না পেরে তাকে ইণ্ডিয়া বানিয়ে সহজ করে নিয়েছে, বারাণসীর রস নিংড়ে তাকে বেনারস করে ভুলেছে, হরিদ্বারকে হার্ডোয়ার-এ পরিণত করেছে, কালিঘাটকে ক্যালকাটায় পর্য্যবসিত করেছে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ বিজয়নগরম্-এর চেয়ে ভিজিয়ানাগ্রাম উচ্চারণ করা সহজ নয় এবং বিশাখা-পত্তনকে ভিজাগাপট্টম্ বলায় আর যাই থাকুক্, উচ্চারণ-অক্ষমতা যে নাই একথা জোর ক'রে বলা চলে।

অথচ বিশাখাপত্তন এখন ভাইজাগ-এ (Vizag) পরিণত হয়েছে।

শুধু বিদেশীর উপর দোষ চাপান চলে না, আমাদের হীন অনুকরণ-প্রিয়তাও তার জন্য কম দায়ী নয়। যে মনোবৃত্তি নিয়ে আমরা আমাদের সন্তানের নাম বেবী রাখি, মেয়েদের ডলি বলে ডাকি, নিজেদের বংশগত পদবীগুলোকেও বদ্‌লে ভোঁস্, গ্যাংলি, মুখার্জ্জি করে ছেড়েছি বা সেই মনোবৃত্তিই রাতারাতি ভারতকে বিলেত ক'রে তুল্‌তে চেয়েছিল—তার পৌরাণিক নাম, তার পিতৃপিতামহের পদবী বদ্‌লে ফেলে! এত বড় দুর্ভাগ্য আর কোন দেশের হয়নি। অনেক দেশই তার স্বাধীনতা হারিয়েছে, কিন্তু নাম হারায় নি। আমরা রাস্তার নাম সানি পার্ক, ম্যাণ্ডে-ভাইল গার্ডেন, ডোভার পার্ক রাখতে সুরু করেছি, বাড়ীর নাম আলয়-নিলয় ছেড়ে কোর্ট-ম্যানসান করে ফেলেছি—এখনও যে কালিঘাটকে ক্যাল্-সায়ার ক'রে তুলিনি, সেজন্য আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

জাপানও পাশ্চাত্যের অনুকরণ করেছে অনেকখানি, কিন্তু নিজের সত্তাকে সে এমন ক'রে জবাই কর্‌বার চেষ্টা করে নি। পাশ্চাত্যকে সে তার নিজের ছাঁচে ঢেলেছে, নিজেকে পাশ্চাত্যের ছাঁচে ঢেলে দেয় নি। ইউরোপীয় পোষাক তারা গ্রহণ করেছে—কায়দার জন্য নয়, কাজের জন্য। জাপানীরা এফিসিয়েন্সি বা কর্ম্মপটুতাকে বড় বেশী গণনা করে। সেই কর্ম্মপটুতার খাতিরে তারা তাদের অনেক কিছুই বদ্‌লে ফেলেছে। তাদের পোষাকের পরিবর্ত্তনও সেই কর্ম্মপটুতার প্রয়োজনে। আল্‌খেল্লার মত লম্বা ঝুলের কিমনো (kimno) প'রে মিলের কলকব্জার ভিতর চলাফেরা কর্‌তে, আপিসে ছুটোছুটি কর্‌তে সুবিধা হয় না বলেই, সে ক্ষেত্রে তারা তা বর্জ্জন কর্‌তে যেমন এতটুকু গতানুগতিকতা দেখায় নি, তেম্‌নি নিজের ঘরে গিয়ে তাদের আদরের কিমনোকে জড়িয়ে নিয়ে আরামের নিঃশ্বাস ফেল্‌তে তারা একটুও অসুবিধা বোধ করে না। ঘরে-বাইরে তারা সাহেব সাজে না। ঘরে তারা পুরোদস্তুর জাপানী, বাইরে তারা পুরোদস্তুর সাহেব। এ যেন তাদের ভিখ্-মাঙার ভেক—তাদের অভিনয় কর্‌বার সাজ-পোষাক। তাই, তাদের সাহেবী-পণা আছে, কিন্তু সাহেবী-আনা নেই।

কোট-প্যাণ্ট তাদের সাহেবী অহমিকাকে জাগিয়ে তুল্‌তে পারে নি। তাদের চোখের চাহনি, কথা বল্‌বার ভঙ্গী, চল্‌বার কায়দা, এমন কি মেজাজ পর্য্যন্ত বদ্‌লে দিয়ে, তাদের মনে উৎকট সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স-এর সৃষ্টি কর্‌তে পারেনি। সাহেবী পোষাক পরেও তারা দিব্যি পা মুড়ে' বসে, প্যাণ্টের ভাঁজ নষ্ট হওয়ার দুশ্চিন্তা না করেই! দেব-মন্দিরে গিয়ে তারা জুতো খুলেই মন্দিরে প্রবেশ করে, জুতো খোলার ভয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে না। দেবতার চেয়ে জুতোকে তারা বড় সম্মান দেয় না। জাপানীদের ম্যাটিং-পাতা ঘরে চেয়ার-টেবিলের বালাই নাই, কাজেই কারও বাড়ীতে গেলে তাদের জুতো খুলেই ঘরে ঢুক্‌তে হয়। তাতে তারা এতটুকুও অমর্য্যাদা বোধ করে না। তাই জাপানীদের কোটের পকেট হাত্‌ড়ালে একটা ক'রে শু-হর্ন পাওয়া যায়, এ খবর বোধ হয় অনেকেরই জানা নেই!

অনেকেই বোধ হয় জানেন না, জাপানে পাশ্চাত্য এটিকেট্ বা আদব-কায়দা ঠিক কলা-বিদ্যা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। তার জন্য রীতিমত স্কুল আছে। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তারা তা শিক্ষা করে—কোথায়ও এতটুকু ভুলচুক থাকে না। দিনের বিভিন্ন সময়ে পোষাকের পরিবর্ত্তন থেকে সুরু ক'রে দাঁত খোঁটার খড়্‌কে-কাঠিটি ব্যবহারের কায়দা পর্য্যন্ত তারা এমনভাবে দোরস্ত করে যে উৎকট রীতি-প্রিয়তার আপশোষ কর্‌বার কিছুই থাকে না। কিন্তু সে-সব শিক্ষা শুধু দরকার মত কাজে লাগাবার জন্য। তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই।

নারীদের ভিতরেও পাশ্চাত্যের অনুকরণ কিছু কম হয় নি। শর্ট স্কার্ট ও বব্-হেয়ার ক্রমশই জাপানে পসার জমিয়ে তুল্‌ছে। অবশ্য তারা এর স্বপক্ষে কর্ম্মপটুতার কৈফিয়ৎ দিয়ে থাকে। হয় ত তার ভিতরে কিছু সত্যও আছে। সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে-রাখা কিমনো এবং পেটে জোর-ক'রে-বাঁধা ওবি (obi) নিয়ে ঘরের কাজ করা চলে, বাইরের কাজ চলে না, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। জাপানী মেয়েদের চুল বাঁধার যে প্রথা, তাদের খোঁপার যে ধরণ সারা বিশ্বের গল্পের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাতে যে সময়ের অনেকখানি অপব্যয় হ'তো এবং

বর্ত্তমানের সর্ব্বক্ষেত্রে কর্ম্মনিরত জাপানী মেয়েরা যে ততখানি সময়ের অপব্যবহার কর্‌তে পারে না, সে কথাও স্বীকার করি। আমি দেখেছি, মেয়েরা আপিসে এসে কিমনো ছেড়ে স্কার্ট পরে, আবার কর্ম্মান্তে আফিসেই স্কার্ট ছেড়ে রেখে দিয়ে তারা কিমনো প'রে বেরিয়ে যায়। কিন্তু স্কার্ট-কিমনোর বিচারই শেষ বিচার নয়। তাদের জীবনের অন্য ক্ষেত্রে যা লক্ষ্য করেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে যেন পুরুষের চেয়ে নারীদের উপরই অত্যুগ্র আধুনিকতা বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। আধুনিক সভ্যতার ভিতর মণীষী কার্লাইলের সূক্ষ্ম দৃষ্টি যে hydra-headed serpent দেখেছিল, সেই সহস্রশীর্ষ বিষধরের বিচিত্র ফণা জাপানের উপরেও উদ্যত হয়েছে। এখনও জাপানের নারী তার প্রাচ্য প্রকৃতিকে বদ্‌লাতে পারে নি। শিষ্টতায়, শালীনতায়, সেবায়, আন্তরিকতায়, প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য এখনও তার পুরো-মাত্রায় বজায় আছে। জানি না, আর দশ বৎসর পরে কি হবে। উগ্র-আধুনিকতার তীব্র বিষক্রিয়া কত দিনে তাদের এই প্রশান্ত প্রকৃতিকে বিষাক্ত ক'রে তুল্‌বে, অথবা আদবেই কর্‌বে কি-না—ভবিষ্যতই সে প্রশ্নের উত্তর দেবে। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মতই জাপানেও সভ্যতার প্রদীপের নীচে অতি গাঢ় অন্ধকার জমা হয়ে আছে। সে অন্ধকারে দৃষ্টি দিয়ে নালা-নর্দ্দামার সন্ধান ক'রে ড্রেন-ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট লেখ্‌বার প্রবৃত্তি আমার নেই।

অপরের অনুকরণে সাধারণত এই একটা মস্ত দোষ থাকে যে অনুকৃতের দোষ-ত্রুটি সমস্তই অনুকারীর ভিতরে এসে পড়ে। জাপানের তা আসেনি। কারণ জাপান aping করে না—নিজের আব্‌হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে তার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন ক'রে তারা তা গ্রহণ করে এবং করেও খুব তাড়াতাড়ি। কোন দেশে নতুন কিছু প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান তাকে নিজের মত ক'রে নেয়, একটুও পিছিয়ে পড়ে না। সাধারণত এক দেশে কোন কিছু একেবারে পুরানো হয়ে যখন বর্জ্জিত হয়, তখন অন্য দেশে তার অনুকরণ হয় বিপুল উদ্যমে। তাই, সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে তার চারি পাশে যত আবর্জ্জনা জড় হয়, তার হাত থেকে অনুকারী রেহাই পায় না। শুধু বিভিন্ন দেশে কেন, একই দেশে, শহরে যা পুরানো পরিত্যক্ত হয়, পল্লীগ্রাম তা অতি উৎসাহে গ্রহণ করে আধুনিক সাজ্‌তে। যেমন কম্‌ফর্টার। শহরে যখন সে পুরানো হয়ে গেল, পল্লীগ্রামে গিয়ে সে তখন আপ্-টু-ডেট্ বাবুদের মাথায় মাথায় জড়িয়ে রইল আধুনিক ফ্যাসানের ধ্বজা হ'য়ে। জাপান বিদেশের অনুকরণ কর্‌লেও যেমন তার সঙ্গে সমান তালে চল্‌তে পারে—আমরা তেম্‌নি তার অনেক পিছনে প'ড়ে থাকি, এই কম্‌ফর্টারি সভ্যতার গর্ব্ব নিয়ে!

পাশ্চাত্যের সঙ্গে সমান তালে চল্‌তে গিয়ে জাপানকে তার অনেক কিছুরই পরিবর্ত্তন কর্‌তে হয়েছে! শুধু বদ্‌লায় নি তার ভদ্রতা, নম্রতা—বদ্‌লায় নি তার সম্মান-বোধ, তার আতিথেয়তা। অতিথিকে জাপানীরা বড় যত্ন করে, বড় আদর করে। আমাদের দেশে একদিন যেমন ছিল—"সর্ব্বত্রোঽভ্যাগতো গুরুঃ।" জাপানে আজও তা আছে। গুরুর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা হারিয়েছি, অতিথিকেও আর আমল দিতে চাই না। অতিথিকে সৎকার কর্‌তে হয় ত রাজি আছি—তবে গৃহে নয়, অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে। জাপান কিন্তু অতিথিকে তেম্‌নি সমাদর করে—সাহেবী-আনা শেখার আগে আমরা যেমন কর্‌তুম আমাদের গুরুকে!

আত্মসম্মানবোধ আছে বলেই জাপানীরা অপরকেও সম্মান দিতে পারে। কটু কথা, কড়া ব্যবহার জাপানীদের কাছ থেকে কখনই পাওয়া যায় না। উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাক্‌লেও তারা তাদের ভদ্রতা ভোলে না। অপরের সহিত ব্যবহারে তারা অতি সতর্ক, অতি সাবধানী—পাছে তাদের কোন কথায়, কোন কাজে, কেউ বিন্দুমাত্র আঘাত পায়। অপরের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে এত বড় সচেতন বোধ হয় জগতের আর কোন জাতি নাই। অপরকে আহত করাই তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন ব'লে মনে করে না।

অনেকের কাছে তাদের এই ভদ্রতা ও নম্রতা যেন একটু অতিরিক্ত বলেই মনে হবে। তাতে মিষ্টতা হয় ত পাওয়া যেত না, যদি না তার সঙ্গে থাক্‌ত প্রবল আন্তরিকতা। আমরা যেমন বজ্রাসনে কখনও কখনও বসে থাকি, জাপানীদের সাধারণত সেইভাবে বসাই নিয়ম। আধুনিক পুরুষেরা কখনও কখনও তার ব্যত্যয় কর্‌লেও, নারীরা পুরাদস্তুরই তা মেনে চলে। এমন কি, এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে হ'লে মেয়েদের বজ্রাসনে বসে' দরজা খুলে, দাঁড়িয়ে উঠে ও-ঘরে গিয়ে, আবার বজ্রাসনে বসে' দরজা বন্ধ কর্‌তে

হয় অতি ধীরে ধীরে। ব্যস্ততা প্রকাশ পেলে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে ধীরতার অভাব হ'লে অভদ্রতা বলে' গণ্য হয়। আগন্তুকের সাম্‌নে বজ্রাসনে বসে' নীচু হয়ে মেয়েরা যখন অভিবাদন করে, তখন অনেকটা আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের মত দেখায়। তাদের সেবার সতর্ক সমারোহ অতিথি অনেক সময় যেন বিব্রতই ক'রে তোলে।

একটা দিনের কথা বল্‌ব। আতিথেয়তা কেমন ক'রে যে জাপানের অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে তারই একটা ছোট্ট উদাহরণ। আরাসিয়ামা ব'লে একটা জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। ছুটীর দিন। ছুটীর দিনে জাপানীরা বেড়াতে বেরোয় সপরিবারে। আমাদের মত একটা পাহাড় দেখ্‌তে হ'লে তাদের পাঁচশ' মাইল ছুট্‌তে হয় না। সহর থেকে পাঁচ-দশ মাইল গেলেই একটা না একটা সুন্দর জায়গা পাওয়া যায়, যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মনোমুগ্ধকর। কোথায়ও নীল জলরাশি বালুকা-বেলায় ঢেউয়ে-ঢেউয়ে উপঢৌকন দিয়ে যাচ্ছে নানা বর্ণের মীনমিথুন, কোথায়ও বা দুধারে সু-উচ্চ পাহাড়ের সঙ্কীর্ণতার মাঝখান দিয়ে খরস্রোতা নদী তীব্র গতিতে নেমে এসে হঠাৎ সমতল ভূমির মুক্ত পরিসরে দিশেহারা হয়ে পড়েছে—ছড়িয়ে গেছে, গুলিয়ে গেছে তার উদ্দাম চঞ্চলতা! কোথায়ও বা উষ্ণ প্রস্রবণ অবিশ্রান্ত ঢেলে দিচ্ছে তার দ্রবীভূত অন্তর্জ্বালা—শাদা শাদা ফুল্‌কির ফুল-ঝুরির মত। এমনই কোন একটা মনোরম স্থানে ছুটীর দিনে তারা সারাদিন বনভোজন, খেলাধূলা আমোদ-আহ্লাদ করে কাটিয়ে দেয়। সে-দিনও তেমনি শত শত নর-নারী গিয়েছিল তাদের কর্ম্মক্লান্ত জীবনে একটুখানি বৈচিত্র্যের সন্ধানে!

ফের্‌বার সময় ট্রেনে ছিল ভয়ানক ভিড়—এমন কি, দাঁড়াবার পর্য্যন্ত স্থানাভাব। তারই একটা গাড়ীতে যখন কোনরকমে উঠে পড়্‌লাম, সাম্‌নের দু'খানা বেঞ্চি থেকে পাঁচ ছয় জন নরনারী একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বস্‌বার জন্য আমন্ত্রণ করলে—এবং আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমাকে না বসিয়ে ছাড়্‌লে না, কারণ আমি বিদেশী, জাপানের অতিথি।

আসন গ্রহণ ক'রে তাদের সঙ্গে আলাপ করছি, এমন সময় পেছনের বেঞ্চি থেকে একখানা ছোট্ট হাত আমার সাম্‌নে প্রসারিত হ'ল—সেই হাতে ছোট কাগজের রেকাবির উপর কয়েকখানা বিস্কুট ও চকলেট। চমকিত হয়ে পেছন ফিরে দেখি, একটি ন-দশ বছরের বালিকা রেকাবি হাতে ক'রে আমার দিকে চেয়ে আছে। মুখে তার মৃদু মৃদু হাসি। তার পাশে ও পেছনে আরও অনেকগুলো মেয়ে সকৌতুকে আমার দিকে চেয়ে আছে। তাদের সামান্য উপহার গ্রহণ করবার জন্য তারা আমায় অনুরোধ জানালে। ধন্যবাদ জানিয়ে রেকাবিটি গ্রহণ করতে তাদের চোখে-মুখে যে আনন্দ ফুটে উঠ্‌ল, তা অপূর্ব্ব! জিজ্ঞাসা করলাম—এর কারণ কি? একটি মেয়ে অতি নম্রভাবে জবাব দিলে—"বিদেশীকে অভ্যর্থনা করবার আর কোন সুযোগ আমরা পাব না ব'লে ট্রেনেই সে সুযোগ আমরা গ্রহণ করলাম।" জানি না, জগতের আর কোন দেশে এর তুলনা পাওয়া যায় কি না? এ সমাদর সেলামী নয়, গড়াপেটা নয়, কোন রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে এর যোগ নেই—এ শুধু সরল হৃদয়ের পরিপূর্ণ আন্তরিকতার অভিব্যক্তি। সে অভিব্যক্তি সেইখানেই স্ফুরিত হয়, যেখানে আছে হৃদয়ের যোগ, ধ্যান ও ধারণার মিল, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ—যেখানে ফন্দি-মতলবের স্থান নেই, ঘাত-প্রতিঘাতের আশঙ্কা নেই। তাই যে সাদর দিতে পারে তারা প্রাচ্যের অতিথিকে, দিতে পারে না তা পাশ্চাত্যের সন্ধানীকে!

তথাপি মনে যা-ই থাকুক, সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাদের ভদ্রতাকে কখনও আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে না। অনেক ইউরোপীয় বন্ধুর সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু জাপানীদের সদ্ব্যবহারের সুখ্যাতি সকলেই করেছে শত মুখে। মনে যা-ই থাকুক্, বাইরের ব্যবহারে তাদের সহিষ্ণুতা অপরিসীম।

কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজে, কি ধর্ম্মে, জাপানীদের সহিষ্ণুতার তুলনা নেই। অপরের সুখ-সুবিধার খাতিরে নিজেরা অনেক কিছুই সহ্য করতে পারে। অপরের মতামতকে তারা যেমন উপযুক্ত সম্মান দিতে জানে, অন্যের ধর্ম্মমতকেও তারা তেমনি শ্রদ্ধা করতে পারে। ব্যক্তিগত মতের অমিল হ'লে তাদের ভিতর যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বেধে যায় না, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতরেও তেমনি কোন উগ্র অসহিষ্ণুতার নিদর্শন পাওয়া যায় না। জাপানের ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রধানত তিনটি। জাপানের আদি ধর্ম্ম সিন্টো

(Shinotism) হ'লেও বৌদ্ধের সংখ্যাই সেখানে বেশী। ক্রিশ্চিয়ানও কিছু আছে, দু-দশজন মুসলমানও পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধদের কর্ণ-বধিরকারী ঢক্কা-নিনাদে ক্রিশ্চিয়ান বা মুসলমানদের উপাসনার ব্যাঘাত হয় না, অথবা ঢাক ভাঙ্‌তে গিয়ে মাথা ভাঙ্গে না।

জগতে ধর্ম্মমত-সহিষ্ণুতার উদাহরণ নাই বলাই চলে। ইউরোপে এ প্রশ্ন ওঠে না, কেন না সেখানকার অধিকাংশ লোকই ক্রিশ্চিয়ান। তবুও প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকেরা ভাই ভাই এক ঠাঁই হয়ে বাস করেনি। দু-চার জন ইহুদি যারা আছে, স্বয়ং খৃষ্ট তাদের যতখানি সহ্য করেছিলেন, তাঁর উপাসকেরা তা যে করেন না, খবরের কাগজের পাতা খুল্‌লেই তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। নিকট-প্রাচ্যে মুসলমানেরই একাধিপত্য, কাজেই সেখানে ধর্ম্মদ্বন্দ্বের কোন কারণই উপস্থিত হয় না। একমাত্র প্যালেষ্টাইনে কিছু ইহুদি আছে, তাদের রক্তাক্ত কাহিনী নতুন ক'রে বল্‌বার দরকার করে না।

ভারতের মত এত বিভিন্ন ধর্ম্মমত আর কোন দেশে নাই। আর এত বিভিন্ন সমস্যাও আর কোন দেশে উপস্থিত হয় না। ভারতের ধর্ম্ম-সহিষ্ণুতার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় রঞ্জিত হয়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, জাপানে এতগুলি ধর্ম্মমত থাকা সত্ত্বেও, ধর্ম্ম এখনও তাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নি। এক ধর্ম্মের লোক অন্য ধর্ম্মকে যথোচিত শ্রদ্ধা করে বলেই তা হয়নি। ধর্ম্মকে তারা ব্যক্তিগত অধিকার ব'লে জানে বলেই তা হয়নি। সে অধিকারকে তারা সমষ্টিগত জীবনের উপর উৎপাত করতে দেয়নি বলেই তা হয়নি। অন্ন-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যার মত ধর্ম্মকে তারা সমস্যা করে তোলেনি।

আমি দেখেছি, বৌদ্ধ-মন্দিরের সম্মুখ দিয়ে যেতে ক্রিশ্চিয়ানেরা পর্য্যন্ত মাথার টুপী খুলে বুদ্ধমূর্ত্তিকে অভিবাদন ক'রে যায়, অথচ পৌত্তলিকতার কলঙ্ক-কালিমায় তারা একেবারেই কলঙ্কিত হয় না। বৌদ্ধ-সিন্টোদেরও দেখেছি গীর্জ্জার সাম্‌নে মাথা নত করতে, অথচ তাদের ম্লেচ্ছ বলে' জাতিচ্যুত হওয়ার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। পরধর্ম্ম-সম্পর্কে এই বিচিত্র সহিষ্ণুতা জাপানী চরিত্রকে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছে।

তার চেয়েও বড় বিশেষত্ব জাপানীদের কাব্যপ্রিয়তা। তাদের কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই শিল্পী সকলেই অল্পবিস্তর কবি। চিত্রাঙ্কন তাদের একটা খেয়ালের মত, তাদের আবাল্যের একটা প্রিয় অভ্যাস। প্রায় সকল জাপানীরই একটা ক'রে ক্যামেরা আছে এবং এমন কোন গৃহস্থ নেই যার ঘরে দু-চারটে ছবির এলবাম্ নেই। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই বাড়ীর সঙ্গে একটি করে ছোট বাগান তারা সযত্নে সাজিয়ে রাখে। আশ্চর্য্য এই, এতবড় কাব্যানুরাগী জাতি কি ক'রে শিল্পে-বাণিজ্যে এতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পার্‌লে। তাদের ঘরে, তাদের বাইরে, তাদের বেশভূষায়, এমন কি তাদের অক্ষরগুলিতে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় সৌন্দর্য্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

জাপানের লিখন-পদ্ধতির একটু বৈচিত্র্য আছে। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি লেখে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে। আর্‌বী পারশী বা উর্দ্দু ভাষার নিয়ম ডাইনে থেকে বাঁয়ে লেখা। কিন্তু জাপানীরা বাঁ থেকে ডাইনে যেমন লেখে, ডাইনে থেকে বাঁয়ে লেখে তার চেয়ে বেশী—এবং সাধারণত তারা লেখে উপর থেকে নীচের দিকে। ছোট বড় লাইনগুলি তারা সাজিয়ে যায়। দেখ্‌লে মনে হয়—ঠিক যেন ফুলভরা বনলতার ঝুরি নেমেছে!

তাদের অক্ষরগুলিও যেন এক-একটি ছবি। তুলি দিয়ে তারা সে ছবি আঁকে—কলম দিয়ে নয়। আগেকার দিনে কলমের ব্যবহারই ছিল না। এখনও তুলি দিয়ে লেখার প্রথা তাদের প্রচলিত আছে। তবে, সে কেবল কোন পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানের উপলক্ষে। যেমন এখনও আমরা সময়-সময় তুলোট কাগজের ব্যবহার ক'রে থাকি। কালিও তাদের আলাদা। পুরাকালে আমাদের দেশে যেমন চাল পুড়িয়ে কালি তৈরী হ'ত, এও চাল পুড়িয়ে তৈরী হয়। নিমন্ত্রিত হ'য়ে অনেক জায়গায় আমাকে অটোগ্রাফ দিতে হয়েছে। সেই তুলি ও চাল-পোড়ানো কালির সাহায্যে ব্লটিংয়ের মত চুপ্‌শে-নেওয়া মোটা কাগজের উপর ইংরেজী ও বাংলা হরপে আমার নামের যে চিত্র আমি এঁকে এসেছি, ফটোগ্রাফ নেওয়ার সুযোগ হয় নি বলেই তার নমুনা আপনাদের দেখাতে পারলুম না। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'লে হয় ত কোন দিন কোন আর্ট-এক্‌জিবিসনে তার সৌন্দর্য্য দেখে আপনারা মুগ্ধ হ'তে পারবেন।

ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

৩৪

কাশী গয়া করিয়া, ভাগীরথীকূললগ্ন মহাপীঠ কালীঘাটেও কিছুকাল তীর্থ-বাসে থাকিয়া, পাপরিক্তা ও পুণ্যসঞ্চিতা বিন্দী দেশে ফিরিল এবং ফিরিয়াই দেশবাসিনী নারীবৃন্দকে উপঢৌকন দিল লতার সব গুহ্য-কথামৃত-রস এবং নারীরাও আগ্রহে তাহা পান করিল, উদ্গীরণ করিয়া সর্ব্বত্র ছড়াইল ; রটন্তী যে পুত্রের উপনয়নে সকলকে অমন জব্দ করিয়া ছিলেন সুদে আসলে তাহার ঝাল তুলিয়া লইতে লাগিল।

বিন্দী হারামজাদী কোথা হইতে কি একটা উড়ো খবর লইয়া কিম্বা কার কি মতলবে মনে গড়িয়া একটা কুৎসা আনিয়া রটাইয়াছে তাহাও আবার কাহারও কানে তুলিতে আছে? মাগী আবার গরব করে, কত পুণ্য করিয়া আসিয়াছে!—ঝ্যাটা মার ওর পুণ্যের মুখে! কেহ কেহ পাল্টা জবাব দিল, কলিকাতায় ঐ চৌধুরীদের বাড়ী কি লতির মনিববাড়ী গিয়া একটা খবর লইলেই বুঝা যাইবে, বিন্দী আসিয়া সত্য কি মিথ্যা বলিয়াছে। এম্‌নি যেমনই হউক, বিন্দী অমন কাঁচা মেয়ে নয়। চৌধুরীদের বাড়ীতেই ত ছিল, লতার মনিববাড়ীতেও আনাগোনা করিত ; সব জানিয়া শুনিয়া আসিয়াই বলিয়াছে। তা যাক্ না, কলিকাতা ত ন'মাস ছ'মাসের পথ নয়, তার মামা একবার গিয়া জানিয়াই আসুক না. তার ভাগ্নী কোথায় চাকরী করিতেছে—যেথায় করিত সেথায় আছে কি-না, না থাকিলে কোথায় গিয়াছে! হাঁ, গরীব অনেক বামুনের মেয়ে কাশীতে রাঁধুনীর কাজ করিয়া খায়। তা এই কাঁচা বয়েস, মাকে ছাড়িয়া কোলের ঐ ছেলেটাকে পর্য্যন্ত ফেলিয়া কাদের সঙ্গে অমনই কলিকাতায় চলিয়া আসিল, কুলের মেয়ে কাহারও এত বড় দুঃসাহস হয়? আগেই জানিতে পারিয়াছিল, ঐ ঘরেই তার নাগর মিলিবে ; তাই আসিয়াছিল।—

মুখে যাই বলুন, মনে মনে রটন্তী সত্যই কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ননদের এক পত্রে সংবাদ পাইয়াছিলেন, লতা কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহার ভাল লাগে নাই। হাজার হউক, সোমত্ত বয়সের মেয়েকে একা এমন পরের বাড়ীতে রাখিতে নাই ; আগলাইয়াই সর্ব্বদা রাখিতে হয়। কেন, রাঁধুনীর একটা কাজ কি কাশীতেই তাহার আর কোথাও মিলিত না? তবে লতা নাকি অমন শক্ত ধাতুর খাঁটি মেয়ে, এই যা ভরসা। কিন্তু এখন—বিন্দী আসিয়া যাহা রটাইল—সত্যই যদি সে বাড়ী ছাড়িয়া গিয়া থাকে, কেন গেল? কোথায় গেল? বিন্দী আসিয়া যাহা বলিয়াছে—না, সে জাতীয় নষ্টামি লতার পক্ষে সম্ভবই হইতে পারে না। তবে কি হইয়াছে? কি হইতে পারে? একটা খবর লইতে হয়। অবিলম্বে স্বামীকে রটন্তী কলিকাতায় পাঠাইলেন।

ফিরিয়া আসিয়া যে সংবাদ তিনি দিলেন, যাহা মোটের উপর বিন্দী যাহা বলিয়াছে, তাহাই বটে!—

স্তব্ধ হইয়া কতক্ষণ রটন্তী বসিয়া রহিলেন। শেষে কহিলেন "কি নাম ব'ল্লে না ছেলেটার?"

"বিরিঞ্চি—বিরিঞ্চিমোহন।"

"বিরিঞ্চি—মোহন।—'মোহন'ও আছে। না, এ হ'তেই পারে না—লতি যদি নষ্ট-দুষ্ট মেয়ে হয়, ধর্ম্ম ব'লেই এ পিথিমীতে কিছু নেই।—মোহন—বিরিঞ্চিমোহন—হুঁ—বুঝতে পেরেছি—এখন সব। ঐ হতভাগাই 'মোহন' নামে গিয়ে ফাঁকি দিয়ে ওকে বিয়ে ক'রে এসেছিল! বড় ঘরের ছেলে—ধরা প'ড়ে শেষে বাপে বেটায় কি হ'য়েছে—বাপটা শেষে ছেলে আট্‌কে ফেলেছে, সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে ওদের খোরপোষের একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে এমনি এক কায়দা ক'রে, যেন কেউ না ধ'রতে পারে।—"

"কিন্তু পালিয়ে কেন গেল? কোথায়ই বা গেল?"

"যাবে না কি ক'র্‌বে? ও বাড়ীতে আর থাকে কি ক'রে? তেজী মেয়ে—হয় একদম কোথাও পালিয়ে গেছে, না হয় ঐ হতভাগাই আর কোথাও নিয়ে রেখেছে। কি বাপ মাই সব জান্‌তে পেরে আলাদা কোথাও থাকবার একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে। যাক্‌ ওদের সেদিন কাণ্ডটা ঠিক কি ঘটেছিল, বাইরের লোক ত কেউ সব জান্‌তে পারে না! —চাকর-চাকরাণীগুলো—যা তারা আঁচ ক'রে নিয়েছে, তাই রটিয়েছে।—"

"হুঁ—সেটা সম্ভব বটে।"

রটন্তী কহিলেন, "যদি ঐ হতভাগাই আর কোথাও নিয়ে রেখে থাকে, কি বাপ-মা এই বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে থাকে, ভয়-ভাবনার কিছু নেই, সোয়ামীর কাছেই আছে।—'

"কিন্তু কুচ্ছোটা ত এই রটল!"

"সেইটেই হ'চ্ছে বড় একটা গোলমালের কথা।—কি করা যায় এখন? আর যদি একলা কোথাও পালিয়ে গিয়ে থাকে—না, সোয়াস্তি ধ'রেই থাক্‌তে পারছি নি—চল, কাশীতে যাই।"

"কাশীতে!"

"হাঁ, ঠাকুরঝির কাছে খবর সব নিশ্চয়ই গেছে। পালিয়ে যদি এক কোথাও গিয়ে থাকে, মাকে অবিশ্যি লতি সব জানিয়েছে।—হয়ত কাশীতে গিয়েই মার কাছে এদ্দিন পৌঁছেচে।—যাই হ'য়ে থাক, সব জান্‌তে হবে, আর জেনে গাঁয়ে এসে সব ব'ল্‌তেও হবে। আপনার ভাগ্নী—ভাগ্নীই বা কি মেয়েই বা কি—লতির নামে এই কুচ্ছো গাঁ ভ'রে সবাই গেয়ে বেড়াবে, আর তাই চুপচাপ স'য়ে থাকব ঘরে ব'সে থাকব. না সে হ'তেই পারে না!'—তেমন রক্তে এ রটন্তী বামনী জন্মায় নি।"

বলিয়া মাথার কাপড়টা সরাইয়া শিথিল কবরী রটন্তী শক্ত করিয়া বাঁধিলেন।—

যোগেশ বাঁড়ুয্যে কহিলেন, "কাশী যাব আবার আসব দুজনে ফিরে —খরচ-পত্তর—"

"যে করে হয় যোগাড় করে নিতেই হবে। ওপ্‌নার পৈতেয় ভিক্ষের সেই পাঁচটা টাকা পাওয়া গিয়েছিল, তুলে রেখেছিলাম। আর নাকের এই নথটা আছে, বাঁধা দিয়ে দশ বারোটা টাকা যদি নাও। খালি নাকে সধবাকে থাকতে নেই—তা কি ক'রব? একটা আংটা আছে তাই বরং নাকে দিয়ে রাখব।—হাঁ, তাহ'লে উত্‌যুগ কর, কালই রাত্তিরের গাড়ীতে রওনা হব। ভোরে উঠেই গিয়ে সদ্দিকে নিয়ে এস। সে এসে ক'দিন ওদের নিয়ে বাড়ীতে থাক্। আর ঐ পুণোর পিসীকে বলব, সে ক'দিন রেতে ওদের কাছে শুয়ে থাকবে।"

পরদিন সকালের ডাকে মন্দাকিনীর একখানা পত্র আসিল। লিখিয়াছেন, বড় একটা সঙ্কটে তিনি পড়িয়াছেন, অবিলম্বে বৌকে লইয়া দাদা যেন ক'দিনের জন্য আসেন। খরচের বাবদ টাকাও কিছু মনি অর্ডারে আসিল।—তা মহাতীর্থ কাশীধাম, নিকটেই আবার গয়াধাম! জীবনে কখনও হয় নাই, আর হইবেও না। সুযোগ যদি একটা ঘটিল, তীর্থকৃত্যাদিও যথাসাধ্য করিয়া কেন না আসিবেন?—নথের আর এমন কি মায়া? একটা আংটাতেও এয়োস্তীর লক্ষণ বজায় থাকিবে। বাঁধা দিয়া বারোটি টাকা পাওয়া গেল, আর সেই ভিক্ষার ঐ পাঁচটি টাকা ছিল। সতেরটি টাকা লইয়া অন্যান্য বন্দোবস্ত যাহা প্রয়োজন সব করিয়া রাখিয়া পরদিন সস্ত্রীক যোগেশ বাঁড়ুয্যে অথবা স-ভর্ত্তৃকা রটন্তী কাশী চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাপড় কাচিয়া এক ঘড়া জল তুলিয়া আনিবেন বলিয়া রটন্তী একাই পুকুর ঘাটে গেলেন। শুনিলেন, প্রতিবেশিনীরা কেহ কেহ তাঁহার কাশী যাত্রার কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন ; একজন বলিতে-ছিলেন, "কাশী যাচ্ছে, ভগ্নীর নামে কাশীতে মঠ দিয়েই আস্‌বে।'

রটন্তী বলিয়া উঠিলেন, "তা দিয়ে আসব বই কি দিদি, দিয়ে আসব বই কি! কাশীতে কেবল কেন, দেশে এসেও দেব।"

প্রতিবেশিনী উত্তর করিলেন, "তা দিস্। ঐ শিরোমণি ঠাকুর গিয়ে মাথা মুড়ে প্রাচিত্তি ক'রবেন, আর গাঁ ভেঙ্গে সব লোক গিয়ে পূজো দেবে—ভাঙ্গা কুলোয় ঘেঁটুফুল বাসী উনুনের পাঁশ আর ইটপাটকেল নিয়ে!"

রটন্তী কহিলেন, "শিরোমণি ঠাকুর মঠ পিত্তিষ্ঠে ক'র্‌বেন। মাথা মুড়ে ঘোল ঢেলে প্রাচিত্তি ক'রবে বিন্দী, গাঁ ভেঙ্গে লোক গিয়েও পূজো দেবে—আবার পুষ্পপাত্তরে জবা অপরাজিতে বেলপাতা দুব্বো চন্দন আর ধূপ দীপ নৈবেদ্যি সাজিয়ে নিয়ে।"

বলিয়াই রটন্তী দুপদাপ পা ফেলিয়া ঘাটে নামিলেন, কাপড় কাচিয়া জল তুলিয়া লইয়া আসিলেন।

৩৫

লতা বলিয়াছিল, ইলাকে সে পত্র লিখিবে। সুকেশবাবুর নিকট হইতে ইলার পিতৃ-গৃহের ঠিকানাও সে লইয়াছিল। পত্রে লতা লিখিল,

"বোন,

আমার জন্য কিছু ভাবিও না ; আমি নিরাপদ আশ্রয়েই আছি এবং কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত যাহা করিয়া লইতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় দিন আমার একরকম চলিয়া যাইবে। তোমাদের সংবাদ সর্ব্বদা পাইতে পারি, এইরূপ একটা সুযোগও পাইয়াছি।—শুনিলাম, তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছ। তুমি নাকি চাও, খুঁজিয়া আমাকে বাহির করিয়া আমাকে লইয়াই উনি সংসার করুন। কিন্তু বড় ভুল বুঝিতেছ বোন্। সবই শুনিয়াছ। এ অবস্থায় ওঁর সঙ্গে এরূপ কোনও সম্বন্ধ আমার সম্ভবই হইতে পারে না। দেখা কখনও হয়, এটাও আমি চাই না। তাই এইভাবে আত্মগোপন করিয়া আছি। কাশীতে আমার মাকেও আমার ঠিকানা এখনও আমি জানাই নাই ; অন্য উপায়ে তাঁহাদের সংবাদ লইবার চেষ্টা করিতেছি। আমার কোনও সন্ধান উনি সহজে পাইবেন না, পাইলেও দেখা আমার সঙ্গে হইবে না—তখনই এই আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও আমি চলিয়া যাইব ; হয়ত এমন একটা আশ্রয় আর কাজকর্ম্মের এমন সুযোগ সহজে আর পাইব না। তাঁকে বলিও, তিনি যেন সন্ধানের চেষ্টায় বৃথা শ্রম আর না করেন। ফলে হয়ত শেষে আমিই বিপন্ন হইয়া পড়িব। ভাগ্যে আমার এ বিড়ম্বনা আমারই কর্ম্মফলে ঘটিয়াছে, তিনি নিমিত্তের ভাগী মাত্র। দোষী তাঁহাকে আমি করি না। ভুল যাহা একটা করিয়াছিলেন, নিজেই তাহার জন্য যথেষ্ট পরিতাপ ভোগ করিতেছেন এবং তাহাতেই আমি বড় দুঃখ পাইতেছি। নিজের জন্য কিছুই ভাবিতাম না। বোন মাথার উপরে ধর্ম্ম আছেন, দেবতা আছেন, এ জীবনে জ্ঞাতসারে তাঁদের কাছে কোনও অপরাধে অপরাধিনী আমি হই নাই। তবে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল কেউ এড়াইতে পারে না। এ প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হইবে—আর তার ভার বহিতেও আমি পারিব। তবে ঐ খোকাটি—তার ভবিষ্যৎ জীবনের এই বিড়ম্বনা—বড় হইয়া যখন সব বুঝিবে, কোনও পরিচয় দিয়া লোক-সমাজে দাঁড়াইতে পারিবে না—কি করিয়া সে তা সহিবে, ভাবিয়া কুল পাই না। দুঃখ আমার এই, ভয়ভাবনাও এই। তবে উপায় নাই, কর্ম্মফলেই এই অভাগীর গর্ভে আসিয়া সে জন্মিয়াছে, এ প্রায়শ্চিত্ত তাহাকেও করিতে হইবে।—সে ভার বহন করিবার শক্তি তার যেন তখন হয়, দেবতার কাছে এই প্রার্থনাই আমি করি। তোমরাও এই আশীর্ব্বাদ তাকে করিও।—

আমার একান্ত অনুরোধ—প্রার্থনাই এই জানিবে, স্বামীর কাছে ফিরিয়া যাও। স্বভাবের পরিচয় যেটুকু পাইয়াছিলাম, ভুল ত্রুটি যাহাই করিয়া থাকুন, অমানুষ তিনি নন ; বেশ বুঝিতে পারিতেছি, এই ঘটনায়

লজ্জায় ক্ষোভে পরিতাপে মর্ম্মে তিনি মরিয়া আছেন। ফিরিয়া তাঁর কাছে যাও, একটু শান্তি স্বস্তি যাতে পান তাই কর।—নারী তুমি, স্ত্রী তুমি, এটা তোমার ধর্ম্ম, এ ধর্ম্ম তুমি লঙ্ঘন করিতে পার না।

এই কথাটা স্থির তুমি বুঝিও, তাঁকে বুঝিতে দিও, এ জীবনে তাঁর সঙ্গে কোনও সম্বন্ধই আমার আর হইতে পারে না। বর্ত্তমান এই অবস্থায় ত সম্ভবই নয়—যদি ওঁরা কখনও ঘরের বউ বলিয়া স্বীকারও আমাকে করেন, প্রাণান্তেও ও সংসারে একটা কাঁটা হইয়া গিয়া বসিব না। সংসারে ও সব সুখের স্পৃহাও আর এতটুকু আমার চিত্তে এখন নাই। আমাদের যে বিবাহ হইয়াছিল, সেটা যে সিদ্ধ বিবাহ নয়, কেন নয়, এটা আমি এখনও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।—তবে আমি অবোধ অজ্ঞ একটা মেয়েমানুষ, আর ওঁরা জ্ঞানী। এই বলিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, কি করিব? গ্রহণ যদি আবার কখনও করেন, আবার বলিতেছি বোন্, ও সংসারে একটা কাঁটা হইয়া গিয়া বসিব না—সে স্পৃহাও আমার কখনও হইবে না। এইটুকু কেবল বলিতে পারি, যদি তা কখনও সম্ভব হয়, আমার খোকাটিকে তখন তোমার কোলে দিয়ে কৃতার্থ হইব। এ জীবনে সকল আকাঙ্ক্ষা তখন পূর্ণ হইবে। বাইরে এখন যেমন আছি, বাইরেই তেমনই থাকিব। ওঁদের অর্থসাহায্যও কিছু চাই না। মায়ে ঝিয়ে আমরা উদরান্নের দুটি সংস্থান নিজেদের শ্রমে করিয়া লইতে পারিব। আর যদি দীনদুঃখীর সেবার কোনও কাজ পাই, তাতেই চরিতার্থ হইব।

সুতরাং স্বামীর সঙ্গে তোমার মিলনে কোনও অন্তরায়ই আমি নই।—অন্তরায় যদি করিয়া থাকি, তাতেই দুঃখ পাইব; শাস্তি যেটুকু পাইতে পারি, তাতেই বঞ্চিত থাকিব। তাই বলিতেছি, অন্তরায় করিয়া আর আমাকে রাখিও না, এ দুঃখ আর দিও না, এটুকু শান্তিতে বঞ্চিত আমাকে করিও না।—

সংবাদ তোমাদের আমি পাইতেছি, পাইবও। অচিরেই যেন এই সংবাদ পাইয়া আমি খুসী হই, অন্তরায় বলিয়া আর আমাকে গণনা করিতেছ না, স্বামীর ঘরে ফিরিয়া গিয়াছ, স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছ।"

তোমার স্নেহের দিদি

লতা

পত্রখানি ইলা পড়িল—বার বার পড়িল—পড়িল আর কাঁদিল। কাঁদিয়া আর কুল পাইতেছিল না। একটু শান্ত হইয়া পত্রখানি সে মাতাকে দিল, তিনি গিয়া স্বামী ললিতবাবুকে দেখাইলেন। মনট দুজনেরই বড় নরম হইয়া পড়িল—অশ্রুর উচ্ছ্বাসও রোধ করিতে পারিলেন না। মনে হইল, এই যে সাক্ষাৎ দেবীতুল্যা মেয়েটি, তাহার এই অমর্য্যাদা এই দুঃখ তাঁহাদের কন্যার পক্ষেও কল্যাণকর হইবে না। আর সেই কন্যাই মনের তাপে স্বামীর সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছে, একেবারে দেহপাতই করিতে বসিয়াছে। গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ললিতবাবু শেষে কহিলেন, "কি আর ক'রব? ওকে গিয়ে বল, বিরুকে একটা খবর দিক; সে আসুক, চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে দিক্। তারপর সে তার মা বাপের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা ভাল হয় করুক। মেয়ে বাঁচবে, তবে না তার সুখ?"

খবর পাইয়া বিরিঞ্চি আসিল।—দেখিয়াই ইলা চমকিয়া উঠিল।

"এ কি! কি সর্ব্বনাশ! এই ক'দিনে তুমি কি হ'য়ে গেছ!—অসুখ-বিসুখ ক'রেছে কিছু?"

"না! তুমিও যে একেবারে পাত হ'য়ে গেছ ইলা!"

কাঁদিয়া ইলা দুটি হাতে মুখ ঢাকিল। বিরিঞ্চি আসিয়া কাছে বসিল।—স্বামীর গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মুখখানি রাখিয়া ইলা কাঁদিতে লাগিল—অনেকক্ষণ কাঁদিল। বিরিঞ্চির দুই চক্ষেও অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া ইলা কহিল, "ওগো, শরীরটি অমন ক'রে ছেড়ে দিও না। একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রো না। পারলাম না, সইতেই পারলাম না; ছেড়ে তোমাকে চ'লে এলাম। এসে অবধি কি আগুনে যে পু'ড়ে ম'রছি। কি ক'রব? লতাদির কথা যখন মনে হয়—"

"থাক্, থাক্, আর বলো না ইলা।—ভাবতেই আমি পারি না—তোমার মুখে ও-কথা যেন বিষের কাঁটা এসে বুকে বিঁধল!"

"কিন্তু না ভেবে কি পার? ভুলে থাকতে কি পার? এই যে সর্ব্বনাশটা তার হ'ল—"

"থাক্, থাক, আর নয় ইলা, আর নয়! আমি মানুষ নই, মানুষের মত কাজ করিনি, কেন যে এ পৃথিবীর ভারবোঝা হ'য়ে এখনও বেঁচে আছি জানি না।"

স্বামীকে আবার জড়াইয়া ধরিয়া ইলা বলিয়া উঠিল, "দোহাই—দোহাই তোমার—অমন কথা মুখেও এনো না!—ওমা! ভাবতে যা পারি না, তাই তুমি মুখে ব'লছ! ওমা, কি হবে? কি ক'রব আমি?"

"ভয় নেই ইলা?—আমার মত কোনও হতভাগা সহজে কেউ মরে না।—কিন্তু কেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও! কি সুখ তোমার হবে?—আমার মত একটা অমানুষ—"

"না না, অমানুষ তুমি নও, অমানুষ তুমি নও। লতাদি লিখেছে, অমানুষ তুমি নও।"

"লতা লিখেছে! কি লিখেছে! কোত্থেকে লিখেছে?"

"লিখেছে—কোত্থেকে লিখেছে—ঠিকেনা কিছু দেয় নি। তবে ঠিক ক'রে জানি না, আমাদের সব খবর সে নিচ্চে, খবর সব পাচ্ছে। এই যে চিঠি।"

উঠিয়া গিয়া একটি দেরাজ খুলিয়া লতার পত্রখানি আনিয়া ইলা বিরিঞ্চির হাতে দিল। পড়িয়া বিরিঞ্চি কাঁদিয়া ফেলিল, হাত হইতে চিঠিখানি পড়িয়া গেল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পালঙ্কের রেলিংএর উপরে মাথাটি রাখিল। ইলা কহিল, "কেঁদো না, কেঁদো না, অমন ক'রে আর কেঁদো না! ওগো, আমি যে সইতেই পারছিনি আর!"

কাছে ঘেঁসিয়া স্বামীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আঁচলে ইলা অশ্রুধারা পুছিতে লাগিল। কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে শেষে কহিল, "তাহ'লে কি ক'রবে এখন?"

"কি ক'রব? কিছুই ভাবতে পারছি নি ইলা!—ছেড়ে যখন তুমি এলে, মনে বড় ব্যথাই পেয়েছিলাম। কিন্তু শেষে মনে হ'য়েছে, না, ঠিকই হ'য়েছে।—ঠিকই ক'রেছ তুমি। লতাকে এই দুঃখে, এই অসম্মানে ফেলে রেখে কোনও সন্ধানই তার না পেয়ে, তোমাকে নিয়ে থাকতেই আমি আর পারি না। তবু যদি তার দেখা একটিবার পেতাম, দুটি কথা যদি তাকে বলতে পারতাম, পায়ে ধ'রেও যদি তার ক্ষমা পেতাম—তাতেই বা কি? জানি তার স্বামীর যোগ্য আমি নই, স্বামী ব'লে এতটুকু শ্রদ্ধা সে আমাকে আর ক'রতে পারে না, সংসারে তার কোনও দাবী নাই যে লিখেছে, তার কারণ আমার মত স্বামীর সংসারে কোনও স্পৃহা তার মত কোনও মেয়ের থাকতেই পারে না। না, তাকে আমার সংসারে আনব, স্বামীর পদ গ্রহণ ক'রব, সে অধিকার ই আমার নেই। কিন্তু তবু—তবু মুখোমুখি যদি দুটো কথা ব'লতে পারতাম—ক্ষমা তার পেতাম!—ধিক! পেলেই বা কি? নারীর যে সম্পদায় বঞ্চিত ক'রেছি, তা যে আর তাকে ফিরিয়ে দিতে পারছি নি ইলা। তাকে এই অমর্য্যাদার গ্লানিতে ফেলে, কি ক'রে কোন মুখে, কোন্ সুখে আমি তোমাকে নিয়ে স্বামীস্ত্রীর মত এক সংসারে থাকব ইলা?"

"কিন্তু সে লিখেছে বড় দুঃখু পাবে। কত ক'রে আমাকে লিখেছে, এ দুঃখু তাকে না দিই। তারপর—তারপর—থাকতেই যে পারছি নি আমি। এ ত তোমার শরীর হ'য়েছে, মনের অবস্থা এই। কি ক'রে আমি ছেড়ে এখানে থাকব?"

বলিতে বলিতে ফুঁকরাইয়া ইলা কাঁদিয়া উঠিল। বিরিঞ্চি নীরব। কিছুক্ষণ পরে কি ভাবিয়া ইলা কহিল, "শোন, এক কাজ কর। এই চিঠিখানা নিয়ে যাও, মাকে বাবাকে নিয়ে গিয়ে দেখাও। আমার মা বাবা এখানে চোখের জল রাখতে পারেন নি, আর ওঁদের প্রাণ কি একটু গ'লবে না? এইটুকু অন্তত করুন, তার মানটা তাকে দিন, ঘরের ছেলে ব'লে ছেলেটিকে ঘরে আনুন, বুকে তুলে আমি নেব। আর—আর—সে যদি আসে, তার দাসী হ'য়ে থেকেও কৃতার্থ হব। তার হাতে তোমাকে রেখে এখানে এসেও নিশ্চিন্ত আমি থাকতে পারব।"

কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল; চক্ষু মুছিতে মুছিতে পত্রখানি তুলিয়া স্বামীর হাতে দিল।

বিরিঞ্চি কহিল, "দেখি কি বলেন ওঁরা। মা চাইবেন, পেড়াপীড়িই বরং ক'রবেন। কিন্তু বাবা কি ব'লবেন জানি না। যদি পারতাম ইলা—সত্যই অমানুষের মত যে ভীরুতা, যে দুর্ব্বলতা আমার ছিল—আজ আর তা নাই—ধিক্কারে ধিক্কারে সব তা কেটে গেছে আজ—যদি পারতাম, তাঁর ত্যাজ্যপুত্র গৃহতাড়িত পথের ভিখারী হ'য়েও এ মর্য্যাদা যদি তাকে দিতে পারতাম, এতটুকু কুণ্ঠিত হ'তাম না। কিন্তু তিনি বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ালে পারি না।"

"আমি গিয়ে পায়ে ধ'রে কাঁদব, পায়ে জড়িয়ে লুটিয়ে প'ড়ে থাকব।—বিরোধী হ'য়ে আর দাঁড়াতে পারবেন না।"

বিরিঞ্চি একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "যাই ত আজ এই চিঠিখানা নিয়ে। দেখি কি বলেন—"

"যাই বলুন, আমি যাব।—কালই আমি যাব—থাকতে আর পারব না। লতাদির কথাও ঠেলতে আর পারছি নি। সে ত শুনবে, কত দুঃখ পাবে, ভাববে এই সোস্তিটুকুও তাকে দিলাম না। যদি দেখাও একটিবারের তরে পেতাম—দুটি কথাও তাকে বুঝিয়ে ব'লতে পারতাম—"

পিঠে হাতখানি রাখিয়া বিরিঞ্চি কহিল, "উঠি আজ তবে ইলা?"

"এস।"

বলিয়াই দুই হাতে মুখ ঢাকিল। অশ্রুর উচ্ছ্বাসে আকুল হইয়া কোনও মতে বিরিঞ্চি বাহির হইয়া গেল।

৩৬

পরদিন আফিসে গিয়া হরমোহনবাবু সুকেশবাবুকে সংবাদ পাঠাইলেন। বেলা তিনটায় সুকেশবাবু আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ে গিয়া খাসকামরায় বসিলেন।

"কি বলুন ত? আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?"

"ব'স, ব'লছি।" বলিয়া একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "হাঁ, ঐ মেয়েটি—এই লতা—এখন কোথায় আছে?"

"আছে একটি প্রসূতির কাছে, তার নার্সের কাজে।"

"তোমার জামিনেই এখনও আছে, না পুলিসকোর্টথেকে discharge (খালাশ) করিয়ে এনেছ?"

"না, এখনও আনা হয় নি। সে যেদিন হয় থানায় গিয়ে একটা রিপোর্ট লিখিয়ে করিয়ে আন্‌লেই হ'ল।"

"সেটা এখন করিয়ে ফেল্লেও পার। ওদের—কেন রেতে একা পথে বেরিয়েছিল, এসব খবর কিছু বোধ হয় দিতে হবে না?"

"না। দারোগাবাবু ব'লেছিলেন, এমনিই সাধারণভাবে একটা রিপোর্ট দেবেন, ঘটনাচক্রে এই রকম হ'য়েছিল, সন্দেহ করবার মত সন্ধানে কিছু পাওয়া যায় নাই।"

"হুঁ—সর্ব্বদা বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখাশুনো হয়?"

"তা হয়। যে লেডীডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে রেখেছিলাম, তিনিই ঐ কাজে তাকে লাগিয়ে দিয়েছেন। আমাদের 'নকু'টাও পাশাপাশি ফ্লাটে থাকে কি না—"

"কে, মিসেস্ চম্পটী?"

"হাঁ।"

"স্থানটা খুব ভাল নয়—"

"না, তা নয়। তবে কি করব বলুন? তাড়াতাড়িতে আর জায়গা না পেয়ে ঐখেনে নিয়েই রাখতে হল। আবার জামিন হ'য়েছি, আমার চোখের সামনেও রাখা দরকার—"

"হুঁ—তা হ'লে নার্সের কাজই ক'রবে, এই স্থির ক'রেছে?"

"আপাতত তাই ত তার অভিপ্রায় দেখ্‌তে পাই। ক'রবেই বা আর কি?"

"কাজের জন্য নির্ভর ত ক'রতে হবে ঐ চম্পটীর ওপরে? নার্স'ও ত হবে গিয়ে ঐ চম্পটীর সব 'পেসেণ্ট'দের?"

একটু হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "তা ছাড়া কাজ এখুনি কোথায় আর পাবে?"

"একটু দৃষ্টি রাখ্‌ছ ত?"

"তা রাখ্‌ছি বই কি? তা ছাড়া, জানেন ত, মেয়েও খুব ভাল, আর খুব শক্তও বটে। ভয়ের কারণ কিছু নেই।"

"খালাশ পেলে তোমার হাতছাড়া হ'য়ে যাবে না ত?"

"না, তা যাবে না। নির্ভরও আমার ওপরে খুব করে।"

"যেখানে এখন আছে, কদ্দিন আর থাক্‌বে?"

"মাসখানেক আর ত থাক্‌তেই হবে। শুন্‌লাম সবে কাল একটি সন্তান সে প্রসব ক'রেছে। কেন বলুন দিকি? কি হ'য়েছে? বিরু কি খোঁজখবর কিছু—"

"না, সে কিছু পায় নি। তবে পাবার চেষ্টায় ঘোরাঘুরি খুব করে দেখ্‌তে পাই। খোঁজ খবর আমারই কিছু নেবার দরকার হ'য়ে প'ড়েছে।—"

"দরকার হ'য়ে প'ড়েছে।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে—আবার কেমন একটু শঙ্কিত ভাবেও সুকেশবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তবে কি কোনও গুপ্তচর তাঁহার উপরে রহিয়াছে? অনেক অতি কুশল চর পাকা এটর্ণীদের হাতে থাকে, তাঁদের কাজে ফেরে। কৌন্সিলীদের সূক্ষ্ম জেরার যত মালমশলা ইহারাই সংগ্রহ করিয়া আনে। হাজার হইলেও লতা তাহার ঘরেরই বউ বটে। তাঁহার হেপাজতেই রাখিয়াছেন, আর তিনি যে এসব বিষয়ে কত বড় একজন বেপরোয়া বেতমিজ পাকা ঘুঘু, তাহাও হরমোহনবাবু বেশ জানেন। যাহা হউক, হরমোহনবাবুর দৃষ্টি ওসব দিকে বড় পড়িল না, তেমন মনও তখন ছিল না। কহিলেন, "দেখ এই চিঠিখানা, সব বুঝতে পারবে।"

লতার চিঠিখানা বাহির করিয়া তিনি সুকেশবাবুর হাতে দিলেন। পড়িয়া মুখে একটু হাসিও ফুটিল। হরমোহনবাবু কহিলেন, "খবর-টবর বুঝি তোমার কাছেই সব পায়।"

"হাঁ, দেখাও গিয়ে করে সর্ব্বদা খবর-টবর নেবে ব'লে।"

"কোথায়? নুকে?"

"হাঁ। চম্পটীর কাছে তাঁর পেসেণ্টের খবর নিয়ে যায়, নুকে আমি থাকলে আমার সঙ্গে গিয়েও দেখা করে। সন্ধ্যেবেলায়ই প্রায় যায় যদি আমার সঙ্গে দেখা হয় আর খবর কিছু পায়।"

"হুঁ—"

"তাহ'লে কি ক'রতে চান এখন?"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া হরমোহনবাবু কহিলেন, "Resist. ক'র্‌তে (বাধা দিয়ে দূরে ঠেলে রাখ্‌তে) আর তাকে পারছি নি বাবা। নিঃসম্বল নিঃসহায় ঐ অতটুকু মেয়ে আজ হার মানিয়েছে আমাকে। তার মহাপ্রাণতায়, আগের মহিমায়, একেবারে আমাকে জয় ক'রেছে! শক্ত যত প্রাচীর তুলেছিলাম, অলক্ষে সব আজ ভেঙ্গে প'ড়েছে, আমার ঘরে এসে সে ঢুকেছে!"

মনটা সুকেশবাবুর কেমন তীব্র একটা আঘাতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া পড়িল; বুকটা দুর্‌দুর্ করিতে লাগিল; মুখখানিও বিশুষ্ক বিবর্ণ হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলেন, হরমোহনবাবুর চক্ষু দুটিও ছলছল হইয়া উঠিয়াছে। কি ভাবিয়া কহিলেন, "বৌ কি ফিরে এসেছে?"

"না, আসেনি এখনও। তবে আস্‌বে, আস্‌তে চাইছে। ভাব্‌ছি আজই সন্ধ্যেয় নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আস্‌ব। শুন্‌লাম, একদম শরীর ছেড়ে দিয়েছে, খায়-দায় না, বিছানা থেকেই উঠ্‌তে চায় না। অমন তক্‌তকে ফুলের মত টলটলে ডবকা চেহারা,—শুকিয়ে একেবারে পাত হ'য়ে গেছে। বিরুও যেন আধখানা হ'য়ে গেছে; দিনের বেলায় পাগলের মত পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, ছটফট ক'রে রাত কাটায়!"

সুকেশবাবু কহিলেন, "বৌ ফিরে এলে তখন হয়ত একটা সোয়াস্তি পাবে, সামলেও উঠ্‌বে।"

"না, বৌএর অভাবটা অভাব ব'লেই অনুভব ক'রছে ব'লে মনে হয় না। পরিতাপে দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। হবারই ত কথা, সত্যিই ত একেবারে পাষাণ মনুষ্যত্বহীন পাষণ্ড একটা নয়। তবে দুর্ব্বল নরম মন, তাই এই জ্বালাটা সইতেই পার্‌ছে না। সোয়াস্তি কিসে পাবে? বউ এসে যে সোয়াস্তি তাকে এতটুকু দেবে না, আমাকেও দেবে না। আবার কড়া উত্তরসাধক র'য়েছেন গিন্নী। না, এড়াতে আর পারব না, পারছিও না।"

"ললিতবাবু কি বলেন?"

"কি আর ব'ল্‌বে? এসেছিল আজ সকালে, ব'লে গেল, মেয়ে আগে প্রাণে বাঁচলে ত তার সুখ। যা আপনি ভাল মনে করেন, করুন।"

"তাহ'লে এখন বউ ব'লে ঘরেই তাকে ফিরিয়ে আনবেন?"

গলায় একটা ফলের বিচি কি পাথরের নুড়ী আটকিয়া গিয়াছে, এমন ভাবে সুকেশবাবুর মুখে কথাটা বাহির হইল।

"তাই ত ভাব্‌ছি বাবা। ঘরে ওকে আন্‌তে পারলে ঘরের অত্যুজ্জ্বল গৌরব, কুলবংশের চূড়ামণি, ও হ'ত—"

একটু কাষ্ঠহাসি কোনওমতে মুখে ফুটাইয়া ঢোক গিলিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "তবে দুটি সতীন, একঘরে—আজকালকার এই দিনে—"

"ওতে এমন আটকাত না কিছু। অবস্থাবিশেষে সবই মানিয়ে নিতে হয়। মানিয়ে নিয়ে চ'ল্‌তে ওরা পারতও। তবে কি-না, মনের সেই খুঁতখুঁতিটা একেবারে দূর ক'রে ফেল্‌তে পারছি নি। বিয়েটা ওদের ঠিক সিদ্ধ বিয়ে হয় কি-না বুঝতেই পারছিনি। ব্রাহ্মণপণ্ডিতও দুই-একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, সমস্যা অতি জটিল, দৃষ্টান্তও বড় পাওয়া যায় না—সন্তোষজনক উত্তর কারও কাছে পাইনি। এখন ভাল ক'রে একবার

দেখ্‌তে হবে। কিন্তু কার কাছে যাব? অপেক্ষাও ত বেশী দিন ক'র্‌তে পারছিনি—"

"তা—টাকা খরচ ক'র্‌তে পারলে অনেক বড় বড় পণ্ডিতের ব্যবস্থা অনায়াসে পাবেন।"

"না, টাকা দিয়ে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কিন্‌তে চাই না বাবা। মনকে কোনও মতে চোকঠার দিতে চাই না। পরিষ্কার এইটে বুঝে নিতে চাই, অকাট্য শাস্ত্রীয় প্রমাণে, সাধু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সরল ব্যবস্থায় বিবাহটা অসিদ্ধ বিবাহ হয় নি, লোকত কেবল নয় ধর্ম্মতও আমার কুলবংশের কোনও গ্লানি ওদের থেকে হবে না।"

"ও ত দিব্যাছে, বিবাহটাকে স্বীকার ক'রে নিলেও আপনার সংসারে এসে থাকবে না।"

"কিন্তু ছেলেটিকে ত সংসারে আন্‌তেই হবে। আর সে হবে এসে জ্যেষ্ঠের অধিকারী। দেখি কি করা যায়? মেয়েটিকেও আর এই বাধা দিয়ে কুলের বাইরে ফেলে রাখ্‌তে পারছি নি।"

বলিয়া গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মন-মরাভাবে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ঘড়ীটি দেখিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "তাহলে—উঠি আজকে?"

"এস।—হাঁ, ওকে এখুনি এ সব কথা কিছু ব'লো না যেন।—"

"না, তা কিছু ব'লব না। কেন ব'লব? মিছে একটা আশা তার মনে জুগিয়ে—শেষে যদি কিছু ক'রে উঠ্‌তে আপনি না পারেন—"

"হুঁ! আচ্ছা, এস। পুলিশ কোর্ট থেকে discharge orderটা (খালাসের হুকুমটা) কাল পরশু তকই করিয়ে নিও। শেষে এ সব পরিচয়ের একটা রেকর্ড, না হয় রিপোর্ট কাগজে না বেরোয়।"

"যে আজ্ঞে।"

সুকেশবাবু বাহির হইয়া গেলেন।—বুঝিয়া গেলেন, হরমোহনবাবুকে কেবল হার মানিতে হয় নাই—তাঁহাকেও হইতেছে।—'বন্ধুত্বে' লতাকে লাভ করিবেন, আকুল প্রাণে এই যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিলেন, তাহা—না, আর পূর্ণ হইবার নহে, এত কৌশলে যে যাদুজাল তিনি বিস্তার করিয়াছেন, 'নুকে'র নিভৃত গৃহে সেই যত তাঁহার বাক্‌ছল, লালসাকুল দৃষ্টিতে, রসোচ্ছল কথার ভঙ্গীতে, কণ্ঠস্বরে, প্রচ্ছন্ন প্রেম-নিবেদন—সব—সব ব্যর্থ হইয়াছে! পূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে অনুভব করিয়াছেন, আজ লতার এই পত্রখানি পড়িয়া স্পষ্ট বুঝিয়া গেলেন, সে জালে লতা পড়ে নাই, ছলে ভোলে নাই, সে প্রেম-নিবেদন এতটুকু রেখাপাতও তাহার চিত্তে করিতে পারে নাই। ইহাও বুঝিলেন, স্বামীর প্রতি গাঢ় প্রেম কি অতি বড় একটা শ্রদ্ধার আকর্ষণ না থাকিলেও সত্যকার একটা দরদ আছে, অশ্রদ্ধার ভাবও এমন কিছু জন্মে নাই। তারপর ধর্ম্মনিষ্ঠা, হিন্দুনারীর ধর্ম্মনিষ্ঠা, হিন্দু প্রাণের অন্তর্নিহিত লোকপরম্পরাগত সব সংস্কার—এমন একটা উচ্চস্তরে তাহার চিত্তকে তুলিয়া রাখিয়াছে, আজ বৈরাগ্যের এমন একটা প্রেরণায় তাহার চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, চরিত্রকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিতেছে, যে এ জাতীয় কোনও প্রভাব সেথায় গিয়া পৌঁছিতেই পারে না,—কোনও প্রলোভন তাঁহার সঙ্গে এরূপ বন্ধুত্বের স্তরে তাহাকে নামাইয়া আনিতে পারে না!—আজ কয়দিন আবার সন্ধ্যায় সে আসে না; খবর যাহা দিয়া যায়, দিনের বেলায়। সভায় যাইতে সেদিন ডাকিলেন, তাহাও আসিল না। হয়ত তাহার ভাবসাবে কথাবার্ত্তার ভঙ্গিতে এমন কিছু একটা আভাস তাঁহার অভিপ্রায়ের পাইয়াছে যাহাতে সে এখন তাহাকে এড়াইয়াই চলিতে চায়! না, চেষ্টা আর বৃথা! জাল তাহাকে এখন গুটাইতেই হইবে। সুযোগও আর ঘটিবে কি-না সন্দেহ! বাড়াবাড়ি করিয়া নোংরা মোটাচালে কিছু করিতে গেলে যে শ্রদ্ধাটুকু এখনও তাহার চিত্তে হয়ত আছে, তাহাও হারাইবেন। তারপর এদিকে হরমোহনবাবু বধূ বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন, হয় ত করিবেনও। যাহাই আজ বলুন, মনকে চোখ ঠারিয়া এ খুঁৎখুতিও তিনি চাপিয়া দিবেন, না দিয়া পারিবেন না। ছেলের চাপ, বৌএর চাপ, গৃহিণীর চাপ—আবার নিজের মনটারও চাপ আসিয়া পড়িয়াছে। খুঁৎখুতি সব একদম চাপিয়া পড়িবে। আর লতাও—যাই আজ বলুক—স্ত্রী হইয়া বিরিঞ্চির সঙ্গে আসিয়াও মিলিবে, বধূ হইয়া হরমোহনবাবুর গৃহে গিয়াও বসিবে। আর তখন—বাড়াবাড়ি এখন যদি গিয়া তিনি কিছু করেন, স্পষ্ট যদি লতাকে বুঝিতে দেন তাঁহার অভিপ্রায় কি, অতি অপদস্থ তাঁহাকে হইতে হইবে, চিরজীবনের তরে বিশ্বাস হারাইয়া হরমোহনবাবুরও বিরাগভাজন হইয়া তাঁহাকে থাকিতে হইবে। আর সেই বাড়াবাড়ি—এখন এই অবস্থায় চেষ্টা কিছু—যে ভাবে যে কৌশলে কি ছলে বলে তাঁহাকে করিতে হইবে, তাহাও ব্যর্থ হইবে নিশ্চয়। এ দিকে আবার লতার শ্রদ্ধা, হরমোহনবাবুর বিশ্বাসও ব্যাবসায়িক সহায়তা যাহা হারাইতে হইবে, তাহারও মূল্য কম নয়। পাকা বিষয়বুদ্ধির অতি হিসাবী লোক তিনি, বেশ বুঝিলেন, হার মানিয়া এখন তাঁহাকে হাল ছাড়িতেই হইবে! লালসাকুল ভাবপ্রবণ তরুণ যুবা তিনি নন, যে এরূপ কোনও উন্মাদনায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বস্বপণে তিনি প্রবৃত্তির এই স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িবেন, ফলাফল কিছুই গণনা করিবেন না। উপাদেয় ভোগের অভাবে বুভুক্ষার তাড়নাও সত্য এমন কিছু নাই, যাহাতে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য তিনি হইয়া উঠিবেন। কিন্তু তবু—তবু—লতার মত নারীর 'বন্ধুত্ব' কোনও উপায়েও যদি তিনি লাভ করিতে পারিতেন! আর এই পরাভব—এরূপ পরাভব প্রথম আজ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল! কিন্তু উপায় নাই!—এই আশাভঙ্গের, এই ব্যর্থ প্রয়াসের, বেদনাকে চাপিয়া রাখিতে হইবে, এই পরাভবকে ধীরভাবেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় হাসিমুখেই লতাকে তাঁহার অভিনন্দন করিতে হইবে। তীব্র একটা ছটফটানিতে মনটা আজ যতই তোলপাড় হইতে থাক, বুঝিলেন, এইভাবেই তাঁহাকে এখন প্রস্তুত হইতে হইবে এবং সকল শক্তি সংগ্রহে সেই চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

আশ্চর্য্য মেয়ে বটে। নিঃসহায় নিঃসম্বল একরূপ পথের কাঙ্গাল হইয়াও একখানি পত্রের দুটি কথায় তাঁহাদের মত দুইজন অতি কৌশলী

শক্তিমান্ পুরুষকেও সে আজ এমন পরাভূত—একেবারে যেন ধূলিসাৎ করিয়াই ফেলিল!

৩৭

বেলা প্রহরাধিক অতীত হইয়াছে; গুরু শিরোমণি মহাশয় এবং শিষ্য ঠাকুর হরদাস বারান্দায় বসিয়া আছেন। শিরোমণি মহাশয় বলিতেছিলেন, "যে ব্রত গ্রহণ ক'রেছ হরদাস, দারুণ এই যে বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে তা থেকে ধর্ম্মের উদ্ধারের আর সেই ধর্ম্মে ফিরিয়ে এনে দেশরক্ষার সমাজরক্ষার পক্ষে এর চাইতে মহৎ ব্রত আর হ'তে পারে না। নারীকে আশ্রয় ক'রেই ধর্ম্ম অটল হ'য়ে লোকসমাজে দাঁড়াতে পারেন। যে দেশ যতটা এই আশ্রয় পায়, সেই দেশকে ততটা ধর্ম্ম তার কল্যাণের পথে স্থির রাখতে পারে। এদেশে এতকাল তাই করেছে। এই যে অধর্ম্মের অভিযান আরম্ভ হ'য়েছে, বাল্য বয়স হ'তেই আমরা দেখ্‌ছি, এতদিন শুদ্ধান্তপুরে প্রবেশ করে নারীকে—মায়ের জাতিকে—টলাতে পারে নি, ধর্ম্মও তাই বড় টলে নি, সমাজও তাই ভাঙ্গতে পারে নি। কিন্তু অধুনা দেখ্‌তে পাচ্ছি, এই অভিযান শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী নারীর উপরেই অতি প্রবল বেগে এসে পড়েছে, সূক্ষ্ম-কূটছলে ধর্ম্মবুদ্ধি থেকে তাদের ভ্রষ্ট ক'রে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। ফেরাতে তাদের হবে। কিন্তু ভেরাবে কে? রক্ষক হ'য়েও পুরুষ আজ ভক্ষক হ'য়ে উঠেছে। নারী যে মায়ের জাত এইটেই তারা ভুলেছে, সামাজিক যে দায়িত্ব গ্রহণ এঁদের রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য, তাই অনেকে গ্রহণ ক'র্‌তে চাইছে না। কেউ উদাসীন, কেউ আজ গত স্বার্থ সুখের উপরে কিছুই আর দেখ্‌তে চায় না, কেউ বা দুষ্টবুদ্ধি পরিচালিত—আপন ধর্ম্মে আপনাদের রক্ষার প্রয়াস নারীকেই এখন ক'র্‌তে হবে। ধর্ম্মবুদ্ধিতে যারা স্থির আছে, তাদের এখন সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এই অভিযোগের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। সময়ও ঠিক সুসময় হ'য়ে উঠেছে। বুদ্ধিভ্রষ্ট কেবল নয়, বিপথে গিয়ে কার্য্যতও বহু নারী অতি বিপন্ন হ'য়ে প'ড়েছে। এদের দৃষ্টান্ত অপর পক্ষে শিক্ষার স্থল হ'য়ে উঠেছে। এরাও এঁদের বড় সহায় হ'তে পারে, যদি সত্যই সুশিক্ষায় এদের সুপথে ফিরিয়ে আন্‌তে পার, অধর্ম্মে কেবল বিরতি মাত্র নয়, ধর্ম্মে যদি সত্যই ব্রতপরায়ণা ক'রে এদের তুল্‌তে পার।"

হরদাস কহিলেন, "তাই আমি চাই বাবা। যে আশ্রমটা প্রতিষ্ঠা ক'রব সংকল্প ক'রেছি, সেখানে মায়ের মন্দিরে পূজা ব্রতপরায়ণাই ক'রে তুল্‌তে চাই এদের—এদের 'উদ্ধার-আশ্রম' দেশে স্থানে স্থানে হ'চ্ছে। কিন্তু এভাবে এদের ধর্ম্মে ফিরিয়ে নেবার, ধর্ম্মে সত্য ব্রতপরায়ণা ক'রে তুলবার একটা চেষ্টা কি লক্ষ্যও কোথাও দেখ্‌তে পাই না। এই যে সব আশ্রম—যতদূর দেখছি বাবা—পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে যেন এক একটা জেলখানায় এদের কোনও মতে আট্‌কে রাখা হয়। কাজকর্ম্ম যা শেখান হয়, জেলের কয়েদীদের কাজকর্ম্মের মত। শাস্তি এরা একটু পায় না, মন বসে না, ফাঁক পেলেই পালিয়ে যেতে চায়।"

একটু হাসিয়া শিরোমণি মহাশয় কহিল, "সে ত উদ্ধার নয়, একটা দুঃখদুর্গতি থেকে আর একটা দুঃখদুর্গতির আগে নিয়ে বন্দী ক'রে রাখা। মন বসবে কেন? শান্তি এরা পাবে কেন? পরিণাম যাই হ'ক্ ঐ পাপের পথেও তবু একটা স্বাধীনতা তাদের আছে, আর এ একেবারে বন্দীর দশা! আর এই যে বন্দীর দশা, তার-ই বা পরিণাম কি? কি সুখ-শান্তির প্রত্যাশা এরা ক'রতে পারে। না না বাবা, তুমি যে পথে এদের নিয়ে যেতে চাইছ, শান্তির পথ কল্যাণের পথ এরই এই-ই বটে! কিন্তু বড় একটা কঠিন সমস্যাও তোমার সাম্‌নে উপস্থিত হবে। এদের যে সব সন্তানসন্ততি—বড় হ'য়ে যখন উঠবে, আমাদের এই সমাজে, কোথায় কোন্ জাতিতে কোন্ কুলবংশে তাদের স্থান হবে? বিবাহ দিয়ে সংসার ধর্ম্মেও এদের স্থিত ক'র্‌তে হবে। কার সঙ্গে কার কি ব্যবস্থায় কি আচারে বিবাহ হবে? আমাদের এই যে হিন্দু সমাজ—প্রত্যেকটি গৃহস্থ এর ভেতর কোনও না কোনও জাতির পরিচয়ে, কোনও না কোনও কুলবংশের আচার নিয়মে সামাজিক জীবনযাপন করে। এই সব ধরেই পৃথক্ এক একটি সমাজ হ'য়েছে। হিন্দুগৃহস্থ এরূপ কোনও না কোনও সমাজের সামাজিক। বাইরে স্বাধীন ও স্বতঃভাবে কারও স্থানই কোথাও নাই, সামাজিক ধর্ম্মে কি ক্রিয়াকর্ম্মাদিতে কেউ কিছু নির্ব্বাহ ক'র্‌তে পারে না। কিন্তু এদের স্থান কোথায় হবে?—স্থান একটা না হ'লে না পেলে, সংসারধর্ম্মে প্রবেশ ক'রে সামাজিক জীবনই বা এরা কি ভাবে যাপন ক'র্‌বে?"

একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া হরদাস উত্তর করিলেন, "সমস্যা কঠিনই বটে। আমিও ভেবেছি, কিন্তু সমাধানের পথ এখনও কিছু পাইনি। পাইনি, তবে মা জগদম্বার কৃপায় সময়মত পাব এই ভরসা রাখি। এই পথ তিনি দেখিয়েছেন, পথযাত্রায় যে সব সঙ্কট-সমস্যা উপস্থিত হবে, তার কিনারা কিসে হ'তে পারে সে পথও তিনিই দেখিয়ে দেবেন। মানুষ হ'য়ে এরা জন্মেছে, সুশিক্ষায় ধর্ম্মপথে মানুষ যদি হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, মানুষের মত একটা স্থানও লোকসমাজে এরা পাবে, ব্যবস্থা মা জগদম্বাই ক'রে দেবেন। আজ আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছিনি; ব্যবস্থা তিনি ক'রেই রেখেছেন।"

সাশ্রু নয়নে হরদাসকে আলিঙ্গন করিয়া শিরোমণি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, রেখেছেন—নিশ্চয়ই রেখেছেন! সন্তানের যদি স্থান তাঁর গৃহে না হয়, স্থান না তিনি ক'রে দেন, কিসের তিনি মা জগদম্বা! হাঁ, হবে হবে! মানুষও মানুষকে চিরদিন মনুষ্যত্বের, মানবসমাজের, গণ্ডীর বাইরে ফেলে রাখ্‌তে পারে না। এই যে আমাদের হিন্দু সমাজ—আজ মৃতবৎ যতই অসাড় অকর্ম্মণ্য, আত্মরক্ষায় আত্ম-প্রতিষ্ঠায় আত্মপ্রসারে 'শিথিল অশক্ত হ'য়ে পড়্‌ক, যোগ্যকে যোগ্যের স্থান দিতে কুণ্ঠিত কখনও হয়নি, বিপর্য্যয় যখনই যা ঘটুক, ধর্ম্মের বলে একটা সামঞ্জস্যের শৃঙ্খলায়ও আন্‌তে পেরেছে। তা যদি না পারত, বহু সহস্র বৎসর স্বকীয় ধারায় তার অস্তিত্বই রক্ষা ক'রতে এদেশে পারত না। যে ব্রত গ্রহণ ক'রেছ হরদাস, মা জগদম্বার পায়ে মতি রেখো, ভক্তিতে আর নিবেদন ক'রে একমনে তাই পালন কর,—যখন যা প্রয়োজন হবে, 'মাই তার ব্যবস্থা ক'রবেন। কাজ তাঁর। তুমি আমি কে বাবা! নিমিত্ত মাত্র।"

প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া হরদাস কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন বাবা, তাই যেন পারি। আপনার আশীর্ব্বাদই আমার বল, উপদেশ আমার পথের আলো—তাই এই সংকল্প গ্রহণ ক'রে আপনার চরণ-প্রান্তেই উপনীত হ'য়েছি।"

"আশীর্ব্বাদ প্রাণ ভ'রে উঠ্‌ছে বাবা। উপদেশ—তোমাকে আর কি দেব বাবা! জানে তুমি বরং আমারই উপদেষ্টা হ'তে পার, উপদিশ্য আর নও। সমর্থন আমার সর্ব্বদাই পাবে। তবে বৃদ্ধ হ'য়েছি, কার্য্যতঃ সহায়তা কিছু ক'রব সে সামর্থ্য আর নাই।"

একটু থামিয়া হরদাস কহিলেন, "একটি দাবী কিন্তু ক'রব বাবা। আশ্রমের জন্য যে স্থান পেয়েছি শীঘ্রই মায়ের একটি মন্দির সেখানে প্রতিষ্ঠা ক'রবার ইচ্ছা। আয়োজন সব হ'লে ক্রিয়াটি আপনাকে গিয়েই সম্পাদন ক'রতে হবে।"

"ক'রব। ক'রে কৃতার্থই হব।"

"হাঁ, আর মধ্যে মধ্যে যখন আপনার সুবিধে হয় আশ্রমে গিয়ে আপনি থাকবেন—আপনার দুটি মুখের কথা, পায়ের ধূলা, আপনার সান্নিধ্য—এই কল্যাণ আমার ঐ আশ্রমবাসিনীদের সাধন ক'রবে।"

"থাকব, মনে ক'রব তীর্থবাসে আমিই কল্যাণের ভাগী হ'চ্ছি। হাঁ তোমার এই আশ্রমের স্থান কোথায় পেয়েছ?"

"আমার এই সংকল্পের কথা জেনে ধনী একজন শিষ্য ক'লকেতার নিকটেই প্রশস্ত একটি বাগানবাড়ী দান ক'রেছেন। দেশের এই দুর্গতিতে ধনবুদ্ধি সকলেই বড় শঙ্কিত ও বিচলিত হ'য়ে উঠেছেন। প্রতিকারের সমীচীন উপায়ে সহায়তা ক'রতেও অনেকে প্রস্তুত। কর্ম্মে যদি অগ্রসর হ'তে পারি, অর্থের অভাব আমার হবে না।"

গৃহমধ্য হইতে রটন্তী তখন আসিয়া গলবস্ত্রে উভয়কে প্রণাম করিলেন।

"কে! ও, এস মা। ব'স।"

রটন্তী একটু আড় হইয়া আড়ঘোমটা টানিয়া বসিলেন।

শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, "কাশী গিয়েছিলে শুন্‌লাম, কবে ফিরলে?"

সাষ্টাঙ্গে রটন্তী উত্তর করিলেন, "এই ত আজ সকালে বাবা।—তা, পথেই জ্বর হ'য়ে প'ড়েছে, এসেই অম্‌নি বিছানা নিতে হ'য়েছে। পাঠাতে কাউকে পারলাম না, লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকেই আস্‌তে হ'ল। কি ক'রব বাবা? দেরী ত আর ক'র্‌তে পারি না.—"

"তা, খবর কি মা?"

"খবর—তা এই লেখনটা নিয়ে এসেছি, প'ড়লেই সব বুঝতে পারবেন। আমার ননদকেও অনেক ক'রে ব'লেছিলাম, তুমি নিজে একটিবার চল। তা কিছুতেই এল না। শেষে এই লেখনটা চেয়ে নিয়ে এলাম, ভাবলাম আপনাকে এনে দেখাব, আপনি একটা বিহিত যা হয় ক'রবেন। বিন্দী এই সব কুকথা এসে গাঁয়ে রটিয়েছে—আর বেদবাক্যি ব'লে সবাই তাই ধ'রে নিয়েছে—আপনিও কোন্ না শুনেছেন সব—"

বলিতে একখানি পত্র আঁচলের খুঁট হইতে খুলিয়া রটন্তী শিরোমণি মহাশয়ের হাতে দিলেন। হরমোহনবাবু মন্দাকিনীকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাই রটন্তী লইয়া আসিয়াছিলেন।

"হাঁ, শুনেছি সব। তা বিশ্বাস ক'রতে প্রবৃত্তি হয় নি মা।"

বলিয়া পত্রখানি শিরোমণি মহাশয় পড়িলেন—পড়িয়া হরদাসের হাতে দিলেন। পড়িয়া হরদাস কহিলেন, "হুঁ—! তা এই কন্যাটি কে? ঘটনাটাই বা কি?"

শিরোমণি মহাশয় লতার পরিচয় দিয়া ঘটনা সব সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। পত্রখানি আর একবার পড়িয়া হরদাস কহিলেন, "কিন্তু যে সব কারণ ইনি দেখিয়েছেন, বিবাহ ত তাতে অসিদ্ধ হয় না। হয় কি?—আপনি কি বলেন বাবা?"

শিরোমণি কহিলেন, "কি ক'রে হ'তে পারে বুঝ্‌তে পারছি না. নান্দীমুখ, কুলাচার, স্ত্রী-আচার—এসব বিবাহের আনুষঙ্গিক ক্রিয়া মাত্র, অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। নান্দীমুখে আভ্যুদয়িক ক্রিয়া কল্যাণকামনায় পরলোকগত পিতৃপুরুষবর্গের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হয়। কুলাচার, স্ত্রী-আচার—এসব উৎসব-সৌষ্ঠবের অলঙ্কার মাত্র। বিবাহের কর্ত্তা বর, পিতার অনুমোদন সামাজিক আচারে বাঞ্ছনীয় যতই হ'ক, প্রাপ্তবয়স্ক বর যদি তার অপেক্ষা না ক'রেও বিবাহ করে, ক্রিয়া অঙ্গহীন কি অসিদ্ধ হয় না—যদি সেই ক্রিয়াটি তার বিধিমত সম্পন্ন হ'য়ে থাকে। হাঁ মা,—বিবাহ ত অনেক দেখেছ, ভাল ক'রে সব খবর নিয়েছিলে যা যা ক'র্‌তে হয়, সর্ব্বদা হ'য়ে থাকে—"

"সব খবর নিয়েছি বাবা। ছেলে নান্দীমুখ ক'রেছেল কি না, ওরা জানে না। তবে ওদের বাড়ীতে কিছুই বাদ যায় নি—দধিমঙ্গল থেকে অধিবাস, নান্দীমুখ, চূড়ো, কন্যাদান, গঙ্গাপূজো সব হ'য়েছে; ধোপা নাপিত তাদের কাজ যা সব ক'রেছে। রেতে বিয়ের সময় আমার নন্দাই নিজে সম্প্রদান ক'রেছেন, পুরুত মন্তর ব'লেছে, নাপিত পৌরবচন আউড়েছে, হোম সপ্তপদীগমন সব হ'য়েছে। শালগ্রাম ছিলেন, সহরের সব ভদ্দর লোকও সভায় এসে ব'সেছিলেন।"

হরদাস কহিলেন, "তবে ত ক্রিয়া পূর্ণাঙ্গভাবেই সম্পন্ন হ'য়েছে।"

শিরোমণি কহিলেন, "হাঁ,—এক আপত্তি তুলেছেন নাম। নাম-করণে বিধিমত যে নামটা রাখা হয়. সেইটেই বৈধ নাম, দৈব-পৈত্র্যাদি সকল কর্ম্মে সেই নামই ব্যবহার ক'রবার বিধি আছে।"

"কিন্তু রীতিতে এ বিধি আজকাল অনেকে মেনে চলে না। যার যেমন খুসী নাম বদলে ফেলে। কেবল পরিচয়ে নয়, ক্রিয়াকর্ম্মাদিতেও সেই নূতন নাম ব্যবহার করে। কোনও ক্রিয়া তাতে অসিদ্ধ হ'ল বলে কেউ মনে করে না। তারপর এক্ষেত্রে বর এসে কন্যা প্রার্থনা ক'রেছে,—যে নামেই সে পরিচয় দিক, কন্যাকর্ত্তা তার জন্য দায়ী হ'তে পারেন না। সরল বিশ্বাসে ধর্ম্মতঃ তিনি কন্যা দান ক'রেছেন।"

"হাঁ,—এটা যদি ত্রুটিই কিছু হয়, ত্রুটি হ'য়েছে বরের পক্ষে, জ্ঞাতসারে কন্যাকর্ত্তার পক্ষে কিছু হয় নাই। সুতরাং বিবাহ অসিদ্ধ হ'তে পারে না।"

একটু ঘুরিয়া দুটিহাত জোড় করিয়া রটন্তী তখন কহিলেন, "তাহ'লে বাবা, দুজনেই মহাপণ্ডিত আপনারা উপস্থিত র'য়েছেন, একটা বিহিত এর ক'র্‌বেন না? এই যে অনাথা একটা মেয়ে এই কলঙ্কের ভাগী হ'য়ে র'য়েছে, আর লোকে যা না ব'ল্‌তে আছে, তাই ব'ল্‌ছে—"

"না না, বিহিত যা দরকার এর ক'র্‌তেই হবে। হাঁ, প্রমাণ সব উল্লেখ ক'রে ওদের ছল-যুক্তি কাটিয়ে ব্যবস্থাপত্র একটা লেখ হরদাস। আমি স্বাক্ষর ক'রব, তুমি স্বাক্ষর করবে, আরও কাছাকাছি পণ্ডিত যাঁরা আছেন, তাঁদেরও স্বাক্ষর নিচ্ছি। আজই বিকেলে সবাইকে ডাক্‌ব। এই ভদ্রলোকের এই পত্র, আমাদের এই ব্যবস্থা সকলকে প'ড়ে শোনাব, ঘোষণা ক'রব, মা মন্দাকিনীর এই কন্যাটি কোনও প্রকারে কলঙ্কের ভাগিনী কিছু হয় নাই, তার বিবাহ সিদ্ধ বিবাহ হ'য়েছিল, এই ভদ্রলোকের বৈধ কুলবধূ সে। তিনি তাকে গ্রহণ করুন, কি ত্যাগ করুন, তাঁর কুলবধূত্বের মর্য্যাদায় তাকে বঞ্চিত ক'রে রাখ্‌তে পারেন না।"

হরদাস কহিলেন, "আজ এই গ্রামে এই সভায় এই ঘোষণা হ'ক্‌, এই ব্যবস্থাপত্র আমি নিয়ে যাব, আরও বড় বড় পণ্ডিতদের স্বাক্ষর নেব। চুঁচড়োয় গিয়ে—বেশীদিনকার কথা ত নয়—দ্বারকানাথবাবুর পরিচিত ভদ্রলোক যাঁরা আছেন, তাঁদের ঠেঁয়ে বিবাহ সভায়ও উপস্থিত ছিলেন, অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গতা সম্বন্ধে লিখিত প্রমাণ সংগ্রহ ক'রব। তারপর এই হরমোহনের সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রব। দেখব, তিনিই বা কি ক'রে বিবাহের বৈধতা স্বীকার না ক'রে পারেন, ত্যাগই বা কি ক'রে তার কূলবধূকে ক'র্‌তে পারেন।—হাঁ, এই কন্যাটি এখন কোথায় আছে?"

রটন্তী কহিলেন, "সেই ত বাবা, শুন্‌লেন ত ওঁর ঠেঁয়ে সব—সেই যে কোথায় পালিয়ে গেছে, ঠিকেনা কিছু পাওয়া যায় নি। কাশীতে মাকে চিঠি লিখেছে—ভাল যায়গায়ই আছে কি কাজেকর্ম্মে পয়সা-কড়িও মন্দ পাচ্ছে না, শীগ্‌গির তাদের ক'ল্‌কেতায় আনতে পারবে। লিখেছে, ঠিকেনা এখনও জানাতে পারছে না, লুকিয়েই আর কদ্দিন থাক্‌তে হবে।—ক'লকেতায় নাকি আঁতুড়ে পোয়াতীদের সেবা শুশ্রূষা ক'রে বেশ পয়সা রোজগার অনেক মেয়ে করে—'নার্‌সি' কি বলে তাদের—"

"বটে!"

থামিয়া কেমন একটা আশার উৎফুল্ল দৃষ্টিতে হরদাস কহিলেন, "এই কন্যাটিকেই বোধ হয় আমি দেখেছি তবে!"

"দেখেছেন! কোথায় বাবা, কোথায়? কবে?"

"এই ত ক'দিন আগে কল্‌কেতায় আসন্নপ্রসবা আমার একটি শিষ্য-কন্যার কাছে। অতি সুবুদ্ধি ব'লে মনে হ'ল। এই গ্রামেও সে ছিল, আপনাকেও চেনে বাবা। নামটা কি ব'ল্লেন তার?"

রটন্তী উত্তর করিলেন, "লতা।"

"লতা।—সে ব'লেছিল কনকলতা।"

"সেই তার পুরো নাম বাবা। তবে আমরা লতা ব'লেই তাকে ডাকি।"

"হাঁ, হাঁ,—ঐ পত্রখানাতেও কনকলতা ব'লেই নামের উল্লেখ আছে বটে। আর কথা নেই মা! সেই কন্যাটিই এই। আর ভয় নেই মা—নিশ্চিন্ত হ'য়ে আপনারা থাকুন—তার সব ভার আমিই গ্রহণ ক'রলাম। আজ থেকে সে আমারই মেয়ে—শীঘ্রই সংবাদ পাবেন, তার শ্বশুর তাকে তাঁর কুলবধূর মর্য্যদায় গ্রহণ ক'রেছেন।"

লুটাইয়া হরদাসের ও শিরোমণি মহাশয়ের পায়ে প্রণাম করিয়া সাশ্রুনয়নে গদ্‌গদকণ্ঠে রটন্তী কহিলেন, "কি আর ব'লব বাবা—অবোধ একটা মেয়েমানুষ আমি—কথাই বা কি জানি? ম'রে ছিলাম, আজ প্রাণ দিয়ে আমাদের বাঁচালেন। আর ঐ যে লতি—কি ব'লব বাবা, অমন মেয়ে ভূভারতে আর হয় না। কি দুঃখটাই পেয়েছে, কি মুখ ছোটই না তার হ'য়েছে, আর লোকে কি না তাকে ব'ল্‌ছে! হাঁ বাবা, বিকেলে তবে আজ সভাটা হবে ত?—কাণে শুন্‌তে পাব ত সবাই ব'ল্‌ছে, হাঁ, লতি আমাদের সতীলক্ষ্মী মেয়ে—অগ্নিপরীক্ষার মা জানকী!"

"পাবে, পাবে মা—শান্ত হও, কেঁদোনা! আজ বিকেলে এখানে সভা হবে—সবাইকেই ব'লতে হবে লতা আমাদের সতীলক্ষ্মী মেয়ে, সত্যই অগ্নিপরীক্ষার মা জানকী।—এসো, বৈকেলে যখন সভা হবে তখন এসো, নিজের কাণেই সভার ঘোষণা, উত্তরে সামাজিকদের মুখে 'সাধু' 'সাধু' ধ্বনি শুনে যেও। যোগেশ যদি পারে কোনও মতে তাকেও আস্‌তে ব'লো।"

"যে আজ্ঞে বাবা—তাহ'লে আসি এখন।"

"এস মা।"

ভূলুণ্ঠিতা হইয়া শিরোমণি মহাশয় ও হরদাস উভয়ের চরণপ্রান্তে প্রণাম করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে রটন্তী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। পথে অদূরে একবার বিন্দীকে দেখিয়াছিলেন, প্রতিবেশিনী যাহারা বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহাদেরও দুই একজন চক্ষে পড়িল। কিন্তু গিয়া কড়া দুটা কথা বলিবেন, ঝাঁটা মারিয়া বিন্দীকে গায়ের ঝাল মিটাইবেন, সে দর্পস্ফীতি চিত্তে তখন ছিল না, ঝালও তেমন কিছু গায়ে কিছু জ্বলিয়া উঠিল না।

রটন্তীতে মহাকালী চণ্ডী আজ মহাসরস্বতীরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন!

৩৮

হরমোহনবাবুর পত্রখানা হরদাস সঙ্গে লইয়া গেলেন। প্রথমেই চুঁচড়ায় গিয়া যথাপ্রয়োজন প্রমাণাদি সংগ্রহ করিলেন। তার পর ভট্টপল্লী ও নবদ্বীপ গিয়া ব্যবস্থা পত্রে প্রধান কয়েকজন পণ্ডিতের স্বাক্ষর লইয়া সাত আট দিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। দুইজন শিষ্যের উপরে ভার ছিল; আশ্রমের জন্য যে বাড়ীটি পাইয়াছিলেন, যথা প্রয়োজন সংস্কারের পর তাঁহার নির্দ্দেশমত যথাযোগ্যভাবে তাহারা সেটিকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কর্ম্মভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রবীণ-বয়স্কা বিধবা দুইজন শিষ্যা আসিয়াও গুরুদেবের অপেক্ষা করিতেছিলেন। হরদাস সেইখানে গিয়াই উঠিলেন, বন্দোবস্ত সব দেখিয়া বেশ প্রীতও হইলেন। বৈকালে গিয়া ফুল্লরার সংবাদ নিলেন।—লতাকে

কিন্তু তখন বলিলেন না, কেবল কহিয়া একটু হাসিলেন।—লতা আসিয়া প্রণাম করিল, মাথায় হাতখানি রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "সৌভাগ্যবতী হও মা।"

একটু হাসিয়া লতা কহিল, "আমার সব সৌভাগ্য বাবা, এখন আপনার চরণে একটু আশ্রয়।"

"আমারও সৌভাগ্য মা, তোমার আশ্রয়। ছেলেকে মনে রেখো মা।"

"মনে যে আপনার পা দুটি ধ'রে সেদিন থেকে পূজো ক'রছি বাবা! আপনিই এখন আমার ইষ্টদেবতা।"

"তোমার ইষ্টদেবতা তোমার স্বামী—আর কাউকে সে আসন দিতে নাই মা।"

ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া লতা কহিল, "তাঁর আশ্রয় এ জীবনের মত হারিয়েছি বাবা। আপনাকে লুকোবার মত কিছু আমার নেই—তিনি—তিনি আমায় ত্যাগ ক'রেছেন।"

চক্ষু দুটি ছল ছল হইয়া উঠিল। সুস্মিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া হরদাস কহিলেন, "তবু তিনিই তোমার ইষ্টদেবতা মা।—এদেশের মেয়ে তুমি, প্রাচীন আচার্য্যদের এই উপদেশটি সর্ব্বদাই মনে রেখো।"

"যে আজ্ঞা বাবা।"

হরদাস কহিলেন, "তোমার মাকে এখন এখানে আনাতে পার মা। একখানা চিঠি লিখে দেও, আমি লোক পাঠাচ্ছি। গিয়েই তাঁকে আর তোমার খোকামণিটিকে নিয়ে আস্‌বে।"

আঁচলে চক্ষু মুছিয়া লতা কহিল, "কোথায় এসে তাঁরা থাক্‌বেন?"

"আমাদের আশ্রমে।"

"আশ্রম—আশ্রম কি হ'য়েছে বাবা?"

"হাঁ, মায়ের কৃপায় আশ্রয় নেবার মত একটা যায়গা হ'য়েছে। বিধবা দুটি শিষ্যা সেখানে গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে বেশ এসে উনি থাক্‌তে পারবেন। তার পরে তুমি নিজে র'য়েছ—"

"আমি ত ফুলুকে ছেড়ে এখুনি যেতে পারছি নি বাবা!"

"ফুলুকে নিয়েই যাবে। সেই যে হবে মা আমার প্রথম আশ্রম-বাসিনী শিষ্যা।—কেমন, কবে যেতে পারবে মা ফুলু?"

সূতিকা শয্যার এক পাশে ফুল্লরা বসিয়াছিল; নতমুখে উত্তর করিল, "যে দিন আদেশ করেন বাবা।"

শিশুটি তখন মোড়ামুড়ি দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"দেখি—দেখি, দাদুটি আমার কেমন হ'য়েছে? হাঁ—বেশ।"

কাছে গিয়া শিশুর মাথায় হরদাস হাতখানি রাখিলেন!—মুখখানি একটু ফিরাইয়া মৃদুস্বরে ফুল্লরা কহিলেন, "এখনও আঁতুড়ের অশৌচ কাটে নি বাবা—"

হাসিয়া হরদাস কহিলেন, "সন্ন্যাসীর এ সব শৌচাশৌচ কিছু নেই মা।—হাঁ, চিঠিখানি তবে লিখে দেও মা, আজ সন্ধ্যায়ই আমি লোক পাঠাব, ঠিকঠাক ক'রেই রেখে এসেছি।"

লতা চিঠি লিখিয়া দিল—লইয়া হরদাস বিদায় হইয়া গেলেন।

পরদিন সকালেই হরদাস হরমোহনবাবুর সঙ্গে গিয়া দেখা করিলেন। শিবকিঙ্কর শিরোমণি প্রমুখ বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত সেই ব্যবস্থাপত্র এবং চুঁচড়ায় যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সব তাঁহার হাতে দিলেন। পড়িয়া হরমোহনবাবু বিস্ময়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। বিস্ফারিত নেত্রে নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আপনি—আপনি—কে বাবা!—"

"আপাততঃ আপনার এই বধূটির অভিভাবক—নাম শ্রীহরদাস দেবশর্ম্মা।—"

"অভি—ভাবক! হরদাস দেবশর্ম্মা—দেখেছি আপনাকে কোথায়—কোনও সভায় বোধ হয়।—আপনি—আপনিই কি সেই ঠাকুর হরদাস?"

একটু শির নোয়াইয়া করযোড়ে হরদাস কহিলেন, "আজ্ঞে ঐ নামেও অনেকে আমার কথা উল্লেখ ক'রে থাকেন।"

উঠিয়া হরমোহনবাবু প্রণাম করিলেন।

"জয়োহস্তু। তাহ'লে—সব ত দেখ্‌লেম। এখন আপনার অভিপ্রায়—"

"অভিপ্রায়! অভিপ্রায়ের কথা আর কি ব'লব ঠাকুর? এই-ই আমি চাইছিলাম—কি যে আগ্রহে এই ক'দিন চাইছিলাম, সে আর ব'ল্‌তে পারি না। কোনও আপত্তি দূর থাক্‌, মেয়েটিকে আমার কুলবধূ ব'লে গ্রহণ ক'রবার জন্যে অতি ব্যাকুল হ'য়েই উঠেছি আমি। বাইরে এই অমর্য্যাদায় তাকে আর রাখ্‌তেই পারছি না। সে তার চরিত্র-মহিমায় মনটাকে আমার জয় ক'রে নিয়েছে। ছেলেটিকে আর শেষে যে বউটিকে ঘরে এনেছি, তাদেরও হারাতে ব'সেছি। তবে সত্যি ব'লছি ঠাকুর, মনে সত্যিকার একটা খুঁৎখুঁতি আমার ছিল, বিবাহটা সিদ্ধ বিবাহ হয় কি না। ভাব্‌ছিলাম, বড় কোনও কোনও পণ্ডিতের ব্যবস্থা নেব, যাঁরা কোনও খাতিরে নয়, অর্থলোভে নয়, কেবল শাস্ত্র-বিধির নির্দ্দেশে, সরল শুদ্ধ মনে তাই বিচার ক'রে আমাকে দেবেন। আজ সেই ব্যবস্থা অযাচিত ভাবে দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই আপনা-থেকে পেলাম। এর পর কি আর কথা আছে কিছু? আজ সকল দ্বিধাশূন্য হ'য়ে পরিষ্কার সরল মনে এই কন্যাটিকে আমার কুলবধূত্বে আমি গ্রহণ ক'রলাম। আর আপনার কথা কি—কি ব'লব বাবা—এ ঋণ জীবনে কখনও শুধতে পারব না।"

"যার পর নাই আনন্দিত হ'লাম বাবা—আমার মাকে আজ তাঁর কুলমর্য্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'র্‌তে পারলাম—যা সে বিনা অপরাধে হারিয়েছিল।"

চক্ষু দুটি মুছিয়া হরমোহনবাবু কহিলেন, "আমি গ্রহণ ক'র্‌লাম। কিন্তু মা আমাকে গ্রহণ ক'রবেন কি না, ঘরের লক্ষ্মী হ'য়ে আমার ঘর আলো ক'রে এসে ব'সবেন কি না জানি না।"

"কেন এসে ব'স্‌বেন না? বাধা ত আর কিছু দেখ্‌তে পাই না।"

"তাহ'লে—দেখুন তার এই পত্রখানা"—বলিয়া দেরাজ খুলিয়া লতার সেই পত্রখানা হরমোহনবাবু ঠাকুর হরদাসের হাতে দিলেন। পড়িয়া হরদাসের চক্ষু দুটি ছল ছল হইয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "হুঁ!—তা—মার কি ইচ্ছা এখন হবে ব'ল্‌তে পারি

না।—স্বেচ্ছায় মনের টানে যদি না আসেন, বাধ্য তাঁকে আমি ক'রতে পারব না।—"

একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া হরমোহনবাবু কহিলেন, "বেশ বুঝতে পারছি ঠাকুর, তার কোনও অনুরোধে কি আগ্রহে নয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়েই আপনি এই ব্যবস্থা, এই সব প্রমাণ, সংগ্রহ ক'রেছেন। জানিনা বাবা, কোথায় কোন্ সূত্রে কি ভাবে তার সঙ্গে আপনার এই পরিচয় আর এত বড় ঘনিষ্ঠ একটা স্নেহের সম্বন্ধ ঘ'টেছে।"

সংক্ষেপে হরদাস লতার সঙ্গে সাক্ষাতের পর নন্দগ্রামে গিয়া যাহা সব জানিতে পারিয়াছিলেন, সব বিবৃত করিলেন। তারপর কহিলেন, "তাহ'লে আজ উঠি বাবা—মাকে গিয়ে সব বলি, তিনি কি বলেন শুনি, তারপর আপনাকে সংবাদ দেব।"

"যে আজ্ঞে।"

উঠিয়া হরমোহনবাবু হরদাসকে প্রণাম করিলেন।

৩৯

আশ্রমে ফিরিয়া আহারাদির পর বৈকালের দিকে হরদাস গিয়া লতাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন, তাহার মাতুল-মাতুলানীর কথা, শিরোমণি মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে যে ঘোষণা হয়, সব বিবৃত করিলেন। আড়ষ্ট হইয়া কিছুক্ষণ লতা বসিয়া রহিল, তারপর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, কাঁদিয়া সে হরদাসের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। নিঃশব্দে হরদাস তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া লতা উঠিয়া বসিল, ধীরে ধীরে কহিল "আপনি এখন কি আদেশ করেন বাবা?"

"আদেশ।—কি আদেশ আর করব মা? তোমার স্বামী তোমাকে চাইছেন, শ্বশুর তার কুলবধূত্বে গ্রহণ করছেন, আকুল হ'য়েই উঠেছেন, আমি তার কি আদেশ ক'রব মা?"

লতা উত্তর করিল "আমার বাসনা যা ছিল পূর্ণ হ'য়েছে, বাবা। ছেলেটিকে তাঁরা তাঁদের ঘরের ছেলে ব'লে ঘরে নেবেন, এই-ই আমি চেয়েছিলাম, আর কিছু নয় বাবা। এখন ইলার কোলে তাকে তুলে দিতে পারলেই কৃতকৃতার্থ আমি হব। আর ত কোনও বাসনা—সংসারে আর কোনও স্পৃহা ত—আমার নাই বাবা।"

"হুঁ—দেখেছি মা, তোমার পত্রখানা। তেমোর শ্বশুরের কাছেই ছিল, বের ক'রে তিনি দেখালেন।"

"তাহ'লে আর কি ব'লব বাবা? আমার সে সংকল্প, সত্য সংকল্প ব'লেই গ্রহণ ক'রেছিলাম, অনেক ভেবে মনটাকেও বেশ বুঝে নিয়ে। ত্যাগ ক'রতে যে আজ পারছিনি। দয়া করুন বাবা, আপনার এই মহাব্রতে ব্রতচারিণী একজন শিষ্যা ব'লে আমাকে গ্রহণ করুন, আর কোনও কামনা জীবনে আমার নাই।"

"ভাল, স্বামীর অনুমতি আগে নেও। তিনি তোমার গুরু, আর তাঁর গুরু তোমার শ্বশুর। দুজনেরই অনুমতি আগে নেও। যদি পাও, আমার ব্রত সহকারিণী শিষ্যা ব'লে আনন্দে তখন তোমায় গ্রহণ ক'রব।"

"অনুমতি—পাব ত বাবা?"

"পাবে। কেন পাবে না? প্রাণের আগ্রহে যদি চাও, অবশ্য পাবে।"

একটু কি ভাবিয়া লতা কহিল "বড় লজ্জা করে বাবা। কি ব'লব? কি ব'লে চাইব? আপনি—আপনি—আমার এই নিবেদন একটিবার গিয়ে যদি তাঁদের জানান—"

"বেশ, তাই জানাব মা।"

"তারপর একটি দিন দয়া ক'রে যদি তাঁরা আশ্রমে আসেন—"

"তাঁরা আসবেন—কেন, তুমি নিজে যাবে না?"

"এসে না নিতে চাইলে যেচে কি যেতে পারি বাবা? আপনিই কি মেয়েকে তাই পাঠাতে পারেন?"

একটু হাসি লতার মুখে ফুটিল।—হরদাসও হাসিয়া উঠিলেন।

"হাঁ, ঠিক ব'লেছ মা! সে ত পারিই না। আচ্ছা, আর একবার কাল সকালেই তোমার শ্বশুর বাড়ী।"

চরিত্রমহিমার পরিচয় পাইয়াছিলেন, পত্রখানা পড়িয়াও সকলে বুঝিয়াছিলেন, আজ আবার ঠাকুর হরদাসের মুখেও সকলে শুনিলেন। আপত্তি কেহই কিছু করিলেন না, স্পষ্টই সকলে বুঝিলেন সাক্ষাৎ দেবশক্তি-রূপা এই নারীকে কোনও অধিকারে, বিধির কোনও বাঁধনে ধরে আনিয়া তাঁহারা বাঁধিয়া রাখিতে পারেন না।

মন্দাকিনীও আসিয়া পৌঁছিলেন। সব শুনিয়া কতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন; শেষে কহিলেন, "তুই হ'লি সন্ন্যাসিনী, ছেলেটিকে দিয়ে দিবি পর ক'রে পরের হাতে। কোন্ সুখে, কিসের বন্ধনে আছ এখানে থাকব মা? কাশীতেই ফিরে যাই। বাবা বিশ্বনাথ আছেন, তাঁর দয়াই এখন আমার শেষ জীবনের সম্বল। তবে মুখখানি যেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই মা।"

লতা কহিল, "জোর ক'রে তোমায় ধ'রে রাখতে চাই না,—যদি ইচ্ছে হয়, তাই যেও। মাঝে মাঝে এসো—আমিও যখন পারি যাব। কিন্তু কোথায় থাক্‌বে?"

চক্ষু মুছিয়া মন্দাকিনী উত্তর করিলেন "ঐখেনেই থাকব। কোথায় আর যাব? উনিও ছাড়তে চান না—বলেন, তুই আমার মেয়ে, বুড়ী মাকে একেবারে ত্যাগ ক'রে গিয়ে থাকিস্ না। আমার যে কেউ আর এ ধরাধামে নেই।"

"তাই তবে থেকো। তবে যাবার আগে মামারবাড়ী একবার হ'য়ে এস। মামীমার সঙ্গে দেখা ক'রে সব তাঁকে ব'লো, আর বড় দরদের যে আমাদের আর কেউ নেই মা।"

"যাব, তোকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"যাব, তাঁকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে আসব।"

দিন একটা স্থির হইল। লতার শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী ও ইলা সকলেই আসিলেন।

বিরিঞ্চি ও ইলা আসিয়া বসিল—স্বামীকে প্রণাম করিয়া ইলার কোলে ছেলেটিকে তুলিয়া দিয়া লতা কহিল, "আজ থেকে ও তোমারই

ছেলে বোন্। নিজের ঘরে মার কোলে আজ ও ঠাঁই পেল, কোনও দুঃখ, কোনও আকাঙ্ক্ষা আমার আর নেই দিদি।"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে ইলা কহিল, "দিদি, কোলে তুলে ওকে নিলাম, বুকে ধ'রে রাখব। ওর বড় কেউ আর আমার হবে না। কিন্তু দিদি—দিদি—আর ব'লতে পারছিনি—ব'লবারও কিছু নেই—কিন্তু তুমি—তুমি—এ কি ক'রলে দিদি?"

ধীরভাবেই লতা উত্তর করিল, "মাথার উপরে ধর্ম্ম আছেন দেবতা আছেন। যেমন মাথার ওপরে, তেমন বুকের ভেতরও আছেন। যা তাঁরা করিয়েছেন, তাই ক'রেছি। আর যে কিছু ক'রবার যো নেই বোন্! কেঁদো না কিছু, কেঁদো না, মন শান্ত কর। এতেই মঙ্গল হবে, তোমার মঙ্গল হবে, আমার মঙ্গল হবে—ওঁরও মঙ্গল হবে।"

বিরিঞ্চি কহিল, "কি হবে ভগবান্ জানেন। মঙ্গল যদি তোমার প্রার্থনায় হয়, ভাল। না হয় ক্ষতি নেই। মঙ্গলামঙ্গলের কথাও কিছু আজ ভাবতে পারছিনি লতা। ব'লবার আমার কিছুই নাই, প্রস্তুত হ'য়েই এসেছি। কেবল—কেবল—একটি প্রার্থনা—তোমার ক্ষমা—"

"ক্ষমা! কেন ও কথা বলছ? কি ক্ষমা ক'রব?—অপরাধ ত তোমার কিছু হয়নি। যে ক'দিন তোমাকে পেয়েছিলাম, প্রাণের যে পরিচয় পেয়েছিলাম, তাতে কখনও মনে ক'রতে পারিনি, ফাঁকি দিয়ে তুমি যেতে পার, স্বেচ্ছায় আমাকে ত্যাগ ক'রতে পার।—তবে দোষ দুর্ব্বলতা মানুষ মাত্রেরই আছে,—আমারও আছে। দুঃখ হয়েছে, রাগ হ'য়েছে, অভিমানও হ'য়েছে। তবে মনকে এই ব'লে বুঝিয়েছি ভাগ্যে যা আমার ঘটল, সব আমারই কর্ম্মফল। তুমি—তুমি তার নিমিত্ত মাত্র। একটি যা বড় ব্যথা ছিল, ভাবনা ছিল, ঐ ছেলেটা। তাও ঘুচে গেল। তোমাদের ঘরের ছেলে, ঘরে তোমরা নিলে,—আর কোনও দুঃখ, কোনও ভাবনা আমার আজ নাই। অনুমতি পেয়েছি, আজ আশীর্ব্বাদ কর, যেন পারেন—এই ব্রতের ধর্ম্ম আমি পালন ক'রতে পারি।"

বলিয়া জননীর চরণে লতা প্রণাম করিল। চক্ষু দুটি বিরিঞ্চি মুছিল; উত্তরে কোনও কথা আর মুখে ফুটিল না।

হরমোহনবাবুও কমলিনী তখন গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিরিঞ্চি ও ইলা উঠিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মাথার কাপড় টানিয়া লতা শ্বশুরশাশুড়ীকে প্রণাম করিল।

হরমোহনবাবু কহিলেন, "কল্যাণ হ'ক মা। সবই শুনেছি, কিছু আর আমাদের ব'লবার নাই। বড় দুঃখ আজ, ঘরে তোমাকে পেলাম না। কি ক'রব মা? আমার দুর্ভাগ্য, কর্ম্মফল, নইলে এমন রত্ন পেয়েও হারালাম! তা সে যাই হ'ক মা, যেখানেই থাক, যে ব্রতেই জীবন যাপন কর, আমারই ঘরের বউ তুমি, আমার ঐ বংশধরের মা, এ গৌরব আমার চিরদিনই থাক্‌বে।"

বলিয়া ইলার কোল হইতে ছেলেটিকে নিজের কোলে তুলিয়া নিলেন।

লতা নীরব। কমলিনী কহিলেন, "একটিবার তোমার ঘরে যাবে না মা। আজ এসেছি—যাবে আমাদের সঙ্গে?"

হাতজোড় করিয়া লতা কহিল, "আজ পারবনা মা,—বড় লজ্জা করে। যাব বই কি, যখন ইচ্ছে হয় যাব, যখন ডাকবেন্ যাব। না গিয়ে কি পারব মা?—তবে আজ পারছি না।"

"ভাল, নাই গেলে তবে আজ।—তবে যেও, সর্ব্বদাই যেও,—যাবে বই কি? না গিয়ে পারবে কেন? বড় টান যে তোমার ঐ ঘরেই রইল।—"

বলিয়া পৌত্রটিকে স্বামীর কোল হইতে নিজের কোলে লইলেন।

হরমোহনবাবু কহিলেন, "কিন্তু একেবারে নিঃস্ব ক'রে তোমাকে যে বিদায় ক'রে দিতে পারি না। তোমার সব দাবী মেনে নিলাম, আমার এই একটা দাবীও তোমাকে মেনে নিতে হবে। যে সম্পত্তি তোমার নামে লিখে দিয়েছিলাম—"

লতা কহিল, "আমার যে প্রয়োজন কিছু আর নাই বাবা। সম্পত্তি—ভাল, এই আশ্রমে দিয়ে দিন, তাতেই আমার পাওয়া হবে।"

"ভাল, তাই তবে দেব মা। সিদ্ধি তোমার হ'ক, কল্যাণ হ'ক! তোমার এই সিদ্ধিতে, কল্যাণে, দেশের কল্যাণ হ'ক, জগতের কল্যাণ হ'ক, আজ সরল প্রাণে এই আশীর্ব্বাদ তোমাকে ক'রে যাচ্ছি মা!"

সম্পূর্ণ

সিক্তা

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়

১

বরষা-সজল আগমনী সুরু
হল গো
খোল হৃদয়ের রুদ্ধ কবাট
খোল গো।
জাগিল প্রকৃতি সরসা
এসেছে এসেছে বরষা
আজি গগনের গুরু গম্ভীর
শাসনে
সাজিল ধরণী ধূসর ধূম্র
বসনে,
নাহি বিরহীর ভরসা
এসেছে এসেছে বরষা

২

কেয়া চম্পক ব্যস্ত ব্যাকুল
উতলা
গন্ধ-পাগল হৃদয়ের ভারে
উছলা
এসেছে অতীত-বয়না
চপল-চকিত-নয়না।
রিমি ঝিমি ভরা বাদল ব্যাকুল
স্বপনে
প্রেমের খেলনা শুধু ভাঙা-গড়া
গোপনে
নিরজনে ব্যথা-চয়না
চপল-চকিত-নয়না।

৩

গেয়ে যায় ঐ সজল গজল
গীতিকা
চরণ-চিহ্নে ব্যথিত কোমল
বীথিকা,
কদম-কেশর শিহরে
উদাসী কে আজি বিহরে,
পূবালি বাতাস হৃদয় দোলায়
সঘনে
প্রজাপতি শুধু ফিরে চায় মধু
লগনে
মধু মধুকর নিকরে
উদাসী কে আজি বিহরে !

৪

ঝর ঝর ঝর অশ্রু-সজল
কপোলা
শ্যাম তনু ঘিরি স্নিগ্ধ শ্যামল
নিচোলা,
বাঁকা ভুরুযুগে তড়িত
আবেশ-শীকর জড়িত
হৃদয়-দুয়ারে অচেনা-পথিক
এসেছে
জানি না কখন অন্তর তারে
ডেকেছে,
সুদূরে কি প্রেম গড়িত
আবেশ-শীকর-জড়িত।

৫

অজানা অচেনা হউক তবু সে
এসেছে
দীনের কুটীরে দীনতর সুখে
ভেসেছে
আননে তৃপ্তি ফুটেছে
প্রাণের শঙ্কা টুটেছে,
শূন্য-কুটীর ঝুরু ঝুরু ঝরা
বাদলে
ভয়াল নৃত্য বাজিছে মেঘের
মাদলে,
পবনে মাতন উঠেছে
প্রাণের শঙ্কা টুটেছে।

৬

সজ্জা নাহিক শুধু ফুলদল
ছড়ানো
সরম জড়িত পরাণের মধু
ঝরানো
তবু ভাল তার লেগেছে
খুশীর দীপ্তি জেগেছে,
আঁখিতে তাহার ভাষার আঁখর
সাজায়ে
চেয়েছে দরদী মুখপানে হিয়া
নাচারে,
সঞ্চিত বাণী জেগেছে,
খুশীর দীপ্তি লেগেছে !

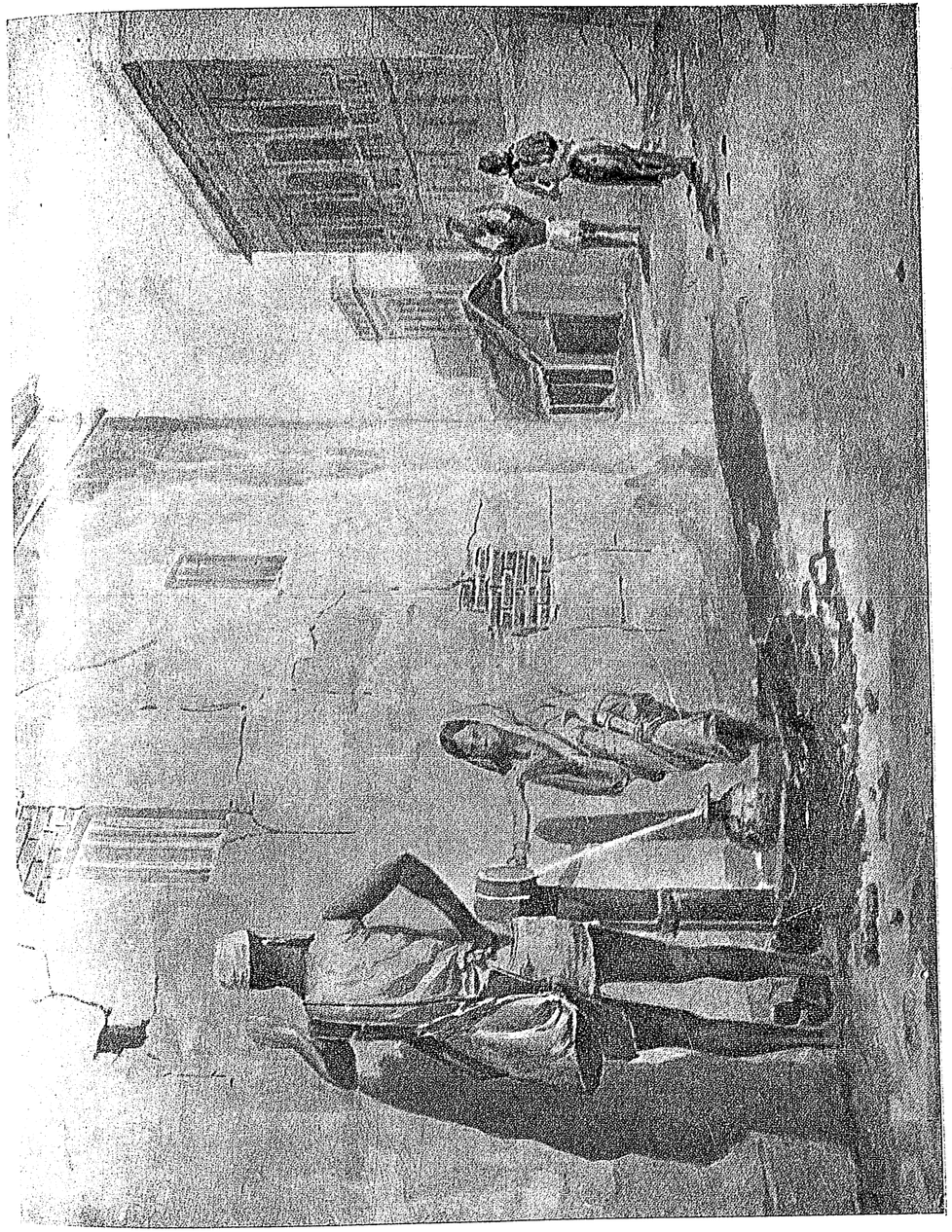

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

বারি-আহরণ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র দাস

ভূস্বর্গ-চঞ্চল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীমতী রাণী মৈত্র

স্নেহের রাণী,

তোমাকে চিঠি লিখিনি অনেক দিন। কারণ দর্শিয়ে বা সাফাই গাইবার ব্যর্থপ্রয়াসে চিঠির বহর বাড়ানোর প্রয়োজন দেখি না। সংসারের অশেষ ট্রাজিডির মধ্যে এই একটা সান্ত্বনা যে এই ঘোর কলিতেও এমন দু-চারজন মানুষের দেখা মেলে যারা ভুল বোঝে না। সুতরাং—

কী ঘ'টে গেল তুমি কাগজে পড়েছ, শোকসন্তপ্ত পরিবারকে স্বচক্ষে দেখেও এসেছ। তুমি ৺ধরণীদাকে জানতে খুবই ভালো ক'রে। তোমার গুণকীর্তনে তাঁর ক্লান্তি ছিল না—অর্থাৎ তিনিও জানতেন তোমাকে খুবই কাছ থেকে। কাশীতে তোমাদের শ্রীনিকেতনে ধরণীদা সপরিবারে ছিলেন তোমার কত যত্নপরিচর্যার মাঝে, সে কথাও তিনি যে কী ঘটা ক'রে বলতেন তা-ও তোমার অজানা নেই। তাই তুমি জানো যে, তিনি ছিলেন সেই প্রকৃতির মানুষ—বিরল মানুষ—যে সহজে কারুর কাছ থেকে কিছু চায় না, কিন্তু যা-ই কেন পাক্ না—ভোলে না। এই জীবনের বিধানে দুঃখাবহ শোচনীয় যোগাযোগের ঘাটতি নেই। তাদের মধ্যে একটি প্রধান দুঃখও এই যে, আমাদের মন অনেক কিছুই কত চায়, তবু পায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সমান সত্য যে, আমরা জীবনে অনেক কিছুই পাই যার কোনো হিসেব আমরা রাখতে শিখি না ব'লেই দৈনন্দিন লেন-দেনের ঠিক্ দেওয়ার সময়ে প্রায়ই না-পাওয়ার দিকটাই দেখি বড় ক'রে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়—আমরা অনেক "পাওয়াকেই" ঠিকমতন "পাই না" পাওয়াকে পাওয়া ব'লে চিনতে শিখি না ব'লে। এই স্বীকৃতি হ'ল প্রাণক্ষেত্রের সারবিশেষ—এ আমাদের চরিত্রকে উর্বর করে ব'লে। ধরণীদা জানতেন একথা। সেইজন্যেই প্রতি পাওয়ার অঙ্গীকার করতে তাঁর এত আনন্দ ছিল। আর সেই আনন্দের আলোয়ই তিনি প্রতি প্রাপ্তিকে ক'রে নিতেন তাঁর হৃদয়ের সদাসজাগ কৃতজ্ঞতাবৃত্তির নিকষে। এই কৃতজ্ঞতার চেতনা জীবনের একটা মস্ত চেতনা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়—কৃতজ্ঞতা হ'ল সাইকিক চেতনার আত্মপ্রকাশ। এখানে সাইকিক বলতে তুমি ভৌতিক কিছু বুঝবে না জানি, কেন না, তুমি শ্রীঅরবিন্দের পরিভাষা বেশ ভালো ক'রেই জানো। তাই তোমার কাছে ব্যাখ্যা করার নিশ্চয়ই দরকার নেই যে—কৃতজ্ঞতা একটি মস্ত সাইকিক গুণ বলতে শ্রীঅরবিন্দ বোঝেন এমন একটি গুণ যা আমাদের অন্তর্বিকাশের সহায়। ওয়র্ডস্‌ওয়র্থের সেই কাঠুরের ওপর কবিতাটি মনে পড়ে? এক বৃদ্ধ কাঠুরে গাছের শাখায় কোপ মারছিল, কিন্তু কাঠ কাটতে পারে না—স্থবির হস্ত দুর্বল। কবি যাচ্ছিলেন কাছ দিয়ে—এককোপে শাখাটি কেটে দিলেন তাকে উপহার। বৃদ্ধ কাঠুরে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল। সে কবিকে কোনো অনুরোধ করে নি, সহায়তার কোনো প্রত্যাশাই ছিল না—একথাও সত্য যে, কবির যৌবন-বলিষ্ঠ হস্তে শাখাটি কাটতে তাঁকে এমন কিছু ত্যাগ বা শ্রম স্বীকার করতে হয় নি। তবু কাঠুরের হৃদয়ের সাইকিক বৃত্তি জানান দিল নিজেকে। সে বলল—"এতে উপকারীর কতটা খর্চা হ'ল তা দিয়ে হবে না আমার জমার বিচার, আমি কতকটা পেলাম সেই নিয়েই আমার মাথাব্যথা।" কিছুদিন আগে একটি আত্মীয়াকে আমি লিখেছিলাম এই কথা যখন সে আমাকে লিখেছিল যে, তার কোনো লেখা আর একজন সংশোধন ক'রে দিয়েছে এজন্যে সে কোনো কৃতজ্ঞতার ঋণই স্বীকার করতে রাজি নয়—যেহেতু তার যুক্তি বলে যে, সে যখন এ-উপকার যাচ্ঞা করে নি তখন অযাচিত প্রাপ্তিকে স্বীকার করবার কোনো বাধ্যবাধকতাই তার রইল না। কথাটা যুক্তির দিক দিয়ে নিখুঁৎ বটে—কিন্তু তবু বলতেই হবে যে এ হ'ল গোণাগুন্তির চেতনা—স্বভাবকৃতজ্ঞতার যে-চেতনা তার শুধু ছন্দ আলাদা নয়—জাতই আলাদা। একথা লিখেছিলাম তাকে।

বলা বাহুল্য, লিখে ফল হয় নি—যেহেতু আমার এ-আত্মীয়া একে নব্যা তার ওপর স্বভাবে বুদ্ধিমতী, যুক্তিবাদিনী। কিন্তু এ তো যুক্তির কথা নয় ভাই। সংসারে বিচক্ষণ যুক্তির দাম যথেষ্ট—মানি, কিন্তু তাই ব'লে যদি বলি এ-পাথেয় আমাদেরকে খুব বেশি দূর নিয়ে যায়, তা হ'লে নিশ্চয়ই একটু বাড়াবাড়ি হবে। কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার যৌক্তিক হিসাব কিতাবের তীক্ষ্ণ শক্তি নয়—আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হ'ল আন্তর অনুভব-শক্তির গভীরতা ও গ্রহিষ্ণুতা। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের রাজ্যে, খুঁটিনাটি নিয়ে যে-মানুষ যত বেশি সচেতন সে-মানুষকে ততই উচ্চবিকশিত মানুষ বললে ভুল হবে না। কাজেই এ বিকাশের ফলে আমাদের নানান্ উজ্জ্বল আত্মবিকাশকে উচ্ছ্বাস ব'লে হেসে উড়িয়ে দিলে ঠকে সে-ই যে হাসে, সে নয় যে তুচ্ছ অঙ্গীকার নিয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। তোমার সম্বন্ধে ধরণীদার উচ্ছ্বাসকে তাই আমি "অত্যুক্তি" লেবেল দিয়ে নামঞ্জুর করতে পারব না; এমন কথাও বলতে পারব না যে, কৃতজ্ঞতা নিয়ে ঐ যে-বুদ্ধিমতী আমার কাছে খুব বিজ্ঞ যুক্তি দিয়ে তর্কে আমায় হারিয়ে দিল খতিয়ে সে-ই জিৎল। এতে শুধু প্রমাণ হ'ল তার হৃদয়বৃত্তি যথেষ্ট জাগে নি ব'লেই কৃতজ্ঞ হওয়া নিয়ে সে এত সাত-সতেরো টাকা-আনা-পাইয়ের ছক-কাটা সুরু করল। যার হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তির দাসত্ব করতে নারাজ সে-ই জানে অন্তরচেতনা মুক্তি পেলে সে কী আনন্দ মানুষের।

এবার শিলঙে ধরণীদার অতিথি হ'য়ে আমরা একথাটি বার বারই অনুভব করেছি তাঁর নিজের দৃষ্টান্তে। একটা উদাহরণ দেই।

শিলঙে আমরা ছিলাম এবার সদলবলে ধরণীদারা সপরিবারে আটজন—ধরণীদা, তাঁর স্ত্রী প্রভা দেবী, তাঁর দুই মেয়ে উমা ও রুণু, ছেলে বাবুল, দুই শ্যালক শীতাংশু ও শুভ্রাংশু, শালিকা লীলা—আর আমরা পাঁচজন—আমি, গিটার-তবলা বাদক বিখ্যাত জ্ঞান ঘোষ, স্বনামধন্য মীরাবল্লভ পাহাড়ি, মীরা ও আমাদের এক কিশোর বন্ধু লাটু ওরফে মণিময়। একুনে তেরজন। পাহাড়ি সস্ত্রীক ধরণীদার বাকায়দা অতিথি না হ'য়েও আসলে ছিল অতিথির বাড়া—সর্বদা আমাদের ওখানেই ওরা আসর সরগরম রাখত। পাহাড়িদের সঙ্গে ধরণীদার আগে আলাপ ছিল না বেশি—অনেকটা আমার সূত্রেই পরিচয়। কিন্তু পাহাড়ি যে উমার গানের উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করত এতে ধরণীদার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। শুধু তাই নয়, পাহাড়ি যে তাঁকে তার সঙ্গদান করত তার পরিবর্তে ওকে তাঁর স্নেহময় প্রাণের সমস্ত স্নেহটুকু দিয়েও তিনি যেন নিরন্তরই ঋণী বোধ করতেন। তাঁর চরিত্রের এই দিকটা আমার কাছে খুবই বড় মনে হ'ত—তিনি অপরকে যা দিতেন সে সম্বন্ধে ছিলেন যতটা নিশ্চেতন, অপরের কাছে যা পেতেন সে-সম্বন্ধে ছিলেন ঠিক সেই অনুপাতেই সচেতন। পাহাড়ির গুণের দিকটাই তিনি বড় ক'রে দেখতেন, ও যে প্রকৃতিতে দিলদরিয়া এতে কী যে খুশি! পাহাড়িকে কত যে খাওয়াতেন, বেড়াতে নিয়ে যেতেন, নিত্য তার কত আব্‌দার যে সইতেন দেখে এত ভালো লাগত যে কী বলব। শুধু তা-ই নয়, পাহাড়ি ও মীরাকেও তিনি প্রায় নিজের পরিবারভুক্তই ক'রে নিয়েছিলেন। এর মূল কারণ ছিল—প্রথম তাঁর সজাগ স্নেহশীলতা, দ্বিতীয় নিবিড় কৃতজ্ঞতাবোধ।

সংসারটা নেহাৎ কম দেখি নি ভাই। কিন্তু খুব কম লোককেই দেখেছি পরকে এত সহজে আপন ক'রে নিতে। না—শুধু নিজের আপন বললেও যথেষ্ট বলা হবে না। পরকে তিনি সহজেই নিজের পরিবারবর্গের কাছেও আপন ক'রে নিতে পারতেন। এ আরও দুরূহ। সাংসারিক জীবন-যাত্রায় সামাজিক মানুষ প্রায়ই দোমহলা বাড়িতে বাস করে, সদরে রাখে বন্ধুকে, অন্দরে—আত্মীয়কে: বিশেষ আমাদের দেশে—যেখানে "ঘরের" চেতনা "বাইরের" চেতনার চেয়ে ঢের বেশি তীক্ষ্ণ ও সাবধানী। আমাদের দেশে অন্তঃপুর বিশেষ ক'রেই অন্তঃপুর—যেখানে ছোঁওয়া ছুঁইয়ি জানাজানি পছন্দ করবার মতন উদারতা খুব কম লোকেরই আছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রসাদে হিন্দুয়ানির এই ছুঁৎমার্গবৃত্তি কিছু ঘা খেয়েছে, এ জন্যেও ব্রাহ্মসমাজের কাছে আমাদের ঋণ খুব বেশি ব'লেই আমি মনে করি। কিন্তু ধরণীদাকে আরো প্রশংসা করি এই জন্যে যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত না হ'য়েও এবং বাড়ির নানান্ অতি-হিন্দু আত্মীয়-আত্মীয়ার নৈযুজ্য সত্ত্বেও সপরিবারে তিনি অকুতোভয়ে ঠাঁই দিতেন একেবারে অপরিচিতকে। ঔদার্যে অসামান্য বলিষ্ঠ না হ'লে মানুষ এ পারে না। আর শুধু

উদার হ'লেই যে এ সম্ভব হয় তা-ও নয়—স্ত্রীপুত্র কন্যাকে খানিকটা নিজের ভাবের ভাবুক ক'রে তুলতে না পারলেও এতটা পারা সহজ হয় না। এ-পারাও সম্ভবপর হয় কেবল তখনই—যখন মানুষ নিজের পরিবারভুক্তদেরকে সত্যি আপন মনে করে। যেখানে ভালোবাসা গভীর সেখানে মানুষ নিজেকেই মেলে ধরে, যেমন শুঁড়ি নিজেকে মেলে ধরে তার বাজারো শাখার মধ্যে। ধরণীদার সৌভ্রাত্র্যশক্তি তাঁর পরিবারভুক্তদের মনেও চারিয়ে গিয়েছিল প্রথমত তাঁর নিজের চরিত্রের বলিষ্ঠতার ছোঁয়াচে—দ্বিতীয়ত তাঁর মনের উদারতার প্রভাবে। শিলঙে তাঁর অতিথি হ'য়ে মাসখানেক বাস করবার সময় একথা আমাদের সবারই মনে হ'ত—না হ'য়েই উপায় ছিল না।

তাই আরো ভালো লাগত এ-পরিবারটির সহজতা। কারণ এ সহজতা ছিল সরল ও খোলা—বাপ মা ছেলে মেয়ে শালা শালী সবাই ছিল এক রঙে রঙিয়ে—একই ধোপা ঘরের কাপড়। কেউ কারুর চেয়ে কম শাদা নয়। যেমন মিষ্ট প্রভাদি, তেম্‌নি লীলা, তেম্‌নি হাসি, বাবুল, রুণু, শীতাংশু ও শুভ্রাংশু। পাহাড়ি মীরা জ্ঞান লাটু ও আমি তো এ-পরিবারভুক্ত নই সত্যি সত্যি। কিন্তু কই আমাদের কখনো তো ভুলেও মনে হয় নি—আমরা বাইরের লোক! শুধু তাই নয়, ধরণীদা তার করেন টেলিফোন করেন চিঠি লেখান—"ডাকো ভীষ্মকে, ডাকো অমরেন্দ্রকে, ডাকো শচীনকে, ডাকো সত্যেন বোসকে—" কাকে নয়? আতিথেয়তার এমন জীবন্ত প্রতিমূর্তি অতুল-প্রসাদের পরে আর আমার চোখে পড়ে নি। এই শ্রেণীর মহৎ উদার মানুষ সমাজকে কত যে দেয় সমাজ সব সময়ে তার খবর রাখে না, এ একটা কম দুঃখ নয় ভাই। কারণ এ-খবরদারি করতে না-পারার মধ্যে আছে চেতনার একটা অসাড়তা। যুগান্তর সঙ্গে জীবন্তের সেই চিরন্তন বে-বনতি। তোমাকেও ডাক দিতে তিনি যে কতবার বলেছেন আমাকে! জানোই তো তুমি এলে তিনি কী খুশিই হ'তেন। শিলঙে আরো কত বাঙালি পরিবারই যে তাঁর কাছে যখন তখন আসত ও সধরণীদা প্রভাদির স্নেহানুকূল্যে নিত্য নব আনন্দের পাথেয় নিয়ে ফিরত!

শুধু কি বাঙালি? শিলঙে নানা অসমিয়া ছেলে-মেয়েদেরকেও তিনি ঐভাবেই স্নেহ করতেন, সহজেই নিতেন আপন ক'রে। উষা ব'লে এক অসমিয়া কুমারীর সঙ্গে আমার ভাব হয় ওখানে। বড় চমৎকার মেয়ে। যেমন বিদ্যা তেমনি বুদ্ধি তেমনি মিষ্ট স্বভাব—আর সব ছাপিয়ে তার আদর্শবাদ। ধরণীদা শুধু যে তাকে ভালোবাসতেন তা-ই নয়—তার বৃদ্ধা মা-কেও ডাক দিতেন প্রায়ই। বৃদ্ধাও তাঁকে অভিষেক করেছিল নিজের পুত্রপদে। এ বিষয়ে প্রভাদিও ছিলেন ধরণীদার শুধু সহধর্মিণী নয়, সহমর্মিণীও বটে। এমন সুন্দর দাম্পত্য-মিলন কমই দেখেছি। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। আহা, সেই

প্রভাদেবী উমা ধরণীকুমার

প্রভাদির নিষ্করুণ শোক স্বচক্ষে দেখতে হ'ল! একে তো ভালোই অতি বিরল এ জগতে। ভালোয় ভালোয় মিলন আরো কত বিরল বল দেখি। উষার মার মুখে প্রভাদির গুণকীর্তন ধরে না। উমাকে আর তার গানকেও তিনি যে কী ভালোই বাসতেন! এসব কথা বলছি আরো দেখাতে ধরণীদার ব্যক্তিস্বরূপ—পার্সনালিটি—কী ভাবে নিজেকে উপলব্ধি করত পারিবারিক পরিবেশে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁর ব্যষ্টি চেতনা নিরন্তর নিজেকে ছাড়িয়ে দিয়ে যেন চাইত একটা বৃহত্তর সমষ্টিগত চেতনার বিকাশ।

এ আত্মকেন্দ্র সাংসারিক জগতে এ যে কত বড় কথা তুমি জানো। কারণ সংসারের সাংসারিক দিকটার সঙ্গে তোমার পরিচয় আশৈশব ব'লে সাংসারিকতার শুষ্কতম দুঃসহতম রূপটিকে তুমি চেনো।

ধরণীদার সঙ্গে আমার পরিচয় কত দিনের তা-ও তোমার অবিদিত নেই: সবে দুবছর—তার মধ্যেও বছরখানেক বাদ দাও—আমার পণ্ডিচেরি-স্থিতি। তা হ'লে এই বাকি বছরখানেকের সম্প্রসারণেই আমাদের বন্ধুত্বকে মাপতে হবে।

সময়ের অনুপাতে ঘনিষ্ঠতা হয় না এ মানুষের প্রায় একটা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। কিন্তু তবু একথাটা প্রীতির লেন-দেনের ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রেই স্মরণীয়—যেহেতু এ-সত্যের সাক্ষ্য প্রীতির একটা মস্ত গৌরবের দিককেই প্রমাণ করে। ধরণীদার গভীর প্রীতির নিবিড় তৃপ্তি এ-গৌরবের দিকটাকে আমার কাছে যে আরো কত উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেছে! শুধু উজ্জ্বল না—স্মরণীয়।

না! ধরণীদার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কথা আমার স্মরণীয় বললেও সবটুকু বলা হয় না। বলা চাই—বরণীয়, কেননা এ-বন্ধুত্বের জোগান দিয়েছে তাঁর সমস্ত পরিবার। এক অমরেন্দ্রনারায়ণের পরিবার ছাড়া আর কোনো পরিবারের প্রতি অন্তরঙ্গের কাছ থেকে আমি এ হেন সজাগ শ্রদ্ধা ও প্রীতি পেয়েছি ব'লে তো কই মনে হয় না। আমার আত্মীয় পরিবারদের কাছ থেকে তো নয়ই। বলতে কি, ধরণী-পরিবারের অচল প্রীতি ও সর্বাঙ্গীন শ্রদ্ধা আমার আত্মীয়দের নানা অকারণ বেদরদী অবিচারেরই ক্ষতিপূরণ করেছে—আমাকে আরো বুঝিয়ে দিয়েছে যে মানুষকে প্রায়ই সবচেয়ে কম চেনে তার আত্মীয়। তারা স্নেহশীল হ'তে পারে কিন্তু দরদী প্রায়ই হয় না। ধরণীদা—শুধু ধরণীদা না, তাঁর পরিবারের প্রত্যেকে ছিল স্বভাব-দরদী। তাই ওদের বন্ধুত্বের গাঁথুনিতে এমন কি কোনো ফাটলও ছিল না—কিন্তু এ পাকা কাজের কৃতিত্ব বিশেষ ক'রে তাঁরই, আমার নয়। কারণ আমার সমস্ত মনোযোগ নিবিষ্ট ছিল ওঁদের কারুর 'পরেই না—ধরণীদার মেয়ে আমার ছাত্রী উমার গীতিসাধনার দিকে। এর একটা কারণ—আমার বয়স হয়েছে অসম্ভব—এখন নতুন বন্ধুত্ব বন্ধন গ'ড়ে-তোলার সে যুবন্ উৎসাহে ভাঁটা প'ড়ে এসেছে প্রায়। আরো, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমশই অন্তর্মুখী হ'য়ে ওঠে—হৃদয়বৃত্তি যতই থিতিয়ে আসে গভীরের দিকে, ততই নিজেকে আমরা গুটিয়ে আনি ব্যাপ্তির দিক থেকে। তাই ধরণীদার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার কোনো সজাগ চেষ্টাই আমি করি নি—তুমি জানো, যতক্ষণ তাদের বাড়িতে থাকতাম উমাকে গান শেখানোতেই কাটাতাম—বেশির ভাগ সময়। এ নিয়ে অনেকেই রাগ করত, মান করত—কিন্তু ধরণীদা বুঝত কেন এধরণের রাগারাগি মান-অভিমান আমি গ্রাহ্য করি না। তাছাড়া, ইদানীং গান ও লেখার দিকে আমি আমার সমগ্র উদ্বৃত্ত শক্তি খাটাবার ঠিক ক'রে চলেছিলাম—বহুর সঙ্গে মেলামেশা ও বহুর হিতসাধনের আগেকার উৎসাহ আমার স্তিমিত হ'য়ে এসেছিল।

ওদিকে ধরণীদা নিজেও ছিল ব্যস্ত মানুষ। কত ব্যস্ত—তুমি জানো। প্রকৃতিতে নির্বিলাসী কর্মিষ্ঠ, কর্তব্য-পরায়ণ এ-মানুষটির মধ্যে ছিল একটা সরল হৃদ্যতা, কিন্তু মৌখিক অঙ্গীকারের জাহিরিপনা একেবারেই না। তাই আমার বহুদিন এমন সন্দেহও হয় নি যে, ও আমাকে ভালোবাসত বা শ্রদ্ধা করত। পরে হঠাৎ যখন জানতে পারলাম ও অতর্কিতে—ঊষার কাছে। আমাদের ধরণীদা দিয়েছে তার নানান্ সেবা ও ভাষা, নানা বিষয়ে অকৃপণ সমবেদনা—আরো অনেক কিছু, কিন্তু কখনো ভাবেভঙ্গিতেও প্রকাশ করে নি যে আমাকে তার কোনো প্রয়োজন আছে নিজের দিক থেকে।

হয়ত ছিলও না। আমি ও পাহাড়ি প্রায়ই বলাবলি করতাম যে ধরণীদা আমাদের কাছে অতুলপ্রসাদের স্থান নিয়েছে। কিন্তু অতুলপ্রসাদের সঙ্গে এখানে ধরণীদার একটু তফাৎ ছিল। অতুলপ্রসাদ ছিলেন স্বভাব-শিল্পী। প্রকাশ ছিল তাঁর স্বধর্ম। গানে ও রুচিতে তাঁর সঙ্গে আমার মিল ছিল এত বেশি প্রত্যক্ষ যে চোখে না প'ড়েই পারত না।

ধরণীদার সঙ্গে কিন্তু বাইরের দিকে আমার কোনো মিলই ছিল না। তুমি তো জানো আমি কী রকম অন্যমনস্ক প্রকৃতির জীব: ধরণীদা অতিমনস্ক—আঁটদাঁট। সময়ানুবর্তিতা আমাকে কোনো দিনো তাঁবে রাখতে পারে নি, কিন্তু ধরণীদা ছিল সময়ভীরু লোক—যে-কাজটি যে সময়ে করবার কথা ত্রস্ত চিত্তে করবেই করবে। সময়কে

আঘাত করতে ওকে তেম্‌নি বাজত যেমন ধর্মভীরু লোককে বাজে ধর্মকে অনাদর করতে। তাই আমার সঙ্গে কত বিতণ্ডাই যে ও করেছে আমার এই চিরকেলে "শোচনীয়" অনুতপ্ত সময়-শৈথিল্য নিয়ে। কত সময়ে তাকে কত অসুবিধেতেই না আমি ফেলেছি—সে-বেচারির সময়ভীরুতার মর্যাদা রাখতে না পেরে। ইচ্ছে ক'রে নয় অবশ্য—আমার ধাতে নেই ব'লে। এতে ধরণীদা প্রথম প্রথম সত্যি দুঃখ পেত—সময়ে সময়ে স্নিগ্ধ হেসে এমনও বলেছে, আর্টিস্টদের সঙ্গে আমরা মিশি নি কখনো তাই পদে পদে ঠেকি, তবু শিখি না। পাহাড়ি, ভীষ্ম ও জ্ঞান (ঘোষ) তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল—তাদের গাফিলিতেও ধরণীদা কিছু কম ভোগে নি। কিন্তু আমাকে বহুবার তাকে বিব্রত করলেও কখনো উদ্ব্যস্ত বা বিরক্ত ক'রে তুলতে পারি নি। চেষ্টার ত্রুটি করি নি—কিন্তু ওর সহ্যশক্তি ছিল যে অসামান্য, পেরে উঠব কেন বলো? শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর বাধে প্রায়ই—লড়াইও হয় তো সমধর্মীদের মধ্যেই বেশি। কিন্তু জীবনের বিচিত্র বিধান—অসমপ্রকৃতির মানুষই সবচেয়ে বেশি মিলেমিশে থাকতে পারে পরস্পরের সঙ্গে! তাই ধরণীদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে একটিবারও মনান্তর হয় নি। ওকে আমি অসুবিধায় ফেলেছি অগুন্তিবার, কিন্তু আমার সব ঝক্কিই ও হাসিমুখে সইত। প্রথম প্রথম অবশ্য শিশুশিক্ষার পাঠ দিতে চেষ্টা করত, "মণ্টু, অমুককে কথা দিয়েছ অমুক সময়ে যাবে—দেরি কোরো না।" কিন্তু পরে হাল ছেড়ে দিয়েছিল—অথচ বিরক্তিভরে নয়—প্রায় ধরণীর জননীর স্নেহপ্রশ্রয়ভঙ্গিমায়।

সত্যি, ধরণীদার বাইরের শুষ্ক আবরণের নিচে ছিল তাঁর এই অতি কোমল প্রকৃতি। আমার ৺পিতৃদেব, এক মেথোমহাশয় গিরিশ শর্মা ও ৺অতুলপ্রসাদ ছাড়া কোনো বয়স্ক লোকের মধ্যে এমনতর কোমল হৃদয় কখনো দেখি নি। এই জন্যেই ও এত চেষ্টা করত সবাইকে সুখ দিতে—নিজে হাজারো অসুবিধা সইত হাসিমুখে। একটা উদাহরণ দিই।

আমি বাইরের দিকে খুব নিশুক হ'লেও অন্তরে যে সত্যিই নির্জনতাপ্রিয় তুমি অন্তত জানো। গানের পরেই আমার কাছে বিলাসের চরম হ'ল সময়ের অবকাশ ও সুপ্রচুর নিঃসঙ্গতা। ধরণীদা এটা জানত। তাই ওর সঙ্গে যখনই যেখানে গিয়েছি ও নিজে সবাইয়ের সঙ্গে ভিড় ক'রে থাকবে কিন্তু আমাকে একটি গোটা ঘর একা ছেড়ে দেবে। নির্জনতা ওর দরকার ছিল না, কিন্তু আমার ছিল এ ও বুঝত ও হৃদয়ের সহজাত দরদ দিয়ে।

শুধু আমার কথাই যে দরদ দিয়ে ভাবত তা নয় অবিশ্যি। সবাইকেই ও চাইত সুখ দিতে—তাই নানান্ ব্যস্ততার মধ্যেও ও ছদ্মবেশী হারুণ-অল-রশীদের মতন গোপনে সন্ধান নিত ওর কোন্ অতিথি-প্রজার কোন্‌খানে আরাম—কোথায় ব্যথা। লীলা পান ভালবাসে, ভীষ্ম পক্ষিমাংস, আমি সন্দেশ, জ্ঞান চিংড়িমাছ—ইত্যাদি প্রতি কথাটি ওর স্মৃতিকক্ষে বড় বড় হরফে টাঙানো থাকত। একটা উদাহরণ দেব? ধরো, গানের আসরে পাহাড়ি বড় জল খেত শিলঙে। আমরা তেমন খেয়াল করিনি,

শিলঙে ধরণীকুমার

কিন্তু ওমা দেখি কি—ধরণীদা ফী আসরে গিয়ে এক জাগ্ জল নিয়ে ব'সে। কী? না, পাহাড়িকে পরিবেশন করতে হবে। গানের আসরে চাকর বাকরকে খেদিয়ে দিয়ে স্বহস্তে ট্রে হাতে ক'রে চা পরিবেশন করা তো ছিল ধরণীদার প্রায় নিত্য কর্ম। হয়েছে কি, ও লোকটি মুখে স্নেহ প্রকাশ করতে জানত না—উচ্ছ্বাসমুখর হৃদ্যতার রীতিতেও হাত পাকাবার অবসর পায় নি বহু কর্মের মাঝখানে। তাই ওর কোমল হৃদয়টি নিজেকে জানান দিত নীরব অলক্ষিত সেবার মধ্যে দিয়ে। একদিন দেখি কি, পাহাড়ির চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে দেখে ও নিজের শালের মধ্যে ঢেকে রেখেছে সদ্যোজাত এক পেয়ালা চা!

সেবার দুটো দিক আছে। একটা সামাজিক—একটা আধ্যাত্মিক। সামাজিক সেবার দিকটা ছোট নয়, মানি—

কিন্তু তার স্বধর্ম হচ্ছে নিজেকে ফাঁপিয়ে-তোলা। যা করব হৈ চৈ ক'রে করব—ধন্যবাদ দেব, গলদ্‌ঘর্মকলেবরে পরিবেশন করব—চাকরদের নিরবচ্ছিন্ন তর্জন করব কেন পরিচর্যায় গলতি হচ্ছে—এইধরণের "অমায়িক" ডাকসাইটে জাহিরিপনার সঙ্গেই আমরা সচরাচর পরিচিত। এই সব যারা খুব লোক দেখিয়ে করে সমাজে তারাই তখমা পায়—"সেবাব্রত।" অন্তত আমাদের মধ্যবিত্ত তথা অভিজাত সমাজে।

কিন্তু ধরণীদার সেবার সহজ প্রবণতা ছিল আত্মগোপনের দিকে। ও ছোটখাট রকমারি ব্যবস্থা ক'রে রাখবে ভেবেচিন্তে—ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিষটি হাজির। কী ক'রে হ'ল? না ধরণীদা। আমাদের গানের আসরে ধরণীদা ভার নেবে হার্মোনিয়াম নিয়ে যাবার, তবলা নিয়ে যাবার, এমন কি তব্‌লা বাঁধবার হাতুড়িটি পর্যন্ত নির্ভুল পৌঁছবে যথাস্থানে। উৎসবান্তে এদের স্বস্থানে ফেরাবার অতি-গন্ধময়, চির-বিরক্তিকর অথচ বহুবাঞ্ছিত কাজটিও ও-ই করবে। কিন্তু কাউকে জানিয়ে না, দেখিয়ে না, কোনো তারিফ পেতে না। বলতে কি, এসব আমরা খেয়ালই করতাম না বড় একটা। ট্রেনে যাব—কুলি, গাড়ি, টিকিট এসব দেখাশুনোর ভার যে ধরণীদার—এ এতই সহজ হ'য়ে গিয়েছিল যে আমাদের কাছে ভাবাই কঠিন হ'ত যে একাজ আর কেউ করতে পারে। আরে, আমার বাক্সের কোনোদিনো চাবি নেই—দেখি একদিন ধরণীদা কোত্থেকে একটা মিলারের তালা লাগাচ্ছে! অথচ এত সহজে যে ধন্যবাদ দিতেও রীতিম'ত বাধে। এই সেবা-সহজতা ছিল ওর একটা মস্ত চরিত্র-লক্ষণ। এই জন্যেই ওর কাছে সেবা নিতে কারুরই বাধত না। হয়েছে কি, সেবা নিতে কুণ্ঠা আসে তারই কাছে সেবা যার নয় স্বধর্ম। মোটরকে দ্রুত হাঁকাতে কার মমতা হয়?—দ্রুত না চালালেই বরং নজরে পড়ে। কিন্তু শীর্ণ পক্ষিরাজকে জোরে হাঁকাতে মায়া হয় না! ধরণীদাকে আমরা অননুতপ্ত চিত্তে খাটিয়ে নিতাম সেবার্থে গলদ্‌ঘর্মকলেবর হওয়ায় ওর গভীর আনন্দ ছিল ব'লে। বাঁশি বাজাই চড়া সুরে—গান গাইবার সময় বেশি চড়িয়ে গাইতে মন চায় না তেমন। যে ঢঙে যার লীলা সহজ সে-ঢঙকে মেনে নিতেও বাধে না। সেবার উঁচু পর্দায় ধরণীদার মনের তার সর্বদাই বাঁধা থাকত, তাই সে-তার-সপ্তকে ওর চরিত্রের তানালাপ খেলত এত সহজে। কেবল এই কথাটা এখানে মনে রাখবার যে যা দেখতে যত সহজ আসলে তত শক্ত। এরই নাম art conceals art : এরই নাম leaders are born, not made. ধরণীদা ছিল স্বভাব-সেবক—নিরভিমান, সদাস্নিগ্ধ অথচ আত্মবিজ্ঞপ্তি-বিরোধী। করবে সবই, পানটি থেকে চুনটি খসতে দেবে না, অথচ কেউ টেরটি পাবে না কার স্নেহনিবিড় অভিনিবেশে সব চলছে জলের ম'ত। তাই বলছি ধরণীদার সেবা আধ্যাত্মিক পর্যায়ে পড়ে—যেহেতু এ সেবা ছিল ওর অন্তরাত্মার ...কোজ্জ্বল স্নেহের উচ্ছ্বলিত উৎসার। অতুলদার মতন লোক সেবা করতে পারবেন না—করবেন যে তা ভাবাও যায় না। এঁদের স্বধর্ম সেবা দেওয়া নয়—আনন্দ দেওয়া, তাই অতুলদা সেবা করতে এলে মন কুণ্ঠিতই হ'ত। তাঁকে মানাত না এসব—একেবারেই না। যার কর্ম তারে সাজে—অপিচ যে পারে সে আপ্‌নি পারে।

* * *

* * * *

ধরণীদার কথা কত বলব? খুঁটিনাটি ক—ত কথাই যে রয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে আমি নিজে এত ব্যক্তিগতভাবে জড়িত যে বলতে বাধে। কেবল একটা কথা বলতেই হবে—ওর শ্রদ্ধা করবার অপরিসীম শক্তি।

তুমি মর্মে মর্মে জানো, রাণী, এযুগের জলহাওয়া কি রকম প্রতিকূল দুটি হৃদয়বৃত্তির : এদের নাম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। এযুগের একটা তথাকথিত মহৎ বাণী হ'ল ইন্‌ডিভিডুয়ালিস্‌ম্‌। এ মনোবৃত্তিটির মধ্যে কিছু সত্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু বলব এর গোড়ায় (সব সময়ে না হ'লেও) খুব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে একটা বিপুল আত্মস্ফীতি। শ্রীঅরবিন্দ তোমারও গুরু—তাই তুমি জানো একথা নিজে ঠেকে। কারুর কাছে মাথা হেঁট করলে পুরুষকারের মাথা হেঁট। হিরো-ওয়র্শিপ। ধিক্!

তুমি জানো আমার অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত বন্ধুর সঙ্গেই গভীরে আমার কতখানি অমিল—এখানে আমি কী একলা! মনে আছে দার্জিলিঙে ওবছর এক শিক্ষিতা বর্ষীয়সী আমাকে সিংহিনীবিক্রমে কোণ্‌ঠেসা ক'রে ধরেছিলেন—"দিলীপ, তুমি তো খুব বোকা ছেলে নও—তবে গুরুকরণের এ দুর্মতি কেন হ'ল বৎস?"

"দুর্মতি কেন ভদ্রে?"

"বাঃ!—ইনডিভিডুয়ালিটি যে ছারেখারে গেল! গুরুকে তুমি না কি পূজা করো?"

"করি ভদ্রে। প্রতিমাকেও করি। আমার মধ্যে তাল পরিমাণ দম্ভ আছে নিশ্চয়ই—কিন্তু কেউ কেউ বলেন তিল পরিমাণ ...ার ছিটেফোঁটা হয়ত লুকিয়ে থাকতেও পারে বা। ...র আবির্ভাব হয়েছে এই গুরুপূজায়ই—পৌত্তলিকতারই—মহতের চরণে প্রণামে—হিরো ওয়র্শিপে।"

"এ প্রগতিসারী (progressive) যুগে এমন রিয়াক্‌শনরি কথা জাঁক ক'রে বলার নাম বাহাদুরি নয়—মূঢ়তা। ধিক্।"

"নাম নিয়ে রাগারাগি কেনই বা ভদ্রে? আমি তো মেনেই নিয়েছি আমি স্বভাবে অননুতপ্ত পৌত্তলিক। কিন্তু গাছের নামডাক কি বীজ-বিচারে না ফল-বিচারে?"

"গুরুপূজার কুফল মানো না?"

"কী কুফল?"

"ইনডিভিডুয়ালিটির মূলোচ্ছেদ।"

"আচ্ছা ভদ্রে! আমাকে পুঁথিপড়া শিশুপাঠের পাঠ না দিয়ে একটা সাদা উত্তর দেবেন?"

"দেব।"

"বিবেকানন্দ স্বামীর চরিত্রে ফুটেছে কী? দুর্বলতা, না তেজস্বিতা? আর তিনি সবচেয়ে জাঁক ক'রে বলতেন কোন্ কথাটি?—'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি দৃষ্টিতে লাখো বিবেকানন্দ গ'ড়ে উঠতে পারত'—এই কথাটিই নয় কি? এ-ও কি আপনি জানেন না যে তাঁর জীবনে বিপ্লব ঘ'টে গিয়েছিল শুধু ঐ নিরক্ষর পাড়াগেঁয়ে পৌত্তলিক গুরুটির দীক্ষায় ও দৃষ্টান্তে?"

* * * *

আধুনিক মানুষ—বিশেষ ক'রে শিক্ষিত মানুষের কাছে একথা পেশ করা কঠিন। অন্তত বেশির ভাগ প্রগতিশীল উচ্চশিক্ষিতের কাছে তো বটেই। কারণ তাঁরা প্রায়ই ভোলেন যে সত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিকষ বুলি বা ডগ্‌মা নয়—অভিজ্ঞতা। এ-বর্ষীয়সীটি আমাকে এ-ও বলেছিলেন যে, সন্ন্যাসী হওয়া মহাপাপ। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম "তা হ'লে আপনি কি অকুতোভয়ে বলবেন যে বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য ছিলেন পাপিষ্ঠ?" কি জানো রাণী? অধিকাংশ চিন্তাহীন মানুষ দু-চারটে চল্‌তি মনগড়া আ-প্রায়রি থিওরির গজকাঠিতে সমস্ত জীবনকেই মাপতে চায়। তাছাড়া যুক্তিবাদ সহজ, শ্রদ্ধাবাদ কঠিন। তাই আধুনিক শিক্ষিতম্মন্যরা শ্রদ্ধার মর্মবাণীটিই বিশ্বাস করেন না—বলেন যে, আমার আমিত্ব রসাতলে যায় ভক্তির ভূমিকম্পে। এ-যুগে লয়ালটি শব্দটি প্রায়ই অনাদৃত এই কারণেই। যাকে যার প্রাপ্য দাও—রাজি, কিন্তু ভক্তি করা, পথসন্ধানে দিশারি খোঁজা—এ সব কী সেকেলিয়ানা শুনি! ভক্তির যুগ যে মিরাক্লের যুগের মতনই গত। এ যে নয়া আলোকের যুগ—গেটে বলেননি—"আরো আলো আরো আলো?" মানে, ইনডিভিডুয়ালিটির আলো।

এ নিয়ে তর্কাতর্কি করতাম এক সময়ে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বেড়েছে কি-না বলতে পারিনে, তবে ব্যর্থশ্রম যদি নির্বুদ্ধির নিদর্শন হয় তবে যৎসামান্য সুবুদ্ধি বেড়ে থাকবে বা। অন্তত এটা বুঝেছি যে, একজনের অন্তরের গভীর তৃষ্ণা আর একজনকে তর্ক ক'রে বোঝানো যায় না—যার নেই সে-তৃষ্ণা। এই জন্যেই গীতায় বলেছে : "ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন, ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি"—অর্থাৎ গভীর কথা গভীর সুরে বলতে নেই তাদেরকে—যারা চায় না শুনতে, যারা বিশ্বাস করে না ভক্তিকে, বুঝতে পারে না তপস্যাকে।

ধরণীদার মজা ছিল এই যে, সে বাইরে গুরুবাদী ছিল না—কিন্তু অন্তরে ছিল পূজাধর্মী। তাই শ্রীঅরবিন্দর নাম করতে তার চোখ শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ছল ছল ক'রে উঠত। "সাধুসঙ্গ" কথাটি সে প্রায় জপমন্ত্রের মতনই উচ্চারণ করত। আমি জানি এ নিয়ে কত শিক্ষিতম্মন্যের কাছে ওকে কত কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু তবু ওর এ উজ্জ্বল বিশ্বাস একটুও ঝাপসা হয় নি যে সাধুসঙ্গ খুব দরকার। গত বছর যখন তোমাদের তদারকে ধরণীদা, হাসি ও লীলাকে এলাহাবাদে পাঠায় তখন ও আমাকে একটি চিঠি লেখে। চিঠি ও বড় একটা লিখত না—দীর্ঘ চিঠি তো নয়ই। কারণ কোনো কথা গুছিয়ে বলা ওর স্বধর্ম ছিল না। কিন্তু তবু ওর সহজ ভক্তিতে একটা কথা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল ওর পত্রে। আদরিণী কন্যাকে একলা ও বাইরে কখনো পাঠায় নি এর আগে। সে সময়ে এলাহাবাদে ছিল আমার প্রিয় বন্ধু

জ্যোতির্ময় শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ওরফে রোনাল্ড্ নিক্‌লসন। ধরণীদা লেখে—হাসি এই সূত্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গ পাবে এ-লোভ সংবরণ করা কঠিন—তাই হাসিকে জোর ক'রেই পাঠাল তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ওর শ্রদ্ধাশীলতার আর একটি দৃষ্টান্ত দেই। আমার কোনো আত্মীয়া কিছুদিন আগে ধরণীদার কাছে এসে শ্রীঅরবিন্দর ও আশ্রমের খুব নিন্দা করে। আমি ধরণীদাকে লিখি—এ সব কথা আদ্যন্ত মিথ্যা—তবে বিশ্বাস করা না করা তার হাত—আর কারুর নয়। তাতে গত ডিসেম্বরে ধরণীদা আমাকে আর একটি চিঠি লেখে। তাতে ছিল—"মণ্টু, আমি স্বভাবে ধার্মিক না হ'তে পারি—কিন্তু খাঁটি সোনা ও মেকি গিল্টির তফাৎ চিনি। সে যা বলেছে তার একটি কথাও আমার মনকে ছোঁয় নি—যেদিন ফের সুযোগ পাব শুধু যে হাসিকে পাঠাব তা-ই নয়—নিজেও যাব শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে।"

তাই বলছি ধরণীদার প্রকৃতিতে ভক্তি ছিল সহজ। নিজের পিতামাতাকে সে অত্যন্ত ভক্তি করত—তাই যেখানেই এ শ্রেণীর ভক্তি দেখত বিচলিত হ'ত। আর সে শুধু একটু আধটু মামুলি নমো-নমো নয়—ওর মূল শিকড় অবধি টনটনিয়ে উঠত। একটা দৃষ্টান্ত দেই এ কথার।

ঊষার কথা বলেছি। এ ধরণের মেয়ে আমি ওদেশেও খুব কমই দেখেছি। তীক্ষ্ণধী,সংশয়শীলা (যেহেতু বিদুষী) অথচ স্বভাব-ভক্তিমতী। আধুনিক টলারান্স ওর মজ্জায় না হোক—রক্তে। কাজেই বেচারি সেকেলে ভক্তির সঙ্গে আধুনিক বিদ্রোহের সামঞ্জস্য করতে বিষম বেগ পায়। শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়ে গভীর ভক্তিভরে—অথচ হাল আমলের প্রগতিশীলদের সঙ্গে তর্কে এঁটে ওঠে না—যখন তারা চোখা চোখা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে ভক্তি হ'ল সেকেলে কুসংস্কার—সংসারে একমাত্র সত্য হচ্ছে বল্‌শেভিস্‌ম্ ও বুর্জোয়া আদর্শগুলিকে নির্বিশেষে নির্বংশ করা।

এহেন এক কালাপাহাড়—ঊষাকে একদিন বলেন যে শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সবই নির্বোধ তথা ভণ্ড—যেহেতু পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে খাওয়া এদের পেশা—ইত্যাদি অকথা কুকথা।

ঊষা স্বভাব-সহিষ্ণু, বলেছি। দুর্মুখমহোদয়ের এ ধরণের গালিগালাজ নীরবে শুনে গেল। সেদিন দুপুরে এসে খাওয়ার টেবিলে করল এ গল্প আমাদের সবাইয়ের সাম্‌নে। বলশেভিক ভদ্রলোকের অন্য অন্য মহাজন কুৎসা এতই নোংরা যে উদ্ধৃত করতেও সাধ যায় না। কিন্তু এ ধরণের কথা ঊষা বিনা প্রতিবাদে শুনে গেল এতে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। ধরণীদা বলল: "তা ঊষা কী করবে বলো? এ ক্ষেত্রে তর্ক ক'রে তো ফল নেই। যার যা মত।"

আমি উত্তপ্তকণ্ঠে বলেছিলাম: "ধরণীদা, ঊষা শ্রীঅরবিন্দকে নিজের গুরু ব'লে যদি না মানত আমি তোমার টলারান্ট নিরীহবাদে সায় দিতাম। কিন্তু যাকে গুরু বলি, সহিষ্ণুতার থিওরি মেনে তার নিন্দা শুনে যাওয়ায় প্রত্যবায় ঘটে। কেউ যদি তোমার বাবা মাকে এ ভাবে নিন্দা করত, সইতে তুমি এ উদার থিওরি মেনে? গুরুবাদের গোড়াকার কথা এই যে, গুরু সবার বড়—বাপ মা, ভাই বোন, স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব কেউ তাঁর অঙ্গে না।"

ধরণীদা শুনে চম্‌কে ওঠে। পরে বন্ধু লীলাদের সবাইকে: "কথাটা এভাবে আমি ভেবে দেখি নি বলে করছি। সত্যিই তো আমার বাবা মাকে কিংবা যদি কেউ এ রকম জঘন্য ভাষায় আলোচনা করত তা হ'লে আমি যে অহিংস থাকতাম না এ ধ্রুব। দিলীপের স্বাকে তাই শ্রদ্ধা না ক'রে পারা যায় না—যেহেতু গুরুকে সে পিতারও অধিক মনে করে।"

ঊষাও বোঝে তৎক্ষণাৎ। বিকেলে আমাকে লেখে এ নিয়ে অনুতপ্ত হ'য়ে—প্রতিজ্ঞা ক'রে যে, গুরুনিন্দা আর কখনো শুনবে না।

ঊষাও ধরণীদাকে আন্তরিক ভালোবেসেছিল এই জন্যেই: মানে, ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্রবণতায় ওদের গভীর মিল ছিল ব'লে। ধরণীদার মৃত্যুর পরে ঊষা, আমাকে লেখে:

"হাসিদের দুঃখের সাথে আজ আমার দুঃখ এক হয়ে গিয়েছে দিলীপদা, আমিও যে পিতৃহীন। ধরণীদাকে চিনেছিলাম এ-কয়দিন যে, তাঁর কাছে এসে তাঁকে জানতে পেরেছিলাম এর জন্যে ভগবানের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা যে জানিয়ে পারছি না। তাঁকে যে আমি কত শ্রদ্ধা করেছিলাম আমার মা যে তাঁকে কত ভালোবেসেছিলেন তা কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দিলীপদা?"

শুধু ঊষাই নয়। এবার শিলঙে আমাদের বিরতিহীন

আনন্দোৎসবের সূত্রে যে-ই ধরণীদার কাছে এসেছিল সে-ই মুগ্ধ হয়েছিল তাঁর স্নেহসদয় আচরণে, আন্তরিক অভ্যর্থনায়। দীপ নিভবার আগে জ্ব'লে ওঠে ব'লে একটা প্রবচন আছে না? ধরণীদার সুন্দর চরিত্র শিলঙে শত দাক্ষিণ্য-শিখায় জ্ব'লে উঠেছিল যেন এম্‌নি ভাবেই। তার কারণ তাঁর চরিত্রের অশেষ সদ্‌গুণ ও স্নেহকারুণ্য ক্ষেত্র পেয়েছিল নিজেদেরকে বিলিয়ে যাবার, জানান দেবার। বিশেষ ক'রে খুঁটিনাটিতে তাঁর নিরভিমান সদা-সজাগ স্নেহপরিচর্যা সবাইকে এমন মুগ্ধ করেছিল। গান তিনি আগে ভালোবাসতেন না তেমন—ওস্তাদি গান তো নয়ই। কিন্তু আদরিণী কন্যার অসামান্য গীতিপ্রতিভার দীক্ষায় তাঁর সাঙ্গীতিক রুচি এতই উন্নত হয়েছিল যে ভীষ্মর ওস্তাদি গানও তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতেন কাজ টাজ সব ফেলে। তাঁর কাছে আমরা সবাই পেয়েছি অজস্র। প্রতিদানে দিতে পেরেছি সামান্যই। শুধু এইটুকু সান্ত্বনা রইল যে আমরা গানে-উদাসীনকে গান ভালোবাসার আনন্দদীক্ষা দিতে পেরেছিলাম খানিকটা। তিনি ছিলেন আমার পরম বন্ধু। তাই তাঁকে আমার এই পরম উপলব্ধির অংশীদার করতে পেরে আমি ধন্য হয়েছিলাম।

তিনি আমার আনন্দের সরিক ছিলেন না—ছিলেন একজন মস্ত সহযোগী ও সহায়। আমার সত্যিকার বন্ধু বা স্বজন খুব বেশি নেই তুমি জানো। অবশ্য মৌখিক বন্ধু ও আত্মীয়তাকামী সংসারে অগুন্তি—কিন্তু যে friend in need-কে সাহেব-পুরাণে বলেছে খাঁটি বন্ধু সে রকম বন্ধু স্পর্শমণির ম'তই বিরল। ধরণীদা ছিলেন এই বিরলদেরই অন্যতম—খাঁটি সোনা। তাই তাঁর সঙ্গে আমার সখ্য-সম্বন্ধের নানা কথা বলতে বাধে—তার দরকারও দেখি না। কেবল একটা ঘটনা বলি সকুণ্ঠে। এবার শিলঙে স্নিগ্ধহৃদয় বন্ধু পাহাড়ি একদিন বলে ধরণীদাকে: "দেখ তো ধরণীদা, মণ্টুদার জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। একেই আমি মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, নিজের চা পার্টির জলশার ঝক্কি সামলাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত—এদিকে মণ্টুদা লোক লেলিয়ে দেয়—যাও পাহাড়িকে নেমন্তন্ন ক'রে এসো গানের আসরে। না বলতেও বাধে—"

ধরণীদা বাধা দিয়ে হেসে বলল: "ঐ তো পাহাড়ি। ঐ গরু রোগেই ঘোড়া মরেছে—আমারও অবিকল ঐ অবস্থা। ও যেখানে যেতে বলবে আমাকে যেতেই হবে—যতই শরীর খারাপ থাক—অনিচ্ছা থাক—অসুবিধা হোক্—ও পাগ্‌লাটার মুখের দিকে চাইলে না বলা যায় না জানোই তো।"

একথা উদ্ধৃত করতে সত্যই কুণ্ঠা বোধ করছি। তবু উল্লেখ করলাম শুধু দেখাতে, স্বল্পবাক্ ধরণীদার স্নেহপ্রীতি কি ধরণের অন্তঃশীলা ছিল। অথচ বলেছি, আমি তাঁর বন্ধুত্বের জন্যে কোনো চেষ্টাই করি নি, বা ভাবিনি যে এমন না চাইতে পাব। তবে জীবনের সব শ্রেষ্ঠ দানই তো পাই আমরা আকাশের দাক্ষিণ্যে, আলোর ঔদার্যে।

কেবল একটা বেদনা বাজে তবু।

এহেন স্নিগ্ধ সত্যনিষ্ঠ খাঁটি পরোপকারী নিরভিমান মানুষটি কী যন্ত্রণা পেয়েই যে দেহত্যাগ করল রাণী! আর কী পরিবেশে! একটু বর্ণনা না করলেই নয়—কেন না ধরণীদার মহত্ত্বের ছবিটি ফোটাতে এ বর্ণনার প্রয়োজন আছে।

আমরা সদলবলে শিলঙ রওনা হবার দিন তুমি ষ্টেশনে গিয়েছিলে। মনে আছে তোমার—কী আনন্দ নিয়ে রওনা হয়েছিলাম আমরা সাতজন—ধরণীদা, প্রভাদি, লীলা, বাবুল, উমা, রুনু ও আমি? ট্রেনে উঠতেই দেখা বিখ্যাত অস্ত্রভিষক্ শ্রীললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে। তখন কে জানত ফের তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কোথায় ও কী ভাবে।

শিলঙে গিয়ে আমরা উঠেছিলাম কোথায় তুমি জানো—ধরণীদারই তৈরি রেইনকোর্স্‌ড্-কংক্রীটে-গাঁথা সুরম্য অট্টালিকায়। তোমাদের বাড়ির কাছেই।

সেখানে বন্ধুবর পাহাড়ি সান্যালের অভ্যুদয়। সঙ্গে তাঁর পত্নী সুবাসিনী সুহাসিনী মীরা। দুজনে চেঞ্জে গিয়েছিল ছুটিতে। "চেঞ্জ" চুটিয়েই হ'ল বৈ কি—তবে ফর্ দি বেটার্ কি-না সে বিচারের ভার কার উপরে জানি না।

পাহাড়ির আবির্ভাবে পাহাড় আরও সরগরম হ'য়ে উঠল। জায়া মীরা পতির ছায়া হ'য়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা আমাদের ওখানেই কাটাত। শেষে এমন হ'ল যে, (ধরণীদার ও প্রভাদির স্নেহাধিক্যে) ওরা দুবেলাই আমাদের এখানে খেত। পতির মুখে শুনতাম কত যে হাসির গল্প—পত্নীসংক্রান্ত। বললে: "জানো মণ্টুদা, মীরা কী ওরিজিনাল ইংরাজি বলে? এক বাড়িতে গিয়েছি, সেখানে সবাইয়েরই

একটু অল্পবিস্তর ভুঁড়ি আছে। গীরা বলল ফিশফিশিয়ে—'দেখেছ, এ-পরিবারে ভুড়িটা কী কম্পালসরি!'" ব'লে সে কী হাসি! হাসতে ওর জুড়ি মেলা ভার। উর্দু গল্প ও যে কী চমৎকার বলত! আর এ ও পারত ধরণীদার আনন্দ-সহযোগে—সপরিবারে হাস্যোৎসাহে।

পাহাড়ি তব্‌লাও বাজায় সুন্দর। উমা গাইত হয় ভীষ্মর শেখানো খেয়াল, নাহয় আমার শেখানো বাংলা বা হিন্দি গান। পাহাড়ি ওর গানে এতই মুগ্ধ হ'য়ে গেল যে রোজই তবলা ধরত বাকায়দা বেঁধে—প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক ক'রে সময় আমরা ওর এই তবলা বাঁধার জন্যে বাদ দিয়ে রেখেছিলাম। কাজেই আমাদের অহোরাত্র ছিল আসলে তেইশ ঘণ্টা ব্যাপী।

ক্রমশ আমাদের দল আরো পুরু হ'ল: ধরণীদার অতিথি হ'লেন আরো চারজন:—তাঁর মেজ শ্যালক শীতাংশু—এর কথা বলেছি গত সংখ্যায়, লীলাকে ক্ষ্যাপানোয় এর জুড়ি নেই সত্যিই—রসবোধে তথা দরদেও এর চরিত্র মনোরম; তাঁর ছোট শ্যালক শুভ্রাংশু—এর যেমন প্রিয়দর্শন কান্তি, তেমনি মধুর স্বভাব ও উজ্জ্বল বুদ্ধি; স্বনামধন্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ—এর মতন গিটারী সারা ভারতে আছে কি না সন্দেহ, তেমনি তবলচি, তেমনি হার্মোনিয়মী; আর আমাদের সর্বকর্মপণ্ডকারী মণিময় ওরফে লাটু—যার স্বধর্ম বিনা মূলধনে সব্বার কাছ থেকে খাতিরের সুদ আদায় করা: আশ্চর্য এই যে ওকে এই আক্রাগণ্ডার দিনে সবাই অম্লানবদনে চড়া হারে সুদ দিত না কর্জ ক'রে! আঁতুড় ঘরে বিধাতাঠাকুর নিশ্চয় ওর ললাটে লিখেছিলেন:

যদিও তোমার নেই মালা হার তিলক কবচ কুণ্ডল—
টিপ্পনি রণে শিশু তব সনে যে যুঝিবে হবে দুর্বল।

ভীষ্মর আসার কথা ছিল, শেষ মুহূর্তে লিখল ফিলম-জগতে দু-দুটো ছবি রুখে উঠেছে আত্মপ্রকাশ করব ব'লে—সুতরাং মণ্ট্‌দা, মাফ করবেন ইত্যাদি। এ মধুর-চরিত্র অপূর্ব গায়কটির গীতিশক্তি ছাড়াও আর একটি আশ্চর্য শক্তি আছে—ভোজনশক্তি তথা ভোজ্য বর্ণনা। আহা পক্ষি-মাংসের গুণকীর্তনে ওর কণ্ঠে গান উছ্‌লে ওঠে: "কত কত ভালোবাসা গো মা মানব সন্তানে, মনে হ'লে প্রেমধারা বহে দুনয়নে!" ধরণীদা নিত্য ওর কথা স্মরণ ক'রে আমাদের অজস্র দানাপানির সরবরাহ করার সময়ে বলত:

(আহা!)

ভীষ্ম এলোনা খেতেও পেল না এই র'য়ে গেল দুঃখ।
নাম যার হেন—তার বলো কেন বুদ্ধি হ'ল না সূক্ষ্ম?
ছুটি-অবকাশে কেন সে না আসে খাওয়া যার কাছে মুখ্য?
যত ভাবি তার গাফিলি—আমার মেজাজ হয় যে রুক্ষ।

যাই হোক্, সিলচরে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল এক সঙ্গীত সভায় যোগদান করবার। পথে সিলেটেও নিমন্ত্রণ "প্রগতি সঙ্ঘে" তথা "সংস্কৃতি মণ্ডলে"। ওরা বলল সাহিত্য সঙ্গীত দুয়েরই উদ্বোধন করতে হবে আমাকে। তথাস্তু ব'লে সিলেট রওনা হ'লাম চৌঠা জুলাই মোটরে।

সিলেটের পথ অতি সুদৃশ্য। কেবল দুঃখ এই মেঘরাজ সদলে হানা দিলেন—কেউ কিছুই দেখতে পেলাম না।

পথে কী যে কষ্ট! অমন ঘোরালো পার্বত্য পথ কখনো দেখিনি। শীতাংশুর ও রুণুর অন্নপ্রাশনের অন্ন ওঠে উঠে। লাটু, শুভ্রাংশু ও আমার অবস্থাও তথৈবচ। বাকি সবাই ছিল খাড়া হ'য়ে কোনোমত প্রকারে। কেবল ধরণীদা ছিল পূর্ণোৎসাহী বিমলকরুণাবন্দনে দীপ্তকণ্ঠঃ।

সমতল ভূমিতে নেমে আমাদের বাঙালি প্রাণ উঠল গান গেয়ে। খরস্রোতা নীলাঞ্চলা ডাহুকি নদীতে পাহাড়ি, আমি ও লাটু স্নান করলাম। কী মধুর জল আর কী সে দৃশ্য! আহা!

সিলেটে উঠলাম ওখানকার বিখ্যাত বর্ধিষ্ণু ডাক্তার শ্রীহোসেন পাল মহাশয়ের ওখানে। তিনি ও তাঁর স্ত্রী শান্তিলতা দেবী আমাদের তেরজন যাত্রীর কী সেবাটাই যে করলেন! বিশেষ ক'রে শান্তিলতা দেবীর শান্তশ্রী কল্যাণী মূর্তি ভুলবার নয়।

ধরণীদা সেখানে ঐ ভিড়ের মধ্যেও নিজে সবাইয়ের সঙ্গে শুল কষ্ট ক'রে—আমার জন্যে ছেড়ে দিল সবচেয়ে ভালো ঘর ও মশারিওয়ালা খাট। এ ওর স্বভাব—আমি যত বলি না না না না, ও তত বলবে হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ।

সিলেটে যাহোক দিলাম একটা বক্তৃতা। পরে উমা ও আমি গাইলাম, পাহাড়ি তবলা বাজালো, জ্ঞান—হার্মোনিয়ম।

পরদিন রওনা হ'লাম সিলেট—বাসে ক'রে—৫ই জুলাই—সকাল সাতটা।

*   *   *   *

ধরণীদা আমাকে দিল ফের শ্রেষ্ঠ আসন—সারথির বাঁ পাশে। পা মেলে বসা যায়। আমার ঠিক পিছনে পাহাড়ি, তার ডাইনে জ্ঞান, তার পর লাটু, তার পর হাসি, লীলা ও গীরা। তৃতীয় পংক্তিতে একেবারে বাঁ দিকে—অর্থাৎ পাহাড়ির ঠিক পিছনে ধরণীদা, তাঁর পাশে শীতাংশু, তার পর শুভ্রাংশু বাবুল, রুনু ও প্রভাদি। সব পিছনে দুটি চাকর, সিলচরের গাইড, আর একটি লোক, সারথির বন্ধু হবে। একুনে আঠার জন।

বলা বাহুল্য বাসের ছাদেও হিমালয় প্রমাণ মাল স্তূপীকৃত।

গাড়ি চলল হু হুশ্‌ শব্দে। চমৎকার রাস্তা—সুর্মা নদীর পাশ দিয়ে। বর্ষা কালের "উচ্ছল জলদল কলরব!" দুধারে ধানক্ষেত, সবুজ গাছ পালা; কৃষাণের কুটীর খাত বিল ডোবা নালা। লাল রাস্তা—সমতল। ঝাঁকুনি লাগে কদাচ। আর একেবারে সোজা। একটিও বেঁক নেই কোথাও। পাহাড়ি ও জ্ঞান আমার পিছনে ব'সে আহিরি টোড়ি আলাপ করছে তার-স্বরে, আর কদরদান লাটু তার বিনা মূলধনী কারবার চালাচ্ছে শুধু বাহবাধ্বনির নির্থর্চা বাশিসের হরির-লুটে। আমি দেখছি—বাসের কাঁটা কাঁপছে ৪০ থেকে ৪৫ মাইলের মধ্যে।

হঠাৎ একটা বেঁক। সারথি নিশ্চয় জানত না—নইলে গতি মন্দা করত। কিম্বা হয়ত আন্‌মনা ছিল। কারণ যাই হোক ঐ উল্কাবেগেই সে বেঁক নিল। গাড়ি বেঁকল ঐ—ঐ—ঐ। ব্রেক কষল। পিছনে ক্রন্দন আর্তনাদ কানে এল। গাড়ি টাল সামলাতে না পেরে একবার সমারসল্ট খেয়ে ছাদহারা হ'য়ে মালপত্র প্রায় সব ডুবিয়ে পড়ল বাঁ দিকে একটা ডোবায়—বাঁ কাতে। আমি ঘোর বেগে ছিটকে পড়লাম আমার বাঁ কাঁধের উপর। হাড়টা ভেঙে যায় নি এ আশ্চর্য, গেলে উঠতে পারতাম না হয়ত। বুকেও চোট লাগল হাঁটুতেও, রগেও এক জায়গায় খুব কেটে গেল—রক্তে মুখ ভেসে গেছে। গাড়িটা একেবারে গুঁড়ো হ'য়ে গেছে বললে সত্যিই একটুও বাড়ানো হবে না। ছাদ উড়ে গিয়ে, চাকা ভেঙে, তাল পাকিয়ে তার চেহারা যা দাঁড়াল—দেখলে কে বলবে কোনোকালে এ-পিণ্ডটার কোনো রূপ মূর্তি ছিল।

কিন্তু সব ভুলে গেলাম মেয়েদের কান্না শুনে। তাড়াতাড়ি উঠে পিছল কাদায় ডোবায় নামবার চেষ্টা করছি আগে ছোটদের ওঠাতে—কিন্তু এত কাদা পা দাঁড়ায় না। দেখি সাম্‌নে লাটু নেমেছে, বলছে—মেয়েদের তোলো তোলো। পাহাড়িও উত্তীর্ণ—বলছে—"কিচ্ছু ভয় নেই।" দেখতে দেখতে প্রায় দশ পনের জন গ্রামবাসী লাফিয়ে পড়ল ডোবাটার মধ্যে ও একে একে তুলল সবাইকে। লীলার চোখের নিচে কেটে গেছে, রুনুয়ের কাছেও। উমার হাত কেটে গেছে। গীরার কপাল হাত কব্জি বেয়ে রক্ত পড়ছে। কেবল শুভ্রাংশুকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে অজ্ঞান হয়ে ডোবার জলে ডুবে ছিল খানিকক্ষণ। যাহোক গ্রামবাসীরা সবাইকেই যথাসম্ভব দ্রুতবেগে ডাঙায় টেনে তুলল।

কিন্তু সব গোলমাল থম্‌কে গেল ধরণীদাকে দেখে। সবাইয়েরই অল্প বিস্তর চোট লেগেছে, কিন্তু সাংঘাতিক লাগল শুধু ঐ একটি মানুষের। পাঁজরার পাঁচ পাঁচটা হাড় ভেঙে গেছে, কণ্ঠারও একটা। পাহাড়ি প্রথম চেঁচিয়ে ওঠে: "ধরণীদাকে সব আগে তোলো।" কারণ ধরণীদা উঠতে পারছিল না—ধরণীদা পাহাড়ির দিকে চেয়ে বিস্ফারিত নেত্রে বলছে "পাহাড়ি—I am undone."

সবাই মিলে ধরণীদাকে তুললাম কাছের একটা ডিস্পেন্সারিতে। পাড়াগেঁয়ে ডিস্পেন্সারি—মেটো ঘর।

দেখি, ধরণীদার বুকের পাঁজরা ক'টা ভেঙে ভিতরের দিকে একেবারে ঢুকে গেছে। বুকটার মাঝখানে গর্ত। নিঃশ্বাস ফেলছে—হাপরের মতন—থাক সে বর্ণনা। উমা প্রভাদি লীলা প্রভৃতির অবস্থাও বর্ণনীয় নয়—কল্পনীয়।

কাছেই ছিল পোস্ট্ আফিস—নইলে চক্ষে অন্ধকার দেখতে হ'ত সে-বিভূঁয়ে। গ্রামটির নাম চুরখাই। সিলেট থেকে মাইল কুড়ি হবে। টেলিফোন নেই—তার করা হ'ল হোসেন পাল মহাশয়কে। ঘণ্টা খানেক বাদে তিন-চার খানি মোটর নিয়ে এলেন ডাক্তার হোসেন পাল, ডাক্তার সেন, ডাক্তার কর ও মহিরুদ্দিন সাহেব। আরো হয়ত কেউ এসে থাকবেন মনে নেই। এ ঘণ্টাখানেক আমাদের যে ভাবে কেটেছিল তার পরে স্মৃতিশক্তির কোন ভুলকেই ভুল মনে হয় না।

ডাক্তার সেন আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে যা

বললেন তার মর্ম এই যে, ধরণীদার জীবনের কোনো আশাই নেই, দুধারের ফুশফুশই জখম হয়েছে—তাই এত নিশ্বাসের কষ্ট ইন্‌টর্ণল হেমরেজের দরুণ।

আহা! সে কী কষ্ট! চোখে দেখা যায় না। অথচ আশ্চর্য এই ধরণীদার মস্তিষ্ক স্বচ্ছ—কথায় নেই একটুও জড়তা।

কিন্তু যারা এ দৃশ্য দেখছে পাশে ব'সে, তাদের বুকের মধ্যে না জানি কী হচ্ছে! বিশেষ ক'রে প্রভাদির ও উমার! চোখের জলে বুকের বেদনার কতটুকুই বা ধরা দেয়!···

ধরণীদার আর্তধ্বনি শুনতে শুনতে একথা আরো মনে হচ্ছিল। এ-বর্ণনার পালা তাই সাঙ্গ করি। কেবল এইটুকু বলবার মতন যে ঐ অসহ্য যন্ত্রণায়ও ধরণীদা কান্নাকাটি করেন নি; এমন কি সারথিকেও অভিশাপ দেন নি, বারবারই জিজ্ঞাসা করেছেন কে কেমন আছে। একটি বুড়ি ওঁকে পাখা করছিল। আমরা তাকে সরিয়ে দিতে যেতে ধরণীদা বলল: "আহা, থাক ও বড় ভালোবেসে পাখা করছে।"

দুবার বলেছিলেন "শ্রীঅরবিন্দ।"

শ্রীঅরবিন্দকে তার করলাম ধরণীদার আত্মার শান্তির জন্যে।

* * * *

হাসপাতালেও ধরণীদা মৃত্যুর খানিক আগেও বলেছিল নার্সদের (আমার সাম্‌নে): "I am causing so much trouble to the hospital—sorry, but I can't help it."

* * * *

সকাল আন্দাজ আটটার সময় মোটর দুর্ঘটনা ঘটে—ধরণীদা মারা গেলেন বেলা দুটোর কাছাকাছি। পরিবারবর্গের শোকের কথা বর্ণনীয় নয়—কল্পনীয়।

* * * *

লোকে লোকারণ্য। সবাই কত যে করেছিল। টেলিফোন করা হ'ল বিধানবাবুকে কলিকাতায়, ললিতবাবুকে শিলঙে। ললিতবাবু মোটরে তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন। পৌছলেন শিলঙে সন্ধ্যা ছটার সময়ে।

* * * *

শিলচরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীগুরুপ্রসাদ বড়ুয়া আমার তার পেয়ে স্ত্রী ও কন্যা লিলিকে নিয়ে এলেন। লিলির সঙ্গে আমার চিঠিতে ও টেলিফোনে ট্রাংক কলে আলাপ ছিল। লিলির সখী ঊষা ওর কথা প্রায়ই বলত। লিলিও শ্রীঅরবিন্দের প্রতি গভীর ভক্তিমতী। বলল আমাকে একটি বড় আশ্চর্য স্বপ্ন:

"দিলীপদা, কাল রাতে আমি প্রথম স্বপ্ন দেখি আপনাকে। আপনার মুখ এত বিষণ্ণ! আমি শুধালাম: 'ঊষার কাছে কত যে শুনেছি আপনি আনন্দময় পুরুষ, কিন্তু আপনার এ কী বিষণ্ণ চেহারা!' আপনি বললেন করুণ হেসে: 'কী হ'য়ে গেল লিলি জানোই তো—তার পরে কি আর কেউ আনন্দ করতে পারে, বলো তো।'

মোটর দুর্ঘটনা ঘটল পাঁচই জুলাই সকালে, লিলি স্বপ্ন দেখেছিল চৌঠা জুলাই রাতে। স্বপ্নে টেলিনিশনের কথা বইয়ে অনেক পড়েছি—এ-ভাবে প্রত্যক্ষ করিনি কখনো। বুদ্ধি এ-হেঁয়ালির কী সমাধান করবে?

* * *

এ নিয়ে অনেক সংশয়ীর চিঠি পেয়েছি বৈ কি। কুইনি আমাকে লিখেছে—ভগবানের এ কী অবিচার—ভালো লোকেরই বা কেন এত কষ্ট, প্রভাদির মতন মীর, উমার মতন মেয়ের কপালে এত দুঃখ কেন? কী সার্থকতা এ হেন যন্ত্রণার?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? মঙ্গলময়ের সৃষ্টিতে অমঙ্গল কেন? সত্যময়ের সৃষ্টিতে মিথ্যা কেন? আনন্দময়ের সৃষ্টিতে নিরানন্দ কেন? অব্রণ অপাবির অপাপবিদ্ধের সৃষ্টিতে জরা মরণ পাপ কেন? মন কি পায় কোনো পরম প্রশ্নের চরম জবাব?

* * *

জাগতিক দিক দিয়ে এহেন ধাঁধার কোনো সমাধান করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয় রাণী। এমন কি তুমি যদি প্রশ্ন করো—"এ-ঘটনায় কি তুমি খুশি হয়েছ?" তাহ'লেও বলতে পারব না—"হয়েছি।"

তবু একটা কথা বলতে পারি। বলা কঠিন, হয়ত বোঝাতে পারব না কী বোঝাতে চাইছি—তবু এ-ধরণের গভীর অনুভূতির যদি কিছুও প্রকাশ করতে পারি তৃপ্তি

পাব। তোমায় কাছে বলতে যাওয়া সহজ হবে—যেহেতু তুমি আমার গুরুবোন—বুঝবে, বিশ্বাস করবে।

* * *

যখন আমাদের বাসটি প'ড়ে যায় তখন আমার বেশ মনে আছে আমার চেতনার প্রতি তন্ত্র ছিল তীক্ষ্ণ সজাগতার সুরে বাঁধা। স্পষ্ট মনে আছে ভয় আসে নি, যদিও মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। সে দর্শনের বর্ণনা অসম্ভব কারণ সে অনুভবের আলোর সঙ্গে ছায়া মিশে। কিন্তু মরণের গহ্বরে কই অন্ধকার তো চোখে পড়ে নি! মনে হয় নি তো একবারও—সে-রাজ্য আঁধারে-ঘেরা!

বরং পরিষ্কার মনে আছে—একটা অপূর্ব নির্ভরের ভাব মনে প্রবল ছেয়ে। সে সময়ে আমার নার্ভাস হবারই কথা—আমি এই জন্যে যে আমি দেহবিলাসী লোক—দৈহিক যন্ত্রণা একেবারেই সইতে পারি না—হয়ত আরো এই জন্যে যে পথ আমার করে খু—বই কম। কিন্তু তবু মনে আছে মনের অতলে এক অননুভূতপূর্ব শক্তি ছিল নিটোল হ'য়ে। প্রকৃতিতে আমি জ্ঞানী নই—আমি জানি, যদিও জ্ঞানের দিক আমার ঔৎসুক্য অকৃত্রিম, তবু আমার তৃষ্ণার তা জ্ঞান নয়—সে ভক্তি। এসময়ে সেই ভক্তির ভাবই আমাকে আশ্রয় দিয়ে থাকবে।

তাই শান্ত এসেছিল অমন সমাহিতি: মনে হয়েছিল—কী যায় আসে! মনে হয়েছিল—কিছু চাই না আর, কারণ সবচেয়ে বড় চাওয়ার যা তা পাবই কোনো অলক্ষ্য প্রসাদে। আর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে ঢল নেমেছিল কৃতজ্ঞতার। সে কী কৃতজ্ঞতা যে—অবর্ণনীয়!

কেন এ-কৃতজ্ঞতা? গুছিয়ে বলা শক্ত। কেন না যুক্তি দিয়ে কলিয়ে তোলা যায় না এর মর্ম-মূর্তিটিকে। কারণ বলেছি, আমার মৃত্যু আসন্ন একথা একবারও মনে হয় নি। এ আশ্চর্য, কিন্তু আরো আশ্চর্য এই যে, আমার স্নায়ু এতটুকুও চঞ্চল হয় নি। কারণ পতনের মুহূর্তে যদিও আমি বোধ করেছিলাম যে, আমি এক অলক্ষ্য মারণশক্তির কবলে পড়ছি পাতালে—তবু সঙ্গে সঙ্গে এও অনুভব করেছিলাম যে আমার কে ধারণ করে আছে বর্মের মতই আগ্‌লে। আমার কোনো যোগ্যতায় এ ঘটে নি এ চেতনাও আমার ছিল—অযোগ্য না হ'লে করুণার অবকাশ কোথায় বলো?

কৃতজ্ঞতা এসেছিল এই গভীর করুণার অনুভবেই। জানি একথায় আমার বুদ্ধিমান বন্ধুরা প্রায় সবাই হাসবেন। তাঁদের বুদ্ধি নিশ্চয় যথোচিত তীক্ষ্ণ ও যুক্তি যথোচিত অকাট্য। কিন্তু আমার এ-অনুভবকে অপ্রমাণ করতে পারে এমন কোনো এক্তিয়ারই তো নেই কোনো বুদ্ধির। অবশ্য অবিশ্বাসের কথা আলাদা। তবে আমি তো বলেছি আমি কিছুই প্রমাণ করতে কোমর বেঁধে বসি নি। আমি শুধু বলতে চাই এ-সময়ে অনুভবের একটা অন্য ছন্দ আমার কাছে গোচর হয়েছিল—সে-ছন্দ আলোর নয়, সে ছন্দ ছায়ার অথচ কী স্নিগ্ধ সে-ছায়া—শান্তির উদ্ভাসে-ভরা—ওতপ্রোত। এর পাশে আমোদ আহ্লাদ, গল্পগুজব, হিসাবকিতাবের ছন্দকেই মনে হয় মায়া, সাঁঝের অনুরাগে যেমন মনে হয় মধ্যাহ্নের প্রাণদীপ্তিকে। আর শুধু তখনই নয় তার পরেও—বার বার হাসি-গল্পের সময়ে মনে হয়েছে—আমাদের জীবনের চপলকল্লোল মরণের গভীর ছন্দকে কী আশ্চর্য ঢেকে রাখে!

রাখে, কেন না আমরা সচরাচর চাই এই মামুলি ছন্দই—চেনা পথের বিশ্বস্ত প্রবোধ, সহজ ইশারা। চেতনার যে লোকে আমরা বাস করি তার মধ্যে নেই কোনো অচিন পথের হাতছানি। তাই আমাদের জীবনের এত বেশি লীলা-খেলা গড়পড়তার রাজ্যেই, নয় কি? দেখাশুনো, গল্পশল্প, আমোদআহ্লাদ, গানবাজনা, আসাযাওয়া, লেখাপড়া, খেলাধুলো, নিন্দাস্তুতি, ভাবনাচিন্তা—এই সব নিয়েই আমরা ঘর করি। কিন্তু কেন? কারণ আমাদের দৈনানুদৈনিক জীবনের খেলা ঘর—তাসের ঘর—সচরাচর আমরা বাঁধি এই নৈশ্চিত্যের বালুভিত্তির পরে যে, এ-জীবন চিরদিনের। মৃত্যুর কথা রোজ শুনি, রোজ পড়ি, কিন্তু কোনোদিনই "ভাবি" না—মানে, ও নিয়ে সত্যি মাথা ঘামাই না। তাই জীবনের মুখরতা মৃত্যুর সমাহিতিকে তেম্‌নি ঢেকে রাখে যেমন দিবালোকের পর্দা ঢেকে রাখে তারালোকের জ্যোতিকে। এ সে পারে শুধু এই জন্যেই যে সসীপের ছন্দ আমাদের কাছে বেশি সত্য, সুদূরের ছন্দ বেশি ঝাপ্‌সা। কিন্তু ঝাপ্‌সা যে সব রাজ্য তারা ঝাপ্‌সা এ জন্যে নয় যে তাদের বাণী কম সত্য কম বাস্তব। তাদের মর্ম বাণীটি ঢের বেশি জীবন্ত স্পন্দমান—কেবল সে আমাদের কাছে হাজিরি দিলেও আমরা টের পাই না আমাদের

চেতনার তন্ত্রী সে-সুদূরের সুরে বাঁধতে আমরা শিখি নি ব'লে। দৈনন্দিন জীবনের বাণীর সুর কাছের সুর কি-না—তাই সে-সুরে চেতনা তন্ত্রী বাঁধা সহজ। কিন্তু অভাবনীয় আকস্মিক সুদূর যখন হঠাৎ রূপ নেয় সমীপে—যখন অচিন-চেনা সুরে গান বেজে ওঠে :

"সুদূর যখন বাজায় নূপুর প্রাণে তখন বাজে বাঁশি
আকাশ বাতি ধরলে তবেই ধরার ধুলা হয় উদাসী—"

তখনই বোঝা যায় যে সুদূরের চেয়ে আপনার আর কেউ নয়। জীবনের কলরোল প্রায়ই ঢাকে এই পরমাত্মীয় গভীর সুরটিকে। তাই তাকে প্রকাশ করতে হ'লে চাই মরণের স্বয়ম্প্রকাশ নীরবতা।

মৃত্যুর এই অভয়-সুরটি আমার জীবনের তারে প্রথম কেঁপে ওঠে ঐদিন। তাই হয়ত ভয় পাই নি। তাই হয়ত সহযাত্রী ও সঙ্গিনীদের সবাইকার সঙ্গেই একটা গভীর বন্ধনের কোমলতা অনুভব করেছিলাম—যে-বন্ধন জীবনের প্রখরতার মাঝে যায় শুকিয়ে। তাই হয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি হ'য়ে আনন্দের যে মন্দ্রধ্বনিটি আমার কাছে সেদিন কানে এল তার মধ্যে বেজে উঠেছিল অমন সুন্দর, সমাহিত ও গভীর দীনতার ওঙ্কার মন্ত্র। কৃতজ্ঞতা ছেয়ে এসেছিল এই জন্যেই—মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে নয়। তাই বন্ধুর মৃত্যুযন্ত্রণায় বেদনা পেলেও ভগবানের কাছে কোনো অনুযোগ করবার কথা মনেও হয় নি। শুধু এই প্রার্থনাই জেগেছিল :

অকূল পানে মনকে আমার দাও ফিরিয়ে হে কাণ্ডারী!
মেলতে শেখাও উদাস প্রাণের পালগুলি সব তোমার মুখে।
তরী আমার আজকে তোমায় বরণ ক'রে হে দিশারি,
ছুটুক উধাও অসীমতায়—আলোয় ছায়ায়, দুঃখে সুখে।

স্বপ্ন হেন ভুলেও না স্বার্থ-রঙিন মালা গাঁথে।
আশা যেন ভুলেও না চায় মরীচিকা ফিরে ফিরে।
ছায়া আমার যত আছে চলুক তোমার আলোর সাথে।
লাজুক যত প্রণাম-কলি ফুটুক তোমার চরণ-তীরে।

তুমি যদি হাত না ধরো—একলা পথে কোথায় সাথী?
তোমার মলয় বিনা প্রেমেশ, বাসন্তী-প্রশান্তি কোথা?
শুধু তোমার প্রসন্নতার উষায় কাটে অশ্রু-রাতি।
শুধু তোমার স্পর্শ-প্রভায় যায় মিলিয়ে আঁধার-ব্যথা।

হৃদয় মাঝে থেকে তুমি হৃদয় দিয়ে চাও আপনি
হৃদয় তোমার—তাই না জাগে বুকে বুকে গগন তৃষা!
কাঁটার কালো আর্তনাদে গাও গোলাপের জয়ধ্বনি,
চিহ্নহারা পারাবারে তাই না মেলে তারা-দিশা!

মেঘে মেঘে ওঠে বেজে তোমার মন্ত্রমেদুর মাদল :
ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোলে তোমার নৃত্যনিবিড় রূপের বাহার।
পাতায় পাতায় চমকে ওঠে তোমার শোভা—স্নিগ্ধ শ্যামল।
প্রাণ যদি গায় গান দুরাশার—কণ্ঠে জাগে সুরের পাথার।

মোরা চলি ভাববিলাসই গেয়ে অলস কলধ্বনি'
নিভিয়ে ছোট সাধের মেলায় দূর-সাধনার বিশাল শিখা।
বালুচরে তাসেরি ঘর বেঁধে তারে পরম গণি।
ক্ষণিক নেশার আবেশ নিয়ে সাজাই অলীক দীপালিকা।

চির চেনায় তাই মনে হয় অপরিচয়-ছায়ায়-ঘেরা।
দীপ্ত শিখর হয় মনে হায় শুভ্র-নিঠুর, তীক্ষ্ণ-কঠিন।
সর্বহারা বাঁশি ডাকে—দায় হয় যে ঘরে ফেরা।
বরণমালা তাই না গাঁথি—অলখ প্রিয় নয় তো অচিন।

আড়াল স'রে আজ গেছে, তাই উঠলে ফুটে স্মরণীয়!
করালী আজ কিরণমালী—মরণে জয়শঙ্খ বাজে।
আঘাত দিয়ে দেখালে—কে ব্যথার মাঝে বরণীয় :
শূন্যতারো একাকারে সার্থকতা আছেই আছে।

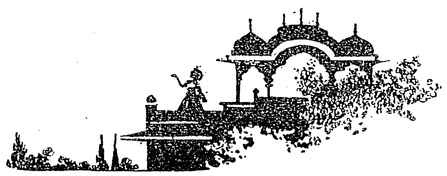

ইতি।

সঙ্গীত

কথা :—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য সুর ও স্বরলিপি :—শ্রীমতী সাহানা দেবী

ভীমপলশ্রী—তেওরা (ঠায়ে)

গভীর নীরবতা মন্থি' তব বাণী
সুপ্ত অন্তরে উঠিল জাগি'
অন্ধ তমোরাশি নিমেষে দিলে নাশি'
আসিনু তব পাশে মিলন লাগি'।
প্রণয় মধুরসে স্বপন সিঞ্চিয়া
তোমারি সঙ্গীতে সে সুর ঝঙ্কিয়া
ধরিল ধ্বনি তব এ-অনুরাগী।
যাপিয়া ছিনু কত অনিদ বিভাবরী
তৃষিত আঁখি মেলি' তোমারি আশে,
আসিলে আজি তুমি শ্রাবণ বরষণে
তাপিত চিত নিলে সে-রস-রাসে।
হে প্রিয় কাঙ্ক্ষিত, হে প্রাণ-রঞ্জন
অর্ঘ্য লহ তব লহ এ তনু মন
লহ এ রঞ্জিত জীবন-রাখী ॥

[সণা]
II { মা ণ্ । সা | মজ্ঞা মজ্ঞা | মরা সা | পাঃ মঃ ধপা | মজ্ঞা মজ্ঞা | মরা সা |
গ ভী র নী র ব তা ম ন্ থি ত ব বা ণী

পা -া পাম | পমা ধপর্সণা | পধা পা | পমা পা মজ্ঞা | মজ্ঞা -া | মা জ্ঞমা | }
সু - প্ত অ ন্ ত রে উ ঠি ল জা - - গি'

{ পণা -া ণা | ণাধ র্সণা | পধা পা | পণা ণর্মা ণর্সা | ণর্সা ণা | পধা পা | }
অ ন্ ধ ত ম- রা- শি নি মে ষে দি- লে না শি

মজ্ঞা মা পা | মণ্ । সা | মজ্ঞা পমা | ধপা ণধা পা | মজ্ঞা -া | মা জ্ঞমা II
আ- সি নু ত ব পা শে মি ল ন - - - গি'

{ পা পাম ধপা	মজ্ঞা মজ্ঞা	জ্ঞা মা	পণা ণা ণা	ণপা র্সণর্সা	র্সা র্সা
প্র ণ য়	ম- ধু	র সে	স্ব প- ন	সি -ন্	চি য়া
হে প্রি য়-	কা -ঙ্	ক্ষি ত-	হে প্রা ণ	র ন্	জ ন

পণর্সর্রা ণর্সজ্ঞা জ্ঞা	র্রা র্সা	র্সা র্সা	ণর্সা ণর্সা র্সা	র্সণা -া	পধা পা	}
তো - মা - রি	স ঙ্	গী তে	সে- সু- র	ঝ ঙ্	কৃ য়া
অ - - র ঘ্য	ল হ	ত ব	ল হ এ	ত নু	ম ন

মা পা মজ্ঞা	জ্ঞণ্া ণ্া	সা সা	মজ্ঞা পমা ধপা	র্সণা পধা	মপা মজ্ঞা II
ধ রি ল	ধ্ব নি	ত- ব	এ অ নু	রা -	- গী
ল হ এ	র ন্	জি ত	জী ব ন	রা -	- গী

পা মজ্ঞমা মপাম	পা মজ্ঞা	রসা জ্ঞজ্ঞা	জ্ঞণ্া সা মজ্ঞা	জ্ঞমা মপা	পা পা
যা পি য়া	ছি নু-	ক- ত	অ নি দ	বি ভা	ব রী

পমা ধধা পমা	পা মজ্ঞা	মপা মপা	পণা ণা ণা	পধা -া	ণপা পা
তৃ ষি ত-	আঁ খি	মে লি	তো মা রি	আ -	- শে

মজ্ঞমা পণা ণাধ	পা র্সা	ণর্সা র্সা	ণর্সা ণা পধা	পধা মপা	মজ্ঞা মা
আ - সি লে	আ জি	তু মি	শ্রা- ব ণ	ব- র-	ষ- ণে

ণা পধা পা	মপা মজ্ঞা	মাপ মপা	মজ্ঞা মজ্ঞা রসা	সরা -া	জ্ঞা সা
তা পি ত	চি- ত-	নি লে	সে- র- স	রা- -	সে -

গানটির সুরটি বেশ দুলিয়ে দুলিয়ে গাইতে হবে

নাগরিকা

শ্রীচরণদাস ঘোষ

এগারো

"তুমি ?"

তখনও কাহারো চোখের পলক পড়ে নাই, চিত্রা হাওয়ার ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে উঠিয়া আসিল, পটে-আঁকা ছবির মত কঙ্কনের সুমুখে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি ?" অতঃপর ওই মানব-বিগ্রহের নব-নির্ম্মিত আকৃতির পানে তাহার পরিপূর্ণ দৃষ্টি পড়িতেই সে শিহরিয়া একটু পিছাইয়া আসিল। তারপর আর একবার কঙ্কনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নিস্তেজ কণ্ঠে কহিল, "সব শেষ ?"

চিত্রা উঠিয়া আসিতেই কৌমুদীও তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া চিত্রার মুখে দৃষ্টি ফেলিয়া কহিল, "ইনি তোমার—"

"স্বামী !"

সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই সপ্রশ্ন কটাক্ষ উদ্যত হইয়া ফিরিল কঙ্কনের উপর। বেশি করিয়া পড়িল ত্রিবর্ণের।

কঙ্কন নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল। মুখ তুলিয়া মুখ দিয়া শুধু একটি কথা উচ্চারণ করিল—'না।'

"না ?"—অস্ফুট কণ্ঠে কঙ্কনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই বিবর্ণমুখে চিত্রা থরথর করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

সন্ধ্যা সমাগত। ত্রিবর্ণ একবার আকাশের দিকে চাহিয়াই ব্যস্ত হইয়া শিষ্যদের এক আসন্ন কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, "দীপালোক—"

মহূর্ত্তেই কৌতূহলীর দলে ভাঙন ধরিল। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া একে-একে চলিয়া যাইতে লাগিল। কঙ্কনও যেমন চলিয়া যাইবে ত্রিবর্ণ বাধা দিয়া কহিলেন, "তুমি নও !" তারপর চিত্রাকে দেখাইয়া বলিতে সুরু করিলেন, "উনি অসুস্থ —ওঁর সেবার ভার নেবে তুমি !" দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া কহিলেন, "তুমি ভিক্ষু— ভিক্ষুর কাজ মানুষকে জয় করা, আঘাত দিয়ে নয় বুকে বুক দিয়ে !" আর দাঁড়াইলেন না।

ঘনকৃষ্ণ এক যবনিকা কঙ্কনের মুখের উপর নামিয়া পড়িল —তাহার ভিতর দিয়া পৃথিবীর কোনোও দৃশ্য আর দেখা চলে না ! নিশ্চল হইয়া কঙ্কন দাঁড়াইয়া রহিল। যেন পা বাড়াইতে আর সে পারে না, অথচ না বাড়াইলেও নয় ; যেন কহিবার কথা আর তাহার নাই, অথচ না কিছু কহিলেও চলে না ; যেন বা প্রতিমা পূজার অধিকার তাহার বিলোপ হইয়াছে, অথচ অবহেলা করিতেও সে পারে না। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া চিত্রার কাছে সে সরিয়া গেল। তখন চিত্রা ছিল মাটির দিকে নত মুখে বসিয়া। আরও কিছুকাল অপেক্ষার পর অকস্মাৎ মরিয়ার মতো ডাকিয়া ফেলিল, "চিত্রা—"

চিত্রা মুখ তুলিল—তার দৃষ্টি শূন্য, উদাস !

কঙ্কন কহিল—'আমি !'

"তু-মি !"—চিত্রা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল ; বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন সে এক বিষবর্ষী সরীসৃপ দেখিয়াছে। পরক্ষণেই যেন সম্মুখে তাহারা মানুষ বলিয়া কে-একজন বুঝিতে পারিয়া সহজ কণ্ঠে কহিল, "না তুমি নও !" বলিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া সুমুখেই যে পথ পাইল সেই পথ ধরিল।

অধ্যক্ষের আদেশ—সেবা, আতিথ্য ! কঙ্কন বিব্রত হইয়া পড়িল। কি বলিতে হইবে, কি বলিলে ভালো হয়, কোন্ আচরণে তাহার ভিক্ষুধর্ম্মের নিয়ম পালন হয়, কঙ্কন ঠিক করিতে পারিল না। আনাড়ির ন্যায় বলিয়া উঠিল, "একটা কথা শুন্‌বে ?—আচ্ছা, দাঁড়াও না ?"

চিত্রা মুখ ফিরাইয়া রোষ-কটাক্ষ করিয়া কহিল, "স্মরণ রাখবেন— আমি স্ত্রীলোক !" বলিয়াই আবার দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিপদে পড়িল কঙ্কন ! একদিকে উপরওয়ালার নির্দ্দেশ, অপরদিকে অতিথির এই বিদ্রোহ ! কিন্তু, ভিক্ষু হইয়াছে— হাল ছাড়িলে চলিবে না ত ! কাজেই সেও পশ্চাদনুসরণ করিল। তখন মঠের চারিদিকেই দীপের মালা ঝুলিয়াছে— আলোয় আলো !

যে-টুকু শক্তি ধরিয়া চিত্রা প্রত্যাবর্ত্তনের দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল, তাহা বুঝিবা নিঃশেষ হইয়াই আসিয়াছিল, তাই সে আর চলিতে পারিল না! পুনশ্চ অবসন্ন দেহে টলিয়া পড়িয়া গেল।

কঙ্কনের বুকটা উড়িয়া গেল—অতিথি যে! এই অচল মুহূর্ত্তে কি করিবে সে, করা কি প্রয়োজন, করিলে কি মানানসই হয়, তাহা গুছাইয়া সে মনের ভিতর আনিতে পারিল না। না পারিয়া থতমত খাইয়া বিবর্ণ মুখে চিত্রার মুখের গোড়ায় বসিয়া পড়িল—ব্যাকুল দুই চোখে অসহায়ের ন্যায় মেয়েটির দিকে তাকাইয়া।

আবার সেই কাছাকাছি! চিত্রা ছিলাকাটা ধনুকের ন্যায় ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন অকস্মাৎ এক দৈবশক্তি মিলিয়াছে।

কঙ্কনও উঠিয়া দাঁড়াইল, উঠিতে হয় বলিয়া। তারপর ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অসুস্থ হয়ে পড়ছ! আজ থাকো না, থাক্‌বে?"

চিত্রা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ধরিল, বোঝা গেল এক চাপা কান্না হঠাৎ তার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া নিজেকে সংযত করিয়া শ্লেষ কণ্ঠে কহিল, "এখানে?—এখানে তুমি ধার্ম্মিক, আমি কুলটা!"

কঙ্কন মুখ নীচু করিল। একটু পরেই মুখ তুলিয়া কহিল, "তা কেন?—হ্যাঁ, দেখ—আমি ভিক্ষু!"

"উত্তম!"

"তুমি বিয়ে কোরো নন্দনকে—না, না!—যাকে হোক্!"

দপ্ করিয়া চিত্রার চোখ দুটা জ্বলিয়া উঠিল। কঠিন কণ্ঠে কহিল, "চুপ্ করো। আমার মর্য্যাদা আমি নিজেই রাখ্‌তে জানি!"

বিভ্রাট! কিন্তু দমিলে চলিবে না—'জয়' করিতে হইবে, 'বুকে বুক দিয়া'! কঙ্কন জবাব দিল, "তা জানি! তোমার রূপ আছে!"

রূপ? * * * টক্‌টকে রাঙা রঙে চিত্রার মুখখানা রাঙিয়া উঠিল—রূপ! কিন্তু সে এক মুহূর্ত্ত! পরমুহূর্ত্তেই উহা একেবারে গম্ভীর ও অতিরিক্ত কঠিন হইয়া উঠিল। তারপর কঙ্কনের প্রতি এক শপথ-কঠিন ভ্রূকুটি করিয়াই পিছন ফিরিল এবং উল্কার ন্যায় অনল ঝলকে চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। * * * কঙ্কনের আর পা উঠিল না। হঠাৎ যেন সে টের পাইল—ওই দূরযাত্রী নারীটির নির্ব্বিবাদে অন্তর্ধানই তার আতিথ্যের অর্থ, অধ্যক্ষের উহাই নির্দ্দেশ!

কেহই লক্ষ্য করিল না। চিত্রা চঞ্চল চরণে মঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল। সম্মুখেই আবার সেই নদী, নদীর কালো জল, জলের ওপারে প্রান্তর, প্রান্তরের কোলে নগর, নগরে মানুষ, মানুষের ভিতর—নাগরিকা!

'রূপ!'—চিত্রা চম্‌কিয়া উঠিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল—মঠের প্রাচীর। আস্তে-আস্তে পিছনদিকে হাঁটিয়া আসিয়া প্রাচীরে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল চুপ করিয়া; যেন আকস্মিক কি-এক গুরুতর চিন্তায় তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। তারপর তাহার মুখে খাম্‌কা এক মারাত্মক হাসির ছটা উথলিয়া পড়িল। তারপর—তারপর তাহার কণ্ঠ হইতে এক অস্ফুট, অধীর শব্দ বাহির হইল—'রূপ!'

বারো

কথাটা নিমেষেই ছড়াইয়া পড়িল—কঙ্কন ভিক্ষু; আর, তাহার পার্থিব সম্পদের মালিক—নন্দন।

চিত্রা চলিয়া যাইবার পরই নন্দনও বাহির হইয়া গিয়াছিল, যখন ফিরিয়া আসিল তখন অপরাহ্ণ—হাতে একখানা কম্বল, একটা কমণ্ডলু, লম্বা একটা চিমটা। উপরে উঠিয়া ঘরে হাতের জিনিষগুলা সবে নামাইয়াছে, বাহিরে এক বিকট কোলাহল উঠিল। সকাল বিকাল উৎপাত! নন্দনের মুখে বিরক্তির রঙ ধরিল। খানিক নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আহৃত জিনিষগুলাকে ঘরের এককোণে সরাইয়া রাখিয়া চাপা দিয়া নীচে নামিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, গৃহ প্রাঙ্গণে এক বিরাট বিশৃঙ্খল জনতা, যেন সকলেই মারমুখ!

একজন প্রৌঢ় ভিড়ের ভিতর হইতে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তিলক-ছাপ, গায়ে নামাবলী, মস্তকে লম্বিত সুস্পষ্ট শিখা। নন্দনের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অবজ্ঞায় বলিয়া উঠিলেন, "কিহে, ছোক্‌রা—রাতারাতি যে অযোধ্যার রাজা হ'য়ে বসেছ?"

নন্দনের মুখে এম্‌নি ভাব প্রকাশ পাইল যে তাহার বিনয় ও কুণ্ঠার অবধি নাই। কহিল, "দেখছি তাই! একেবারে রাগচন্দ্রের দরবার! নল, নীল, গয়, গবাক্ষ—সবাই এসে হাজির!"

লোকটির মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—অপমান!

ক্রোধে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আমি কে জান?"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া নন্দন লোকটির দিকে তাকাইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের রক্ষক, সমাজপতি—"

এইবার নন্দনের মুখে এমনই ভাবপ্রকাশ পাইল, যেন সে বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে। কহিল—"শুভাগমনের হেতু?"

সমাজপতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "কঙ্কন ভিক্ষু হ'লো যে—কার ষড়যন্ত্রে?"

নন্দন যেন অনাসক্তভাবেই জবাব দিল, "যদি না বলি!"

সমবেত জনতা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "রাজ-দরবারে শাস্তি পাবে!"

নন্দনের মুখখানা এইবার কঠিন হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, "আপনাদের!"

"আমাদের?"—জনতার মুখদিয়া যুগপৎ রোষ, সংশয় ও বিস্ময় মিশ্রিত এক অস্ফুট রব বাহির হইল।

নন্দন কহিল, "প্রমাণ চাই? আসুন—" বলিয়াই জনতাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। তারপর সেই ঘরটির ভিতর প্রবেশ করিয়া ঘরময় রক্তের দাগগুলার উপর আঙুল বাড়াইয়া জনতার দিকে ফিরিয়া কহিল, "ওই দেখুন—"

সকলেই চম্‌কিয়া উঠিল—রক্ত!

নন্দনের মুখে এক নিষ্প্রভ হাসির আভা দেখা দিল, কহিল, "রক্ত! মানুষের—নিরীহ ভিক্ষুর!"

উত্তেজিত অবয়ব, এক-একটি লোকের—এক-এক করিয়া সহসা নিস্তেজ হইয়া পড়িল। তাহারা নন্দনের মুখের দিকে একবার চাহিতে গেল, যেন আরও কি দেখিবে, যেন আরও কি শুনিবে—আরও কত কথা, কিন্তু পারিল না, চোখ ভারি হইয়া নামিয়া পড়িল। কিন্তু সমাজপতি দাঁড়াইয়াছিলেন—যেন এক মূর্ত্তিমান বজ্র। এক আসুরিক গর্ব্বে মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে আমাদের ধর্ম্মের বিদ্রোহী! তাকে খুন কর্‌বার হুকুম ছিল আমার। সেই তার দণ্ড—তার উপযুক্ত শাস্তি!"

নন্দন বিনীতকণ্ঠে জবাব দিল, "সেই শাস্তি নিয়েছে কঙ্কন!" এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই আবার ধীরে ধীরে এক একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া কহিল, "ভিক্ষুর গায়ে কিন্তু আঁচড়টিও পড়েনি! খুন হ'য়েছে আপনাদেরই একজন—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী, রাজাধিরাজ'!"

আবার এক আকস্মিক উত্তেজনায় সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং সকলেই যুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ঠিক্!"

সমাজপতি যেন বিশ্বামিত্র ঋষির ন্যায় একবার জনতার দিকে শাসন-কঠিন দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই নন্দনের উপর সেই দৃষ্টি রাখিলেন।

নন্দন যেন এইবার আত্মহারা। মুখরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ধর্ম্মের প্রয়োজন—ধার্ম্মিকের ভেতর থেকে কাউকে পূজো দিতে! কিন্তু কঙ্কনের জন্ম হ'য়েছে—পূজো দিতে নয়, পূজো নিতে! ভিক্ষু শাস্তি নেয়, দেয় না!"

এবার আর সমাজপতিকে ধরিয়া রাখা যায় না! অসুরের ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তার অনন্ত নরক!"

"তার নয়—তোমার, আর তোমার পাপে—আমাদের!"—সমগ্র জনতা যেন মারমুখ হইয়া সমাজপতির দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। পরক্ষণেই নিজেদের সংযত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর, ধর্ম্ম আর অহঙ্কার—এক নয়! তা যদি হয়, সে ধর্ম্ম আমরাও চাইনে!" বলিয়াই সকলে দল বাঁধিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আর নন্দন?—তাহার মুখখানা এক দুঃসহ তৃপ্তির আলোকে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তারপর এক ভৃত্যকে ডাকিয়া ঘরটা পরিষ্কার করিতে বলিয়াই নীচে নামিয়া গেল। তাহার পূর্ব্বেই সমাজপতি এক ফাঁকে নন্দনের চোখের আড়াল হইয়াছিলেন।

* * * *

অতঃপর নন্দনের জীবনের আর-এক পরিচ্ছেদ খুলিল।

নূতন বোঝা! বিব্রত হইয়া পড়িবারই কথা। কিন্তু সে সব বালাই নন্দন আদৌ গ্রহণ করিল না। কঙ্কনের জীবনযাত্রার নিয়ম তার সবিশেষ জানা ছিল, তদ্রূপ সেও বোঝা ফেলিয়া দিল বেতনভুক্ লোকজনেরই উপর।

দ্বিতীয় দিন সুরু হইয়াছে।

শয্যাত্যাগ করিয়া ওধারকার ছাদে বারকয়েক পায়চারি করিয়াই নন্দন ফিরিয়া ঘরে আসিয়া বসিল। হাতে কোন কাজ নাই, মন ফাঁকা-ফাঁকা, কোথায় যেন কি তার অতৃপ্তি

পড়িয়া, কোথায় কে এম্‌নিই ডাক দিবে—তাই সে কান পাতিয়া আছে, অথচ কারণ নাই, হেতু নাই, সঙ্কেত নাই !

এম্‌নিই ভাবে বসিয়া, অনেকক্ষণ—কতক্ষণ তাহা তাহার হুঁস নাই, সহসা নীচে এক নারীকণ্ঠ শুনিয়াই সে স্প্রীংয়ের মত লাফাইয়া উঠিয়া ঘরের কোণ হইতে পূর্ব্বদিনের আহৃত সেই কম্বল, কমণ্ডলু ও চিম্‌টা বাহির করিয়া আনিল। তারপর আল্‌না হইতে একখানা চাদর টানিয়া লইয়া মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধিয়া কম্বলখানা গায়ে ফেলিয়া হাতে কমণ্ডলু ও চিম্‌টা লইয়া একটী আয়নার সুমুখে দাঁড়াইল। পরক্ষণেই সে মহাপ্রস্থানের যাত্রী ! অতঃপর সে যেমন ঘর হইতে বাহির হইবে, সম্মুখেই—চিত্রা !

একি সেই চিত্রা ! কাল আর আজ—আজ তাহার এ যে এক নূতন মূর্ত্তি ! পরিধানে রত্নখচিত সাড়ি, গা-ময় অলঙ্কার, মাথায় মুকুট, এলায়িত চুল, মুখে একমুখ হাসি, দেহে এক-দেহ—রূপ !

চিত্রা !

ঠিক মুখোমুখী দুইজন—নন্দন আর চিত্রা, চিত্রা আর নন্দন !

অভিনব মূর্ত্তি—এরও, ওরও। চোখোচোখী হইতেই নন্দন তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া লইল—নিষেধ ! কিন্তু একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল চিত্রা। তাহার মনের ভিতর কি হইল, সেই-ই জানে, মুখে বলিল, "একদিন আড়াল হ'য়েছি, আর অম্‌নি এই কাণ্ড ?"

সন্ন্যাসধর্ম্মের আইন—নারীর মুখের দিকে তাকাইতে নাই। সুতরাং মেয়েটির পায়ের দিকেই চোখ রাখিয়া নন্দন কহিল, "পথ ছাড়ো—"

চিত্রা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া পথ ছাড়িয়া একপাশে দাঁড়াইল।

পথের বাধা সরিয়াছে। সুতরাং নন্দনের আর অপেক্ষা করা চলে না। বেগে প্রস্থানের ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "হিমালয়ে যাচ্ছি !"

চিত্রা গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, "সাধনোচিত ধাম !"

অসাবধানে অনেক কাজই মানুষ করিয়া ফেলে, তাই দৈবাৎ নন্দনের এক ঝলক দৃষ্টি চিত্রার মুখের উপর পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই মুখ নামাইয়া লইয়া কহিল, "কিন্তু যেতাম না !"

অপর পক্ষও জবাব দিল, "সাধু সঙ্কল্প !"

"কিন্তু—"

"তাই ত !"

তুমি যদি বল—"যেয়ো না !"

চিত্রা হাসি চাপিয়া কহিল, "তা কি পারি ! আপনি যে গুরুজন !" বলিয়াই কাছে আসিয়া কহিল, "বরং এই কথা বলি—প্রভু যাবেন না !" বলিয়াই একে-একে কম্বল, কমণ্ডলু ও চিম্‌টা কাড়িয়া লইয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিল।

নন্দন বাধা দিল না, নির্ব্বোধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কহিল, "আবার ত পায়ে ঠেল্‌বে ?"

চিত্রা জিব্‌ কাটিয়া কহিল, "সর্ব্বনাশ ! তাহ'লে আমার কি যে হবে !" বলিয়াই এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিল।

নন্দন আস্তে-আস্তে চোখ নামাইয়া লইল। একটু পরেই আবার চোখ তুলিয়া কহিল, "তা না-হয় [illegible]লাম ! কিন্তু—" হঠাৎ যেন ভয় পাইয়া খাটের উপর [illegible] বসিল বলিয়া উঠিল, "অমন মারাত্মক মূর্ত্তি যে হঠাৎ ?"

"ফাঁদ !"—চিত্রা হাসিয়া উঠিল এবং তেমনি হাসিমুখেই কহিল, "কেন জানেন ?—আজ থেকে নিজেকে যাচাই কর্‌বো !"

হিমালয়ের সাজ-সরঞ্জাম তখন অনাদরেই পড়িয়াছিল; খাট হইতে উঠিয়া কম্বলখানাকে তুলিয়া ভাঁজ করিয়া কাঁধে ফেলিয়া কহিল, "কার কাছে ?"

চিত্রার মুখে হাসি আর ধরে না। বলিয়া উঠিল, "তাও ছাই জানেন না ?—মেয়েমানুষ যাদের কাছে নিজেদের যাচাই করে—পুরুষমানুষ ?"

"দানপত্র—"

চিত্রা যেন কথাটা বিস্মৃত হইয়াই গিয়াছিল, এ মুহূর্ত্তে তার হঠাৎ মনে পড়িয়াছে। এম্‌নিই ভাব দেখাইয়া কহিল, "আমার জন্য সে তো নয় !"

নন্দন আর গৃহবাসী হইবে না ! কমণ্ডলু ও চিম্‌টা উঠাইয়া লইতেই চিত্রা বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইল। তারপর মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া আবার আসিয়া সে দুটোকে কাড়িয়া লইয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া শাসন-কণ্ঠে বলিল, "হিমালয় যাওয়া অত সহজ নয়।" বলিয়াই একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। কিন্তু, সে এক মুহূর্ত্ত। পর মুহূর্ত্তেই যেন অতিরিক্ত আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "আপনি

আমাকে পারেন নিতে—একজনের মনের মানুষ আর একজন ?"

"পারি ! তুমি যদি পার—নিজেকে দিতে !"

প্রচণ্ড কৌতুক !

এক প্রচণ্ড কৌতুকে চিত্রার মুখখানা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। [illegible] হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "এর মানে এই দাঁড়ালো—[illegible] কিছুই পারে না ! সুতরাং আমি—" আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, যেন কি বলিতে গিয়া সুত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে ? ক্ষণকাল পরেই সঙ্কল্প কঠিন কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি—নাগরিকা !"

নন্দন [illegible]কিয়া উঠিল, "—নাগরিকা !"

যেন [illegible]ম্‌কা তার পিঠে তীর আসিয়া বিঁধিয়াছে ! আর চিত্রার মুখময় ছড়াইয়া পড়িল এক বিচিত্র হাসি ! কহিল, "[illegible]দেশ তাঁরই, আমি যাঁর মানুষ !"—মুখখানা একটিবার কাঁপিয়াই স্থির হইয়া গেল।

তেম্‌নি স্থির হইয়া গেল নন্দনের চোখের পলক, মুখের বিস্ময়, বুকের আতঙ্ক !

চিত্রা একটু ম্লান হাসি হাসিল। অসম্বদ্ধ প্রলাপের মত কহিল, "অন্ধকার—আমি ! হ'তেই হবে—প্রয়োজন ! নইলে, তাঁর রূপ খোলে না—আলো ?" আর দাঁড়াইল না।

এইবার নন্দনের চমক ভাঙিল। প্রবাসী মানুষ গৃহে ফিরিবার মুখে গ্রামে ঢুকিয়াই যদি শুনিতে পায় যে তাহার গৃহে আগুন ধরিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে যেমন সে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় সেইদিকে ছুটিয়া যায়, নন্দন তেমনিতরই উঠি-পড়ি করিয়া চিত্রার অনুসরণ করিল।

চিত্রা তখন নীচে নামিয়াছে। নন্দন সিঁড়ি হইতে দেখিতে পাইয়াই ডাক দিল, "চিত্রা।"

চিত্রা ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "ডাক্‌ছেন ?"

"হাঁ !"

"কেন ?"

"একটা কথা ছিল—"

চিত্রা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "থাক্‌বারই ত কথা !"

নন্দন মুখ নীচু করিল। পরক্ষণে আবার মুখ তুলিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "কঙ্কনের মুখে কালি পড়্‌বে !"

চিত্রার মুখখানা সহসা কঠিন হইয়া উঠিল ! শ্লেষকণ্ঠে কহিল, "বিলিয়ে দিয়ে গেছেন না তিনি ?"

"আমি যদি বলি—আমিই চেয়েছিলাম ?"

"নারী পুরুষের খেল্‌না মাত্র—চাইলেই দেওয়া চলে !" ঘা দিয়া কথাটা বলিয়াই চিত্রা এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল। অতঃপর কণ্ঠ অধিকতর কঠিন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাজারের ফল-মূল, হাটের তরি-তরকারি ! সবাইকার সমান অধিকার !" বলিয়াই উল্কার ন্যায় চলিয়া গেল।

তেরো

পরস্পরের প্রয়োজন মিটিয়াছে।

চিত্রা চোখের আড়াল হইতেই কঙ্কন যেমন মুখ ফিরাইবে, দেখিল সুমুখেই দাঁড়াইয়া কৌমুদী। তাহার চোখে-মুখে যেন ঝড় উঠিয়াছে। কহিল, "আপনি একা—তিনি ?"

"চিত্রা ?"

"তাঁর নাম—ওই বুঝি ?"

কঙ্কন নত চোখে কহিল—"হুঁ !"

"কৈ তিনি ?"

"চলে গেছে।"

কৌমুদী চোখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "সুমুখে রাত ! আপ্‌নি ছাড়লেন ?"

"আমি ছাড়িনি।"

"তাই বলুন ! এখনো পেলে ধরে রাখেন !"

অপ্রীতিকর মন্তব্য ! কঙ্কন ক্ষুব্ধ হইয়া প্রশ্ন করিল, "তার মানে !"

কৌমুদীর মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল। পরক্ষণেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল, "আচ্ছা ! আপ্‌নি আসুন, আমার সঙ্গে-সঙ্গে—"বলিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া অগ্রসর হইল, কঙ্কনও যন্ত্রচালিতের ন্যায় অনুসরণ করিল। কিয়দ্দুর গিয়াই কৌমুদী পিছন ফিরিল, কৌতুকময় এক কটাক্ষ করিয়া কহিল, "যেন হারিয়ে যাবেন না—" বলিয়াই আবার মুখ ফিরাইয়া পায়ে জোর দিল।

বিস্তৃত অঙ্গন। তাহারই একপ্রান্তে ভিক্ষুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কক্ষ। একান্তে একটি কক্ষের মুখে আসিয়াই কৌমুদী থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া কঙ্কনকে কহিল, "এই আপনার ঘর—বসবাস করবার।" বলিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে মেঝেয় এক বোঝা ঘাস, একটা

খড়ের বালিস ও একখানা কম্বল। প্রাচীর গাত্রে চিত্রিত বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি—বিভিন্ন অবস্থার।

একপক্ষ নীরব, অপর পক্ষ মুখর। কঙ্কনের দিকে চাহিয়া কৌমুদী কহিল, "একটু দাঁড়ান—একটুখানি!" বলিয়াই ঘাসের বোঝাটা বিছাইয়া খড়ের বালিসটা যথাস্থানে রাখিয়া তাহার উপর কম্বল পাতিয়া স্মিতমুখে কহিল, "এইবার শুয়ে পড়ুন ওইখানে। ঘুম পেলে—ঘুমোবেন কিন্তু!"

বিচিত্র শয্যা! একটিবার সেইদিকে তাকাইয়াই কঙ্কন কৌমুদীর দিকে ফিরিল। কহিল, "আপনি?"

কৌমুদী বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর ন্যায় গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, "ছিঃ! আপনি বল্‌তে নেই—আমি যে আপনার ছোট!"

একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি। মঠই হোক্ আর আশ্রমই হোক্—লোকালয়ের কল্পনায় উহা হিমালয়ের নামান্তর। উহার মুখ্য উদ্দেশ্য—আকাশের অদৃশ্য 'ঠাকুর-দেবতাকে' হাতে আনা! মঠ—আশ্রম, এ সব নাম শুনিলেই বাহিরের লোকে মনে করিয়া লয়—উহা এক কঠোর কৃচ্ছ্র তপস্যার কারাগার। ইহার অধিবাসীদের হয় দস্যু রত্নাকরের ন্যায় বল্মীক চাপা পড়িতে হইবে, নয় কঙ্কালসার হইয়া নশ্বর দেহের পুঁজিপাটা নিঃশেষ করিতে হইবে—হয়ত বা অভীষ্টের 'দর্শন' অন্তিমকালে মিলিবে, নয়ত বা আগামী জন্মের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে। কিন্তু কঙ্কন যে-মঠে প্রবেশ করিয়াছে তাহার জাতি স্বতন্ত্র। ইহার উদ্দেশ্য দেবতার পরিবর্ত্তে পৃথিবীর 'মানুষকে' হাতে আনা! ভগবানকে—সাক্ষাৎ সাকার ক'রে তোলা! অর্থাৎ মানুষকে মানুষ বলিয়া চেনা, নিজেকে নিঃস্বত্ব করিয়া পার্শ্বে নিবেদন করা, অপরের পাপকে প্রকৃতির উপহার বলিয়া নির্ব্বিকার মনে গ্রহণ করা। ইহারই অনুষ্ঠানে বসিত এই শ্রমণ ভবনে প্রত্যেকের জীবনে মহামহোৎসব—ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীর।

আনাড়ি মানুষ—কঙ্কন। কৌমুদী তাহার নির্ব্বোধের ন্যায় প্রশ্নের উত্তরে আবার এক কৌতুক কটাক্ষ করিয়া কহিল, "আমি? আমাকে কি থাকতে দেবেন এখানে আপনি?" বলিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

কয়েক দিন কাটিয়াছে। ইতিমধ্যে যেন যাদুস্পর্শে মোহ-গ্রন্থের ন্যায় কঙ্কন দলে মিশিয়া মাতিয়া উঠিয়াছে—যেন উহাই তাহার আজন্মের নির্দ্দেশ, যেন সে জানে না ইহার পূর্ব্বে তাহার আরও একটি জীবনযাত্রার পৃথিবী ছিল। একদিন অপরাহ্নে নিত্য-নৈমিত্তিক তালিকানুযায়ী সমবেত উপাসনা হইল। তাহার পর হইল ভিক্ষুণীদের গান—ধরিত্রীর সন্তান যাহারা, তাহাদের যাহা-কিছু কলুষ, যাহা-কিছু অপবাদ, যাহা-কিছু পাশবিক আচরণ ও প্রবৃত্তি—সমস্তই যেন ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে গ্রহণ করিতে উহারা পারে, নিঃশেষে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া। দেহ-ধারণে দেহীর আতঙ্ক ত্যাগ হইলে ইহলোকে আর রহিবে না! সঙ্গীতে ইহাই তাহাদের কামনা।

অতঃপর সুরু হইল—পরদিনকার 'প্রচার অভিযানের' পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন। এই ভার প্রথমেই পড়ে—পুরাতন ও পাকা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরই উপর। ভিন্ন-ভিন্ন লোকালয়ের ভার ভিন্ন-ভিন্ন পাত্র-পাত্রীকে অর্পণ করিয়া ত্রিবর্ণ কঙ্কনের নাম ডাকিতেই সকলেই চমকিয়া উঠিল—কঙ্কন যে কাঁচা! ত্রিবর্ণ বুঝিতে পারিয়া গম্ভীর অথচ মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "সহজাত ভিক্ষু—কঙ্কন! 'বিহারে'র প্রাথমিক শিক্ষা ও সংযম অভ্যাস ওর নিষ্প্রয়োজন।" বলিয়াই কঙ্কনের দিকে ফিরিয়া আদেশ দিলেন—"নগর।"

"নগর?"—আতঙ্কে বিব্রত মুখ কৌমুদী মুখর করিয়া কাঁপিয়া বলিয়া উঠিল—"পিতা!"

ত্রিবর্ণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "ওর আবির্ভাব, এইখানে—এই জন্যেই ত, মা!"

"তা জানি বাবা, কিন্তু—প্রথমেই—নগর?"

"রাক্ষসপুরী-পিশাচ—দুর্ভাগা লোকালয়! ভয় হচ্ছে, নয় মা?"

নেহাৎ অকারণেই বুঝিবা কৌমুদীর সারা মুখটি রাঙা হইয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি মুখ নামাইয়া রহিল। সেই নির্ব্বাক, নতমুখ বুঝি বা নিঃশব্দে ইহাই ব্যক্ত করিল—ভয় হবারই ত' কথা! কিন্তু, কেন? রুক্ষ তপস্যা, কর্কশ সংযম, আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য—এই সব কৃচ্ছ্রের কারবারে যে নিজের স্বত্ব নিঃশেষ ত্যাগ করিয়া নিঃস্ব হইয়া বসিয়াছে, তাহার এই অকপট ব্যথা কেন? এই 'ধর্ম্মবিহার'—ইহারই দায়িত্বে তাহার নারী জীবনের আত্মনিবেদন। সুতরাং ইহারই স্বার্থে যে-'বলি' আজ আহৃত হইয়াছে, সহসা

তাহার প্রতি এতখানি দরদ কোন্ হিসাবে এক নিস্পৃহ ভিক্ষুণীর পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া গ্রাহ্য হইবে?

কৌমুদীর নত মুখটির দিকে তাকাইয়া ত্রিবর্ণ ঈষৎ হাসিলেন; হাসিয়া কহিলেন, "লজ্জা করো না মা! এ প্রতিবাদ শুধু তোমার নয়—তোমাদেরই পক্ষে সঙ্গত! এ নইলে তোমাদের নাম 'মা—বোন' হতো না!" একটু থামিয়াই আবার কহিলেন, "আমিও জানি! কিন্তু একথা বোধ হয় জানো না মা, যে ভিক্ষু ও আজই হয়নি—হয়েছে এই মাটীর কোলে ভূমিষ্ঠ হ'য়েই!" বলিয়াই কঙ্কনের দিকে সরিয়া গিয়া তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "শুধু একটা কথা মনে রেখো, কঙ্কন—শাক্যসিংহ অহিন্দু ছিলেন না!"

ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়াছে। কঙ্কন সপ্রশ্ন চক্ষে ত্রিবর্ণের দিকে তাকাইতেই তিনি স্মিত মুখে বলিয়া উঠিলেন, "হিন্দুর বা প্রকৃত ধর্ম্ম, তার বিদ্রোহী তিনি ছিলেন না! এর যা' সহজ পরিচয়—লোক সমাজে তাই তিনি প্রচার করেছিলেন!"

এক অপরিমিত বিস্ময়ে ও সংশয়ে কঙ্কনের চোখ দুটি বড় হইয়া উঠিল—তবে কি এই উভয় ধর্ম্মের ভিতর কোন প্রভেদ নাই? তাহার মনের ভিতর সহসা যেন এক লক্ষ প্রশ্ন মূর্ত্তি ধরিয়া এ-ওর ঘাড়ে পড়িয়া মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইল—"ধর্ম্ম—সব-ই এক?"

ত্রিবর্ণ গম্ভীর হইয়া জবাব দিলেন, "গ্রহিতার রুচি অনুসারে স্বতন্ত্র! হিন্দুধর্ম্ম যেমন মানুষকে পরিচালিত ও সংযত রাখবার এক আশ্চর্য্য 'শাসন', ভিক্ষুর ধর্ম্ম তেমনি মানুষকে দেবত্বে তুলে এনে তার চরণে নমস্কার নিবেদন! হিন্দুর জন্য সিংহাসনে বিরাজ করেন ঈশ্বর, আর ভিক্ষুর অন্তর দর্ভাসনে ধ্যানস্থ তারই সঙ্কেত—মানুষ!" অতঃপর কৌমুদীর দিকে ফিরিয়া সহাস্যে কহিলেন, "এরপর একে মা কিছু শেখাতে হবে, তার শিক্ষক হবে তুমি!" অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। মুহূর্ত্ত পরেই সকলে নিঃশব্দে এক-এক ত্রিবর্ণকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

* * * *

আজ যেন একটু সকাল করিয়াই রাত্রি নামিয়াছে, হয়ত সত্বরই প্রভাত হইবে।

নিশীথ রাত্রি, চারিদিক স্তব্ধ। কঙ্কন স্বীয় কক্ষে বসিয়া আছে—বিনিদ্র, সচঞ্চল। বাহিরে গাছপালাও যেন জাগিয়া—সেখানে ক্বচিৎ যেমনি একটি পাখী ডাকে, অমনি তাড়া-তাড়ি সে উঠিয়া গিয়া জানালার মুখ দিয়া দাঁড়ায়—ওই বুঝি রাত্রি শেষ! বাহিরে যে দৃষ্টি পড়ে, তাহা চলিয়া যায় নগরে, যেখানে বাড়ীর গায়ে বাড়ী, মানুষের গায়ে মানুষ, যাহাদের কাছে সে প্রভাতেই ছুটিয়া গিয়া কহিবে—"আমি এসেছি!" অপরিমেয় আনন্দময় এক নব-জীবন—মুঠি-মুঠি ভরিয়া দ্বারে-দ্বারে বিলাইয়া সে কাল তার এই আনন্দ পসরা নিঃশেষে খালি করিবে!

এমনিই সব উৎসাহ ও উত্তেজনাময় ভাবনায় অজ্ঞাতে অনেকক্ষণ কাটিয়াছে, দুয়ার সম্মুখে কাহার পদশব্দে সে চম্‌কিয়া উঠিল। ঘরের ভিতর একটি প্রদীপ তখনও মিটি মিটি জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে কঙ্কন দেখিতে পাইল, কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া এক বিচিত্র নারীমূর্ত্তি। তাহার পরি-ধানে গেরুয়া, সর্ব্বাঙ্গে সজ্জিত পুষ্পের অলঙ্কার, গলদেশে ফুলহার। মুখের দিকে চোখ পড়িতেই কঙ্কন ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে উঠিয়া গিয়া বলিল, "কৌমুদী, তুমি—"

"যদি বলি—চিত্রা!"—বলিয়াই কৌমুদী একমুখ হাসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

কঙ্কন সলজ্জ মুখখানি নীচু করিল।

কিন্তু এই চপলা মেয়েটি কঙ্কনকে রেহাই দিল না। তাহার অবনত মুখখানি আদরে তুলিয়া ধরিল, স্বীয় গলদেশ হইতে মালাগাছটি খুলিয়া লইয়া কঙ্কনের গলায় পরাইয়া দিল, তারপর মুখের দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "মালা-বদল!"

কঙ্কনের সমস্ত মুখটি নিমেষে সাদা হইয়া গেল। বিহ্বল-আতঙ্কে মেয়েটির দিকে তাকাইতেই সে তেম্‌নি করিয়াই সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "আমার সঙ্গে নয়—চিত্রার সঙ্গে!" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "চর পাঠিয়ে—তোমাদের ঘরের খবর স-ব জেনে নিয়েছি! জানি, চিত্রা তোমার কে!"

কঙ্কন কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "এ-সবেরও কি প্রয়োজন ছিল?"

এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া কৌমুদী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "ছিল বৈ কি! নইলে, মালা, আমার গলার মালা অত

সস্তা নয়!" বলিয়াই বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল, "আঃ, বেশ্ নিঝুম রাত! চমৎকার চাঁদ উঠেছে—বাইরে চলো না?" বলিয়াই কঙ্কনের হাতে একটা টান দিয়া বাহিরে আনিয়া এক শিলাখণ্ডে বসিল, উভয়ে পাশাপাশি—মাথার উপর চন্দ্রাতপ, আশেপাশে কুসুমসুরভিত ফুলের গাছ।

উভয়েই চুপচাপ—এ ওর পানে চায়, মুখ নামায়, ও এর পানে চায়, মুখ নামায়। কৌমুদী হাসে, কঙ্কন বিহ্বল হইয়া চাহিয়া থাকে। ক্ষণ পরে কৌমুদী কহিল, "কেন শুন্‌বে? অসম্পূর্ণ মানুষ, জগতের অসম্পূর্ণ 'স্তব'! সৃজন শিল্পীর লজ্জা! তারা পৃথিবীর কোন কাজেই আসে না! তুমি মানুষ—'তোমাকে' তুমি ভুলতে পার না! যে পারে, সে 'মার—শয়তান!" সহসা তার চোখ দুটি আলোকিত হইয়া উঠিল এবং সেই-চোখের এক পরিপূর্ণ দৃষ্টি কঙ্কনের উপর নিক্ষেপ করিয়া পুনশ্চ কহিল, "এখানে এসেছ বটে, কিন্তু অখণ্ড আসতে পারোনি; এসেছ—তোমার খানিক নিয়ে! খানিক রেখে এসেছ—চিত্রার কাছে! তাই প্রয়োজন—তোমাকে পূর্ণ ক'রে নেবার!"

প্রভাতেই যে পাখী মুখর হইবে, তাহাকে আর নিশীথে নীরব হইয়া থাকা মানায় না। তাই বুঝি বা কঙ্কন বলিয়া ফেলিল, "পূর্ণ ক'রে নিতে চাও কি তোমার খানিক দিয়ে?"

"ইস্! এত লোভ?" কৌমুদী মুচ্‌কিয়া হাসিয়া এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, "ও মালা চিত্রার! কিন্তু তার হাত দিয়ে ত' আর তুমি ও পেতে পার না—ভিক্ষু হয়েছ যে!"

"আমি ত চাই নি!"

"ইহলোক চায়—পরলোক তাকিয়ে থাকে!"

"কেন?"

"আকাঙ্ক্ষা! আকাঙ্ক্ষাকে একদিকে বাগিয়ে রেখে, আর এক দিকে 'মহাপুরুষ' হওয়া চলে না! সমাজের মানুষকে বুক দিতে চলেছ, আর চিত্রার চিত্তের দান গ্রহণ করবে না তুমি?"

"আমি যে ভিক্ষু!"

"দান—ভিক্ষুই গ্রহণ করে।"

"এই কি সে দান?"—বলিয়া কঙ্কন মালাগাছটা খুলিয়া কৌমুদীর চোখের উপর ধরিল।

কৌমুদীর মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ! তোমার রিক্ত ঝুলির ওই প্রথম সঞ্চয়!" থামিল। একটু পরেই আবার বলিয়া উঠিল, "প্রেম! অপ্রমেয় প্রেম পৃথিবীর মানুষকে তুমি মাতিয়ে দেবে, তাই ওই মালা তোমার নব যাত্রা পথের প্রথম পাথেয়! বরদাত্রী নারীর নিকটে নেওয়া প্রথম ঋণ!" বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "চিত্রা, তার অভিমান চন্দনে—অঙ্গে এর প্রেমের প্রলেপ দিলে, অস্ত্রের নির্ম্মম আঘাত টের পাবে না!" বলিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল।

অস্ত্রাঘাত এখনো পিঠে পড়ে নাই, সুতরাং তাহার পরিচয় কঙ্কনের জানা ছিল না। কিন্তু তাপসী উমার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়ী এই মেয়েটির রুক্ষ-কৃচ্ছ্র ভিক্ষুণী-দেহের অন্তরাল হইতে যে-মানুষটি এইমাত্র আত্মপরিচয় দিয়া গেল, আপাততঃ তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতে সে অভিভূত হইয়া পড়িল। বারংবার এই প্রশ্নই তাহার মনে উঠিতে লাগিল, 'মানুষকে নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইতে সঙ্কেত করে কোন প্রয়োজন—মানুষের নিকট সংসার-বিরাগী মন, না ছলনাময়ী নারীর অজানা ইঙ্গিত? সৃষ্টির সুরু হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহাই ত প্রমাণ হইয়া আসিয়াছে—মোক্ষের পথে পুরুষের গতিরোধ করে নারী, নারীর অনুগ্রহ যাহার জীবনকে স্নেহে প্রেমে সেবায় সাহচর্য্যে যত বেশী ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছে, শৃঙ্খলের বন্ধন তাহাকে বেড়িয়া তত বেশী সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু এই যে আশ্চর্য্য মেয়েটি—এর মুখ দিয়া যে দুর্লভ নির্দ্দেশ এই মাত্র বাহির হইল, ইহাই বা সে কোন্ যুক্তি দিয়া কেমন করিয়া উপেক্ষা করিবে? নিজেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিতে গিয়া যদিই বা অবিজ্ঞাত কোনো এক কাল্পনিক পরমার্থকে স্পর্শ করিতে হয়, তাহা হইলে যাহার দৈহিক স্পর্শে ইহাই প্রেরণা সেই প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমতীকেই বা সে অস্বীকার করিবে কেন? * * * এই সব যুক্তিতর্কের চিন্তাতরঙ্গে বিপর্য্যস্ত হইয়া কঙ্কন শিলাসন হইতে উঠিয়া আসিয়া পুনরায় কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল—সম্মুখেই শাক্যসিংহের নিষ্কাম মূর্ত্তি, ইন্দ্রিয় জয়ের পুরুষোত্তম প্রচারক! কঙ্কন চমকিয়া উঠিল, তারপর কি মনে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল, দ্রুতপদে অঙ্গন পার হইয়া অপর প্রান্তে ভিক্ষুণী-বাসের একটি ক্ষুদ্র কুটীরের সমুখে আসিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল—

ভিতরে কৌমুদী, তার মুখে স্তব গান! নারীর

পরিচয়—আকাশের দেবতাকে আত্মনিবেদন করা নয়, মাটির জন্মভূমিকে জীবন উৎসর্গ করা নয় বা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ-সিদ্ধির লোভে নিজেকে ধর্ম্মের আলিঙ্গনে সমর্পণ করা নয়! এই সমস্ত পরিচয়ে যাহার পরিচয়, আসলে সে নারী নয়—নারীর ছদ্মবেশে কোনো বিকৃত জীব! নারীর রাজধানী—পুরুষের অন্তর্লোকে বিরাজিত সেইখানেই তাহার সাম্রাজ্ঞীর স্বর্ণ সিংহাসন—যাহার উপর নিশ্চিন্ত নির্ভরে বসিয়া সে আপন রাজমুকুট খুলিয়া রাখে পুরুষের পাদমূলে, তাহাকে শিখাইয়া দিতে—'নির্ব্বাণ-রহস্য?'

গান থামিতেই কঙ্কন ডাকিল, "কৌমুদী—"

কৌমুদী জানালায় মুখ রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফিরিয়া কঙ্কনকে দেখিয়াই মাথায় কাপড় দিল। তারপর শশব্যস্তে সরিয়া আসিয়া সবিস্ময়ে কঙ্কনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আর এক প্রহেলিকা! ভিক্ষুণীরা মাথায় কাপড় দেয় না—কৌমুদীকেও দিতে কঙ্কন ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই। তারা থাকে আজীবন অনবগুণ্ঠিতা! তাই কৌমুদীর সহসা এই সকুণ্ঠ ব্যবহারে সেও মূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। উভয়েই বাক্যহারা, উভয়ের কাছে উভয়েই 'বিস্ময়'।

মিনিট কয়েক পরেই কৌমুদী বালিকার ন্যায় হাসিয়া উঠিল—একমুখ সুমিষ্ট হাসি! কহিল, "অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রয়েছ যে?"

কঙ্কন মুখ নীচু করিল। একটু পরেই মুখ তুলিয়া বলিল, "একটা কথা বল্‌বে?"

"যদি 'না' বলি নিশ্চয় রাগ করবে, সুতরাং বল্‌তেই হবে—"

"আচ্ছা, প্রভু গৌতম—আমাদের বুদ্ধদেব, ইনিও ত ত্যাগ করে এসেছিলেন—"

"নারীকে?"

কঙ্কন আকারে-ইঙ্গিতে জানাইল—'হুঁ!'

কৌমুদী এক মিনিট কাল কঙ্কনের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া স্থিরকণ্ঠে কহিল, "মনেও করো না, বুদ্ধদেব ত্যাগ করেছিলেন নারীর বাহিরের এই মন্দিরটা—ভেতরে যে পরমা প্রকৃতি মূর্ত্তি, তাকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন নিজ মর্ম্ম-বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করে, নইলে ইহলোকের পূজা তাঁকে আর পেতে হতো না!" মাথার কাপড়টা একটু সরিয়া গিয়াছিল, টানিয়া কহিল, "ছেলেকে নিজের বুকের দুধ দেয় যে মা—মাকেও বাঁচিয়ে রাখে ছেলে! নারী গর্ভে ধারণ না করলে গৌতমের জন্ম কি সম্ভব হ'ত, আমাকে বল্‌তে পার?"

কঙ্কন চম্‌কিয়া উঠিল।

কৌমুদীর মুখে তখন হাসি আর হাসি। কহিল, "না পার, আমিই বলি—এই যাকে তোমরা নারী, মায়াবিনী, নরকের দ্বার—বল, সে সরে দাঁড়ালে তোমাদের এই পুরুষ জাতটার কোনো অস্তিত্ব থাকত না! গোপাকে ছেড়ে এলে শাক্যঠাকুর কল্পতরুর মত নিজেকে অমন বিলি করতে পারতেন না!"

এমন সময়ে চারিদিকে পাখী ডাকিয়া উঠিল। কৌমুদী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আর না! ঘরে যাও—"

"আর একটা কথা—"

"বলে ফেলো—"

"মাথায় কাপড়—তোমায় এর আগে কখনো দেখিনি ত?"

"সে কি গো! এই গভীর রাতে এত কাছে তুমি! একটু লজ্জা—তাও কি ছাই রাখ্‌তে দেবে না?"—বলিয়াই কৌমুদী মাথার কাপড় নামাইয়া মুখ ভারি করিয়া পুনশ্চ জানালায় গিয়া মুখ রাখিল।

কঙ্কন স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল স্থাণুর ন্যায় সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মুখ ফিরাইয়া তরল অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

ক্রমশঃ

স্ব-ভাব ও স্ব-ধর্ম্ম

শ্রীঅরবিন্দ

(২)

তিনটি কথা প্রথমেই মনে উঠে, গীতা এইস্থলে যাহা বলিয়াছে সেই সবের মধ্যেই এই তিনটি নিহিত রহিয়াছে। প্রথমত, সকল কর্ম্মই ভিতর হইতে নির্দ্ধারিত হওয়া চাই, কারণ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তাহার নিজস্ব কিছু রহিয়াছে, তাহার প্রকৃতির একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও সহজাত শক্তি রহিয়াছে। সেইটিই হইতেছে তাহার আত্মার সিদ্ধিপ্রদ শক্তি, সেইটিই প্রকৃতিতে তাহার অন্তর্পুরুষের ক্রিয়াত্মক রূপ সৃষ্টি করিয়া দেয় এবং কার্য্যের ভিতর দিয়া সেইটিকে বিকশিত ও সিদ্ধ করিয়া তোলা, সামর্থ্যে ও ব্যবহারেও জীবনে সেইটিকে কার্য্যকরী করিয়া তোলাই হইতেছে তাহার প্রকৃত কর্ম্ম; সেইটিই তাহাকে তাহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যজীবনের সত্য ধারাটি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, সেইটিকে ধরিয়াই তাহার উচ্চতর বিকাশের সূচনা হয়। দ্বিতীয়ত, মোটামুটি চারিশ্রেণীর প্রকৃতি আছে; প্রত্যেক শ্রেণীরই আছে বিশিষ্ট কর্ম্মধারা এবং কর্ম্ম ও চরিত্রের আদর্শ বিধি, শ্রেণীই মানুষের উপযোগী ক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এবং তাহার বাহ্য সামাজিক জীবনে তাহার কর্ম্মের যথাযথ সীমারেখা তাহার শ্রেণী অনুসারেই নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। শেষত, মানুষ যে-কোন কর্ম্মই করুক না কেন, যদি তাহা তাহার সত্তার ধর্ম্ম অনুযায়ী, তাহার প্রকৃতির সত্য অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়, সেইটিকেই ভগবদ্‌মুখী করা যায়, অধ্যাত্মমুক্তি ও সংসিদ্ধিলাভের সাফল্যপ্রদ উপায়ে পরিণত করা যায়। এই তিনটি মন্তব্যের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি যে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত তাহা সুস্পষ্ট। মানুষের ব্যষ্টিগত ও সামাজিক জীবনের যে সাধারণ ধারা তাহা এই সকল নীতির বিরোধী বলিয়াই মনে হয়, কারণ আমাদিগকে যে বাহ্যপ্রয়োজন, বিধান ও আইনের ভীষণ বোঝা বহন করিতে হয় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, আর আমাদের আত্মপ্রকাশের যে প্রয়োজন, আমাদের সত্য ব্যক্তিত্ব, আমাদের সত্য আত্মা, আমাদের অন্তরতম স্বভাবগত জীবনধারার বিকাশের যে প্রয়োজন তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের দ্বারা প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ব্যাহত হয়, যৎসামান্যই সুযোগ বা ক্ষেত্রলাভ করে। জীবন, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, সমস্ত পারিপার্শ্বিক শক্তি যেন ষড়যন্ত্র করিয়াছে আমাদের আত্মার উপর তাহাদের শৃঙ্খল পরাইয়া দিতে, আমাদিগকে বলপূর্ব্বক তাহাদের ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে, তাহাদের গতানুগতিক স্বার্থ এবং স্থূল সাময়িক সুবিধার বাহন করিতে। আমরা একটা যন্ত্রের অংশ হইয়া পড়ি, আমরা যে মনুষ্য, পুরুষ, আত্মা, মন, আমরা যে অমৃতের পুত্র, আমাদের সত্তার বিশিষ্ট সিদ্ধির পূর্ণতর বিকাশ করিতে এবং ইহাকে সমস্ত জাতির সেবায় নিয়োগ করিতে সমর্থ, আমরা আর প্রকৃতপক্ষে তাহা থাকি না, আমাদিগকে থাকিতে দেওয়া হয় না। মনে হয় যেন আমরা নিজেদিগকে গড়িয়া তুলি না, আমাদিগকে গড়িয়া দেওয়া হয়। অথচ যতই আমরা জ্ঞানে অগ্রসর হইব ততই গীতার সূত্রটির সত্যতা প্রকট হইতে বাধ্য। শিশুর শিক্ষা এমন হওয়া চাই যেন তাহার প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান, সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ় ও প্রাণময় যাহা কিছু আছে তাহা প্রকট হইতে পারে; মানুষের কর্ম্ম ও বিকাশধারা যে ছাঁচে গঠিত হইবে তাহা যেন হয় তাহার সহজাত গুণ ও শক্তিরই ছাঁচ। তাহাকে নূতন জিনিষ অর্জ্জন করিতেই হইবে, কিন্তু তাহার নিজস্ব বিকশিত স্বরূপ ও সহজাত শক্তির ভিত্তিতেই উৎকৃষ্টভাবে, দীপ্যমানভাবে সে-সব জিনিষ সে অর্জ্জন করিতে পারিবে। আর সেই ভাবেই মানুষের কর্ম্মও তাহার স্বভাবের গতি ও শক্তির দ্বারাই নির্ণীত হওয়া উচিত। যে-ব্যক্তি এইরূপ স্বাধীন-ভাবে বিকাশলাভ করিতে পাইবে সেই জীবন্ত "পুরুষ" ও "মনুষ্য" হইয়া উঠিবে এবং জাতির সেবার জন্য অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। আর এখন আমরা আরও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি যে, এই নীতি কেবল ব্যষ্টি

বা ব্যক্তির পক্ষেই নহে পরন্তু সমাজ ও জাতির পক্ষে, সমষ্টিগত আত্মা, সমষ্টিগত মানবের পক্ষেও সত্য। চারি শ্রেণী এবং তাহাদের কর্ম্মধারা সম্বন্ধে দ্বিতীয় মন্তব্যটি আরও বেশী তর্কের বিষয়। বলা যাইতে পারে যে, ইহা অতিমাত্রায় সরল ও নিঃসন্দিগ্ধ, জীবনের বহুমুখীনতা এবং মানব প্রকৃতির নমনীয়তার যথেষ্ট হিসাব ইহাতে লওয়া হয় নাই, আর ইহার তত্ত্ব বা অন্তর্নিহিত উৎকর্ষ যাহাই হউক না কেন, বাহ্যিক সমাজ ব্যবস্থায় ইহা স্বধর্ম্মের সমুদয় প্রকৃতিরই যাহা বিরোধী ঠিক সেই গতানুগতিক আচারে অত্যাচারে পরিণত হইবে। কিন্তু বাহিরে যতটুকু দেখা যায় তাহার অন্তরালে ইহার এমন একটা গভীরতর অর্থ রহিয়াছে যাহাতে ইহার উপযোগিতায় আর ততটা সন্দেহের বিষয় থাকে না। আর যদিই আমরা এইটি বর্জ্জন করি, তৃতীয় মন্তব্যটির সাধারণ সার্থকতা অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায়। জীবনে মানুষের কর্ম্ম ও বৃত্তি যাহাই হউক না কেন, যদি তাহা ভিতর হইতে নির্দ্ধারিত হয় অথবা যদি সেইটিকে সে তাহার প্রকৃতির আত্ম-অভিব্যক্তি করিতে পায়, তাহা হইলে সেইটিকে সে বিকাশ ও মহত্তর আভ্যন্তরীণ সিদ্ধির উপায়ে পরিণত করিতে পারে। আর ইহা যাহাই হউক না কেন, যদি সে তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম যথাযথ মনোভাব লইয়া সম্পাদন করে, যদি ইহাকে সে জ্ঞানদীপ্ত মনের দ্বারা পরিচালিত করে, ইহার ক্রিয়াকে অন্তরস্থিত ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করে, বিশ্বমাঝে অভিব্যক্ত ব্রহ্মকে ইহার দ্বারা সেবা করে, অথবা ইহাকে মানবসমাজের মধ্যে ভগবানের অভিপ্রায়ের সজ্ঞান যন্ত্রে পরিণত করে, তাহা হইলে সে ইহাকে উচ্চতমঅধ্যাত্ম সিদ্ধি ও মুক্তির দিকে অগ্রসর হইবার উপায়ে রূপান্তরিত করিতে পারে।

কিন্তু যদি আমরা এইটিকে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি বিচ্ছিন্ন কথা বলিয়া ধরিয়া না লই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপই করা হয়) পরন্তু, যেরূপ করা উচিত, সমস্ত গ্রন্থটিতে বিশেষতঃ শেষ দ্বাদশ অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত মিলাইয়া ইহাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে এখানে গীতা শিক্ষার আরও গভীরতর অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবন ও কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার দার্শনিক মত হইতেছে এই যে, সমস্তই ভাগবত সত্তা হইতে, বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় অধ্যাত্ম সত্তা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। সবই হইতেছে ভগবানের, বাসুদেবের প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্, আর অন্তরে ও জগতে যে অবিনশ্বর রহিয়াছে তাহাকে প্রকট করা, বিশ্বের আত্মার সহিত ঐক্যে বাস করা, চৈতন্যে, জ্ঞানে, সঙ্কল্পে, প্রেমে, অধ্যাত্ম আনন্দে উন্নীত হইয়া পরমতম ভগবানের সহিত একত্ব লাভ করা, ব্যষ্টিগত ও প্রাকৃত সত্তাকে অপূর্ণতা ও অজ্ঞান হইতে মুক্ত করিয়া এবং ভাগবত শক্তির কর্ম্মসাধনের সচেতন যন্ত্রে পরিণত করিয়া উচ্চতম অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে বাস করা—এই সিদ্ধিটাই মানুষের অধিগম্য এবং অমৃতত্ব ও মুক্তিলাভের জন্য এইটিই হইতেছে প্রয়োজনীয় বিধান। কিন্তু যতক্ষণ আমরা বস্তুতঃ প্রাকৃত অজ্ঞানে সমাবৃত রহিয়াছি, আত্মা অহংয়ের কারাগারে বন্দী, পারিপার্শ্বিকের দ্বারা অভিভূত, অবরুদ্ধ, মথিত এবং গঠিত হইতেছে, প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়ার দ্বারা অবশে চালিত হইতেছে, আমাদের নিজ নিগূঢ় অধ্যাত্ম-শক্তির সত্তায় আমাদের যে-প্রতিষ্ঠা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে—ততক্ষণ ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, এই সব প্রাকৃত ক্রিয়া এখন সমাচ্ছন্ন ও বিপরীত ক্রিয়াপরম্পরায় যতই পরিবৃত থাকুক না কেন, তথাপি ইহা নিজের বিকাশশীল মুক্তি ও সিদ্ধির তত্ত্বটি নিজের মধ্যেই ধরিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ের মধ্যেই ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং তিনিই প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য কর্ম্মধারার অধীশ্বর। আর এই বিশ্ব-আত্মা, এই যে অদ্বিতীয় সত্তা, এক হইয়াও সব, যদিও ইহা মায়া শক্তির দ্বারা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় আমাদিগকে জগৎচক্রে ঘুরাইতেছে, কুম্ভকার যেমন কুম্ভ তৈয়ারী করে, তন্তুবায় যেমন তন্তু বয়ন করে, সেইরূপ এক যান্ত্রিক কৌশলের দ্বারা আমাদের অজ্ঞানে আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতেছে, তথাপি এই আত্মা হইতেছে আমাদের নিজেদেরই মহত্তম সত্তা, আর আমাদের যাহা প্রকৃত তত্ত্ব, আমাদের সত্তার সত্য, যাহা জন্মে জন্মে পশুজীবন, মানবজীবন ও দিব্যজীবনে আমরা যাহা ছিলাম, যাহা হইয়াছি এবং যাহা হইব তাহাতে আমাদের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে এবং সর্ব্বদা নূতন ও অধিকতর উপযোগী রূপ গ্রহণ করিতেছে—এই আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্য অনুসারেই আমাদের এই অন্তর্বাসী সর্ব্বদর্শী

সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ আমাদিগকে ক্রমশঃ গড়িয়া তুলিতেছেন, যখন আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিবে তখনই আমরা ইহা দেখিতে পাইব। এই যে যন্ত্রস্বরূপ অহং, গুণত্রয়, মন, দেহপ্রাণ, ভাবাবেগ, বাসনা, দ্বন্দ্ব, চিন্তা, অভীপ্সা, প্রচেষ্টার গ্রন্থিল জটিলতা, দুঃখ ও সুখের, পুণ্য ও পাপের চেষ্টা ও সাফল্য ও বিফলতার, আত্মা ও পারিপার্শ্বিকের, আমি ও অপরের পারস্পরিক বিজড়িত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—ইহা হইতেছে আমার মধ্যে এক উচ্চতর অধ্যাত্ম শক্তি কর্ত্তৃক গৃহীত বাহ্য, অপূর্ণরূপ মাত্র; আমি আমার আত্মার নিগূঢ়তায় যে দিব্য ও মহান সত্তা এবং প্রকৃতিতে প্রকাশ্য ভাবে আমাকে যাহা হইতে হইবে, ঐ অধ্যাত্ম শক্তি তাহার সকল বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া ক্রমবর্দ্ধমানভাবে সেই সত্তারই আত্ম-অভিব্যক্তিকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। এই ক্রিয়ার মধ্যেই ইহার নিজের সাফল্যের নীতি নিহিত রহিয়াছে, তাহাই হইতেছে স্বভাব ও স্বধর্ম্মের নীতি।

জীব আত্ম-অভিব্যক্তিতে পুরুষোত্তমেরই একটি অংশ-বিশেষ। প্রকৃতিতে সে পরমাত্মার শক্তির প্রতিভূ স্বরূপ, তাহার ব্যক্তিত্বে সে সেই শক্তিই; সে ব্যষ্টিগত জীবনে বিশ্বপুরুষের সম্ভাবনাগুলিকেই প্রকট করে। এই জীব নিজেও আত্মা, প্রাকৃত অহং নহে; অহংরূপ নহে পরন্তু আত্মাই আমাদের প্রাকৃত সত্তা এবং আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম তত্ত্ব। আমরা বস্তুতঃ যাহা এবং আমরা যাহা হইতে পারি তাহার প্রকৃত শক্তি রহিয়াছে ঐ উর্দ্ধতন অধ্যাত্ম শক্তির মধ্যে, আর ইহার কর্ম্মধারার যে অন্তরতম ও মূলগত সত্য তাহা ত্রিগুণময়ী মায়ার যন্ত্রবৎ ক্রিয়া নহে; এই মায়া হইতেছে কেবল বর্ত্তমান কার্য্যকরী শক্তি, নীচের স্তরে সুবিধার জন্য একটা সরঞ্জাম, বাহ্যিক অনুশীলন ও অভ্যাসের একটা ব্যবস্থা। যে অধ্যাত্ম প্রকৃতি বিশ্বমাঝে এই বহু রূপ গ্রহণ করিয়াছে, পরাপ্রকৃতিজীবভূতা, তাহাই হইতেছে আমাদের জীবনের মূল উপাদান; বাকী আর সব কিছুই হইতেছে অধ্যাত্মের এক উচ্চতম প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া হইতে নিম্নতর সৃষ্টি এবং বাহ্যতররূপ। আর প্রকৃতিতে আমাদের প্রত্যেকেরই আছে নিজ নিজ বিবর্ত্তনের একটা মূল নীতি ও সঙ্কল্প; প্রত্যেক জীব হইতেছে একটি আত্ম-চৈতন্যের শক্তি, সে নিজের মধ্যে ভাগবতের একটি পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করে এবং তাহার দ্বারা নিজের কর্ম্ম ও ক্রমবিকাশ, নিজের ক্রমবর্দ্ধমান আত্মোপলব্ধি, নিজের নিত্য বৈচিত্র্যময় আত্ম-প্রকাশ, পূর্ণ সংসিদ্ধির দিকে নিজের দৃশ্যত অনিশ্চিত কিন্তু নিগূঢ়ভাবে অবশ্যম্ভাবী প্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সেইটিই হইতেছে আমাদের স্বভাব, আমাদের নিজ সত্য প্রকৃতি, সেইটিই হইতেছে আমাদের সত্তার সত্য, তাহা জগতে আমাদের বিচিত্র বিবর্ত্তনে এখন কেবল নিরন্তর আংশিক ভাবেই প্রকট হইতেছে। কর্ম্মের যে-নীতি এই স্বভাবের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় তাহাই হইতেছে আমাদের আত্ম-সংগঠন, কর্ত্তব্য কর্ম্মধারার যথার্থ ধর্ম্ম, আমাদের স্বধর্ম্ম।

সমস্ত বিশ্বেই এই নীতি পরিব্যাপ্ত, সর্ব্বত্রই কাজ করিতেছে এক অদ্বিতীয় দিব্যশক্তি, এক সাধারণ বিশ্ব-প্রকৃতি, কিন্তু প্রত্যেক স্তর, রূপ, শক্তি, গণ, জাতি, ব্যষ্টিগত জীবের মধ্যে সে একটি প্রধান ভাব এবং নিত্য ও জটিল পরিবর্ত্তনের কয়েকটি অপ্রধান ভাব ও নীতি অনুসরণ করিতেছে, প্রত্যেকের স্থায়ী ধর্ম্ম এবং অস্থায়ী ধর্ম্ম দুই-ই ইহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহারাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় বিবর্ত্তনের মধ্যে প্রত্যেকের সত্তার ধারা, তাহার উদ্ভব, স্থিতি ও পরিবর্ত্তনের মার্গ, তাহার আত্মরক্ষা ও আত্ম-বিবর্দ্ধনের শক্তি, তাহার সুপ্রতিষ্ঠ ও ক্রমবিকাশশীল আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির গতি, বিশ্বমাঝে ব্রহ্মের অভিব্যক্তির অবশিষ্ট অংশের সহিত তাহার সম্বন্ধের বিধি। নিজ সত্তার ধর্ম্ম স্বধর্ম্ম অনুসরণ করা, নিজ সত্তায় নিহিত ভাবের স্বভাবের বিকাশ করা—ইহাই হইতেছে তাহার নির্ব্বিঘ্ন প্রতিষ্ঠা, তাহার যথাযথ পন্থা ও পদ্ধতি। পরিশেষে তাহা জীবকে কোন বর্ত্তমান রূপায়নের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে না, পরন্তু বিকাশের এই পথ অনুসরণ করিয়া জীব নিজ ধর্ম্ম ও নীতির সহিত সমঞ্জসীভূত নূতন নূতন অভিজ্ঞতায় নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত ভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে এবং প্রবলতম শক্তিতে বর্দ্ধিত হইয়া যথাসময়ে বর্ত্তমান অবয়ব সকলকে ভেদ করিয়া উচ্চতর আত্ম-প্রকাশে উপনীত হইতে পারে। নিজ ধর্ম্ম ও নীতিকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়া, যাহাতে পারিপার্শ্বিককে নিজের সহিত মিলাইয়া লইতে পারা যায় এবং তাহাকে নিজ প্রকৃতির উপযোগী করিয়া তোলা যায় এইভাবে পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজেকে মিলাইতে না পারা—ইহা হইতেছে নিজেকে হারাইয়া

ফেলা, আত্ম-আবিষ্কারে বঞ্চিত হওয়া, আত্মার পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া, ইহা বিনষ্টি, মিথ্যা, মৃত্যু, ক্ষয় ও ধ্বংসের বেদনা, অনেক সময়েই এইভাবে নির্ব্বাণ ও বিলুপ্তির পর আত্মাকে পুনরুদ্ধার করিবার কষ্টকর সাধনা আবশ্যক হয়, ইহা ভ্রান্তপথে বৃথা পরিভ্রমণ, আমাদের প্রকৃত প্রগতির পরিপন্থী। এই নীতি প্রকৃতির সর্ব্বত্র কোন না কোন আকারে প্রচলিত রহিয়াছে; যে সাধারণত্বের নীতি ও বৈচিত্র্যের নীতির ক্রিয়াবিজ্ঞান আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে সে-সবেরই মূলে ইহা রহিয়াছে। মানুষের জীবনে তাহার বহু মানবীয় শরীরে বহু জন্মে ঐ একই নীতি কার্য্য করিতেছে। এখানে ইহার একটা বাহ্যিক ক্রিয়া রহিয়াছে এবং একটি আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্য রহিয়াছে; আর যখন আমরা ঐ আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্যটি লাভ করি এবং আমাদের সমুদয় কর্ম্মকে আধ্যাত্মিক সার্থকতায় উদ্ভাসিত করি—তখনই ঐ বাহ্যিক ক্রিয়া তাহার পূর্ণ ও সমগ্র অর্থলাভ করিতে পারে। আত্মজ্ঞানে আমাদের প্রগতির অনুপাতে এই মহান ও বাঞ্ছনীয় রূপান্তর দ্রুত ও বলিষ্ঠভাবে সম্পাদিত হইতে পারে।

আর প্রথমেই আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্বভাব বলিতে উচ্চতম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে এক জিনিষ বুঝায়, আর ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতিতে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ও অর্থ গ্রহণ করে। এখানেও উহা কর্ম্ম করে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিজেকে পায় না, যেন অর্দ্ধ আলোকে বা অন্ধকারে তাহার নিজস্ব সত্য ধর্ম্মটির সন্ধান করে এবং বহু নিম্নতম রূপ, বহু মিথ্যারূপ, অন্তহীন ত্রুটি, বিকৃতি, আয়হানি, আত্মলাভের ভিতর দিয়া নিজের পথে চলিতে থাকে, অবশেষে সে আত্ম-দর্শন ও সিদ্ধিতে উপনীত হয়। এখানে আমাদের প্রকৃতি হইতেছে জ্ঞান ও অজ্ঞানের, সত্য ও মিথ্যার, সফলতা ও বিফলতার, ন্যায় ও অন্যায়ের, লাভ ও ক্ষতির, পাপ ও পুণ্যের মিশ্রিত রচনা। এই সবের ভিতর দিয়া স্বভাবই আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রাপ্তির অনুসন্ধান করিতেছে, স্বভাবস্থ প্রবর্ত্ততে—এই সত্য হইতে আমাদের সর্ব্বতোমুখী ঔদার্য্য এবং সমদৃষ্টি শিক্ষা করা উচিত, কারণ আমরা সকলে ঐ একই বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্বের অধীন। এইসব ক্রিয়া আত্মার নহে, প্রকৃতির। পুরুষোত্তম এই অজ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি ঊর্দ্ধ হইতে ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জীবকে তাহার সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পরিচালিত করেন। শুদ্ধ অক্ষর আত্মা এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, সে তাহার অলক্ষ্য শাশ্বত প্রতিষ্ঠা হইতে ক্ষর প্রকৃতিকে তাহার বিপর্য্যয় সকলের মধ্যে দর্শন করে, ধরিয়া থাকে। ব্যষ্টিগত জীবের যাহা প্রকৃত আত্মা, আমাদের মধ্যে যাহা কেন্দ্রীয় সত্তা, তাহা এই সকল জিনিষ হইতে মহত্তর, কিন্তু প্রকৃতিতে তাহার বাহ্যিক ক্রমবিকাশে এই সকলকে স্বীকার করিয়া লয়। আর যখন আমরা এই প্রকৃত আত্মাকে লাভ করি, যে অপরিবর্ত্তনীয় সর্ব্বগত আত্মা আমাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহাকে লাভ করি এবং যে পুরুষোত্তম—আমাদের যে হৃদিস্থিত ঈশ্বর—প্রকৃতির সমুদয় কর্ম্মের উপর অধ্যক্ষরূপে বিরাজ করিয়া সব কিছু পরিচালন করিতেছেন তাঁহাকে লাভ করি তখনই আমরা আমাদের জীবনের ধর্ম্মের সমগ্র অধ্যাত্ম অর্থটির সন্ধান পাই। কারণ যে জগদীশ্বর অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহার অনন্তগুণে সর্ব্বভূতের মধ্যে নিজেকে প্রকট করিতেছেন, আমরা তাঁহাকে অবগত হই। আমরা ভগবানের চতুর্ব্যূহ সত্তা সম্বন্ধে সজ্ঞান হই—আত্ম-জ্ঞানও বিশ্ব-জ্ঞানের সত্তা; বল ও শক্তির যে-সত্তা, নিজের শক্তিসকলের সন্ধান করিতেছে, আবিষ্কার করিতেছে, প্রয়োগ করিতেছে; অন্যোন্যাশ্রয় ও সৃষ্টি ও সম্বন্ধ ও জীবে জীবে আদান প্রদানের সত্তা; কর্ম্মের যে সত্তা বিশ্বে শ্রম করিতেছে। আবার আমাদের মধ্যে ভগবানের যে ব্যষ্টিগত শক্তি রহিয়াছে সে-সম্বন্ধেও আমরা সজ্ঞান হইয়া উঠি, তাহা এই চতুর্বিধ শক্তিকে সাক্ষাৎভাবে ব্যবহার করিতেছে, আমাদের আত্ম-অভিব্যক্তির ধারা নির্দ্দেশ করিতেছে, আমাদের দিব্যকর্ম্ম ও দিব্যপদ নির্দ্ধারণ করিতেছে এবং এই সবের ভিতর দিয়াই তাঁহার বৈচিত্র্যময় সার্ব্বিকতার মধ্যে আমাদিগকে উত্তোলন করিতেছে যেন ইহা দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার সহিত এবং বিশ্বমাঝে তিনি যাহা কিছু হইয়াছেন সেই সবের সহিত আমাদের আধ্যাত্মিক একত্ব লাভ করি।

মানুষের মধ্যে চারিবর্ণের যে বাহ্যিক পরিকল্পনা তাহা দিব্য কর্ম্মধারার এই সত্যের কেবল অপেক্ষাকৃত বাহ্যিক ক্রিয়ার সহিতই সংশ্লিষ্ট; গুণত্রয়ের ক্রিয়ার মধ্যে ইহার কার্য্যপ্রণালীর কেবল একটি মাত্র দিকেই উহা সীমাবদ্ধ।

ইহা সত্য যে, এই জীবনে মানুষ মোটামুটি চারিশ্রেণীর মধ্যে পড়ে—জ্ঞানের মানুষ, কর্ম্মের মানুষ, উৎপাদনশীল প্রাণিক (vital) মানুষ এবং রূঢ় শ্রম ও সেবার মানুষ। এই শ্রেণীবিভাগগুলি মূল প্রকৃতিগত নহে, পরন্তু ইহারা আমাদের মানবত্বের আত্মবিকাশে বিভিন্ন স্তর। মানুষ যথেষ্ট অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তির বোঝা লইয়া যাত্রারম্ভ করে, তাহার প্রথম দশা হইতেছে রূঢ়শ্রমের, শরীরের প্রয়োজন, প্রাণের সম্প্রেরণা, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম তাহার পশুসুলভ আলস্যকে এই শ্রমে বাধ্য করে, আর প্রয়োজনের একটা সীমা ছাড়াইয়াও সমাজ সাক্ষাৎভাবে অথবা গৌণভাবে তাহাকে এই শ্রমে বাধ্য করে; যাহারা এখনও এই তামসিকতার অধীনে তাহারাই শূদ্র, সমাজের দাসশ্রেণী, তাহারা সমাজকে তাহাদের শারীরিক শ্রম দেয়, তাহা ছাড়া সামাজিক জীবনের বহুমুখী খেলায় তাহারা অন্যান্য অধিকতর উন্নত মানুষের তুলনায় আর কিছুই দিতে পারে না অথবা খুব কমই দিয়া থাকে। ক্রিয়াশীলতার দ্বারা মানুষ নিজের মধ্যে রজঃগুণের বিকাশ করে এবং আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ পাই, যে প্রয়োজনীয় সৃষ্টি, উৎপাদন, সঞ্চয়, অর্জ্জন, অধিকার ও ভোগের নিরন্তর প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হয়, সে হইতেছে মধ্যবিত্ত আর্থিক ও প্রাণিক মানব, বৈশ্য। আমাদের সাধারণ প্রকৃতির রাজসিকতা বা সক্রিয়তার আরও উচ্চতর স্তরে আমরা পাই এমন কর্ম্মশীল মানব—যাহার আছে অধিকতর প্রবল ইচ্ছাশক্তি, স্পর্দ্ধিততর উচ্চাশা, কর্ম্ম করিবার, যুদ্ধ করিবার, নিজের ইচ্ছাকে জয়ী করিবার স্বাভাবিক প্রেরণা এবং উচ্চতম স্তরে নেতৃত্ব করিবার, প্রভুত্ব করিবার, শাসন করিবার, নিজের পথে জনমণ্ডলীকে চালিত করিবার প্রেরণা—সে যোদ্ধা, নেতা, শাসক, সামন্ত, রাজা, সে-ই ক্ষত্রিয়। আর যেখানে সাত্ত্বিক মনেরই প্রাধান্য সেখানে আমরা পাই ব্রাহ্মণ, তাহার প্রবৃত্তি জ্ঞানের দিকে, সে জীবনে লইয়া আইসে চিন্তা, বিচার, সত্যের অনুসন্ধিৎসা এবং একটা বুদ্ধিসঙ্গত বিধান, অথবা উচ্চতম স্তরে একটা আধ্যাত্মিক বিধান এবং ইহার আলোকে সে জীবনের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি নির্ণয় করে।

মানব প্রকৃতিতে সকল সময়েই বিকশিত অবস্থাতেই হউক কিম্বা অবিকশিত অবস্থাতেই হউক, উদার হউক কিম্বা সঙ্কীর্ণ হউক, দমিত থাকুক কিম্বা বাহিরে প্রকট হউক, এই চারিটি চরিত্রের কিছু না কিছু রহিয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষে এই চারিটির কোন একটি প্রাধান্যলাভ করিতে চায় এবং কখনও কখনও প্রকৃতির ক্রিয়ার সমস্ত ক্ষেত্রটিকেই অধিকার করিয়া লইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আর সকল সমাজেই আমরা এই চারি শ্রেণী পাইব—এমন কি, বর্ত্তমান যুগে যেমন চেষ্টা করা হইয়াছে, আমরা যদি সমাজকে কেবলই উৎপাদনশীল ও ব্যবসামূলক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি, অথবা আধুনিকতম মন যেদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ইউরোপের এক অংশে যে বিষয়ে এখন পরীক্ষা চলিতেছে এবং অন্যত্র সমর্থিত হইতেছে, যদি একটা শ্রমিক সমাজ, জনসাধারণকে লইয়া একটা শূদ্র সমাজই গড়িয়া তুলি, তাহা হইলেও সেখানে এই চারি শ্রেণী থাকিবে। তখনও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থাকিবে, তাহারা সমস্ত প্রয়াসটির নীতি, সত্য ও নিয়ামক বিধির অনুসন্ধান করিতে ব্রতী হইবে; শ্রমশিল্পের অধ্যক্ষ ও নেতা থাকিবে, তাহারা এই সব উৎপাদনমূলক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিজেদের সাহসিকতা ও সংগ্রাম ও নেতৃত্ব ও প্রাধান্যের প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিবে; শুধুই উৎপাদন ও ধনোপার্জ্জনে যাহারা ব্রতী এইরূপ সাধারণ ধরণের বহুলোক থাকিবে; আবার সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী থাকিবে, তাহারা সামান্য কিছু শ্রমমূলক কর্ম্ম এবং তাহাদের শ্রমের পুরস্কার পাইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবে। কিন্তু এ-সমস্তই হইতেছে বাহিরের জিনিষ, আর ইহাই যদি সব হইত, তাহা হইলে মানব জাতির এই অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের কোনই আধ্যাত্মিক উপযোগিতা থাকিত না। বড় জোর, ইহার কেবল এই অর্থ হইতে পারে যে, আমাদিগকে জন্মে জন্মে ক্রমবিকাশের এই সকল স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, ভারতে কখনও কখনও এইরূপ মতই দেখা গিয়াছে; কারণ আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে তামসিক, রজোতামসিক, রাজসিক বা রজোসাত্ত্বিক প্রকৃতির ভিতর দিয়া সাত্ত্বিক প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতে হয়, আভ্যন্তরীণ ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে উঠিতে ও প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় এবং তাহার পর সেই ভিত্তি হইতে মোক্ষলাভের জন্য সাধনা করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে গীতা যে বলিয়াছে, শূদ্র ও চণ্ডালও তাহার জীবনকে ভগবদ্‌মুখী করিয়া সোজা অধ্যাত্মমুক্তি ও সিদ্ধির মধ্যে উঠিতে পারে, এই কথার আর কোনই যুক্তিযুক্ততা থাকে না।

মূল যে সত্য সেটি এই বাহিরের জিনিষ নহে, তাহা হইতেছে আমাদের সচল আভ্যন্তরীণ সত্তার শক্তি, অধ্যাত্ম প্রকৃতির চতুর্ব্বিধ সক্রিয় শক্তির সত্য। প্রত্যেক জীব তাহার অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে এই চারিটি দিক লইয়া আছে, সে হইতেছে জ্ঞানের সত্তা, বল ও শক্তির সত্তা, পরস্পরের সম্বন্ধ ও আদান-প্রদানের সত্তা এবং কর্ম্ম ও সেবার সত্তা; কিন্তু কর্ম্ম এবং অভিব্যক্তির ধারায় কোন একটি দিকই প্রাধান্য লাভ করে এবং জীবাত্মার সহিত তাহার আধারভূত প্রকৃতির সম্বন্ধকে বিশিষ্টতা প্রদান করে; সেইটিই পথ দেখায় এবং অন্য শক্তিগুলির উপর নিজের ছাপ মারিয়া দেয়, সে-সকলকে কর্ম্ম, প্রবৃত্তি ও অনুভূতির প্রধান ধারাটির প্রয়োজনে নিয়োগ করে। তখন স্বভাব এই ধারাটির ধর্ম্মই অনুসরণ করে, সামাজিক শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী স্থূল ও বাঁধাধরা ভাবে নহে, পরন্তু সূক্ষ্ম ভাবে, নমনীয় ভাবে, এবং ইহাকে বিকশিত করিতে গিয়াই অন্য তিনটি শক্তিকেও বিকশিত করিয়া তোলে। এইরূপে কর্ম্ম ও সেবার প্রেরণাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিলে তাহা জ্ঞানকে পুষ্ট করে, শক্তিকে বর্দ্ধিত করে, অনন্যপরতার ঘনিষ্ঠতা ও সামঞ্জস্যকে এবং সম্বন্ধের কৌশল ও পারম্পর্য্যকে সুষ্ঠু করিয়া তোলে। চতুর্ম্মুখী দেবতার প্রত্যেকটি দিকের মুখ্য স্বাভাবিক তত্ত্বটি অন্য তিনটির দ্বারা প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়, এইভাবেই তাহা সমগ্র সিদ্ধির অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই যে ক্রমবিকাশ, ইহা গুণত্রয়ের ধর্ম্ম অনুসরণ করে। জ্ঞানময় সত্তার যে ধর্ম্ম সেইটিকেও তামসিকভাবে অথবা রাজসিকভাবে অনুসরণ করা যায়। শক্তির যে ধর্ম্ম সেইটিকেও পাশবিক ও তামসিকভাবে অথবা সমুচ্চ সাত্ত্বিকভাবে অনুসরণ করা যায়, সেইরূপ কর্ম্ম ও সেবার ধর্ম্মকেও প্রবল রাজসিক ভাবে অথবা সুন্দর ও উদার সাত্ত্বিকভাবে অনুসরণ করা যায়। আভ্যন্তরীণ ব্যষ্টিগত স্বধর্ম্মের যে ধারা তাহাতে উপনীত হওয়া এবং জীবনের পথে সেই ধারা আমাদিগকে যে-কর্ম্মে অনুপ্রাণিত করে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া—ইহাই হইতেছে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রথম প্রয়োজন। আর এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঐ আভ্যন্তরীণ স্বধর্ম্ম কোন বাহ্য সামাজিক বা অন্য প্রকার কর্ম্ম, বৃত্তি বা অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে কর্ম্মশীল সত্তা সেবাতেই তৃপ্তি পায় অথবা আমাদের মধ্যে এইরূপ যে কর্ম্মীর ভাব রহিয়াছে তাহা তাহার শ্রমের দিকে, সেবার দিকে ভাগবত প্রেরণাকে পরিতৃপ্ত করিবার উপায়রূপে জ্ঞানচর্চ্চার জীবন, সংঘর্ষ ও শক্তির জীবন অথবা অনন্যপরতা, উৎপাদন ও আদান-প্রদানের জীবন গ্রহণ করিতে পারে।

আর পরিশেষে এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার দিব্যতম রূপায়নে এবং সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বান অধ্যাত্মশক্তিতে উপনীত হওয়াই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা সমুচ্চ অধ্যাত্ম সিদ্ধির দ্রুততম ও উদারতম সত্যে প্রবেশ করিবার প্রশস্ত দ্বার। আমরা ইহা করিতে পারি যদি আমরা স্বধর্ম্মের ক্রিয়াকে আভ্যন্তরীণ ভগবানের, বিশ্বপুরুষের এবং বিশ্বাতীত পুরুষোত্তমের পূজায় পরিণত করি এবং শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র কর্ম্মটিকেই তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি, ময়ি সংন্যস্য কর্ম্মাণি। তখন যেমন আমরা গুণত্রয়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাই, তেমনিই আমরা চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিভাগ এবং সকল বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের সীমাও অতিক্রম করিয়া যাই, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। তখন বিশ্বপুরুষ ব্যষ্টিগত জীবকে বিশ্বগত স্বভাবের মধ্যে তুলিয়া লন, আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে চতুর্ম্মুখী সত্তা রহিয়াছে সেইটিকে সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধ ও একীভূত করিয়া দেন এবং তাহার স্ব-নিয়ন্ত্রিত কার্য্যাবলী ভাগবত ইচ্ছা অনুসারে এবং জীবের মধ্যে ভাগবতের যে-শক্তি সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তদনুসারে সম্পন্ন করিয়া দেন।

গীতার আদেশ হইতেছে আমাদের নিজ কর্ম্মের দ্বারা, স্ব-কর্ম্মণা ভগবানের উপাসনা করা, আমাদের অর্পণ যেন হয় আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির নিজস্ব ধর্ম্মের দ্বারা নির্দ্ধারিত কর্ম্ম। কারণ ভগবান হইতেই সকল সৃষ্টির ধারা ও কর্ম্মের প্রেরণা উৎপন্ন হয় এবং তাঁহার দ্বারাই এই সমুদয় বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে এবং জগৎসমূহকে সংগ্রথিত রাখিবার জন্য তিনি স্বভাবের ভিতর দিয়া সকল কর্ম্ম পরিচালন করিতেছেন, তাহাদের রূপ গড়িয়া দিতেছেন। আমাদের আন্তর ও বাহ্য কার্য্যাবলীর দ্বারা তাঁহাকে উপাসনা করা, আমাদের সমগ্র জীবনকে পরমতমের উদ্দেশে কর্ম্মযজ্ঞে পরিণত করা—ইহা হইতেছে আমাদের সকল সঙ্কল্প ও সত্তা ও প্রকৃতিতে তাঁহার সহিত এক হইয়া উঠিবার জন্য নিজে-দিগকে প্রস্তুত করিবার সাধনা। আমাদের কর্ম্ম হওয়া চাই আমাদের ভিতরের সত্য অনুযায়ী, তাহা যেন কোন বাহ্যিক

ও কৃত্রিম আদর্শের সহিত আপোষ না হয়, তাহা যেন হয় অন্তরাত্মা ও তাহার সহজাত শক্তিসকলের জীবন্ত ও যথার্থ অভিব্যক্তি। কারণ আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতিতে এই অন্তর্পুরুষের যে জীবন্ত অন্তরতম সত্য তাহার অনুসরণ করিলে তাহা যথাকালে আপাত-অতিচেতন পরাপ্রকৃতির মধ্যে ঐ অন্তর্পুরুষেরই যে অমৃত সত্য তাহাতে উপনীত হইতে সাহায্য করে। সেখানে আমরা ভগবানের সহিত এবং আমাদের সত্য সত্তার সহিত এবং সর্ব্বভূতের সহিত একত্বে বাস করিতে পারি এবং সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধ হইয়া অমৃতধর্ম্মের মুক্তির মধ্যে দিব্য কর্ম্মের অনবদ্য যন্ত্র হইয়া উঠি।*

* যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ১৮।৪৬

* Essays on the Gita হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

বর্ষা নেমেছে সন্ধ্যাবেলা

শ্রীবিশ্বনাথ রায়চৌধুরী

১

দুলাস্‌নে আর এলোচুল ওলো রাতি
ভুলাস্‌নে আর এমন করিয়া সাথি,
চঞ্চল তোর বুকের তৃষায়
আমার মনের বাসনা মিশায়
উদ্বেল হই ব্যথার বেদনে কাহার লাগি
না জানি লো তোর মমতায় কেন শিহরি জাগি ?

২

আসিস্ কেবল বারেকের তরে ধরণী 'পর
গোপনে কোথায় থাকিস্ লুকায়ে, কোথায় ঘর ?
সারাদিনমান কোন্ নিরালায়
কাহারে ভুলাস মোহিনী মায়ায়
আমারে কেবল মিছে ছলনায় বেলার শেষে
এসো ঢাকি মুখ অবগুণ্ঠনে বধূর বেশে।

৩

কপালে পরিয়া ঝিঙের ফুলের সোনালী টিপ
জ্বালিয়া আকাশ তুলসীর তলে সন্ধ্যা দীপ
আসিস্ নে আর কাজল পরিয়া
আসিস্ নে সখি রূপ উজাড়িয়া
মিনতি করি লো তোরে বারে বারে আমি চপল
বারণ করি গো ভিজাস্‌নে তোর লঘু আঁচল।

৪

রঙীন বসন আজ কেন তোর সিক্ত হ'লো
চলে যা কুঞ্জে একা অভিসারে সময় গেলো
এ প্রিয় কবিরে ডাকিস্‌নে আর
হাতছানি দিয়ে মিছে বারবার
কল্পনা শুধু জাগাতে দে মোরে নিরালা গেহে
বাঁধিস্ নে আর বাঁধিস্ নে মোরে ভ্রান্ত স্নেহে।

৫

ফুটাবে পারুল বকুল তোমার পরশ পেয়ে
দুলিবে দোদুল করবীগুচ্ছ পূরবী গেয়ে
ইমনের যত অজানা গমক
বারে বারে তোর জাগাবে চমক
বিজলী গাঁথিবি আকাশ গলের মেঘমালায়
আমি ঘরে একা আনমনে রব' স্মৃতি খেলায়।

৬

ওরে তোরা দেখ বর্ষা নেমেছে সন্ধ্যাবেলা
দেখ্ চেয়ে ঐ গগনের কোলে কিসের খেলা
জীবনের আজ যত ব্যথা গান
বাসনায় ঘেরা যত অভিমান
আলাপে জমিয়ে গুঞ্জনতানে ব্যক্ত কর
ওলো সখি তোরা বঁধুয়ার পায়ে লুটায়ে পড়॥

রায়সাহেবের চিঠি

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

এক সময় যদু পণ্ডিত মহাশয়ের বেতের ভয়ে গ্রামশুদ্ধ ছেলেরা ভয় করিলেও নিজের ছেলে শ্রীমান্ পরাণকে তিনি শাসন করিতে পারেন নাই। লেখাপড়া শেখানর যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও যখন তিনি দেখিলেন, কিছুতেই কিছু হইবার নহে—তখন হাল ছাড়িয়া দিলেন।

পরাণ বাল্যকালে হাতে গুল্‌তি লইয়া মাঠে মাঠে শিকার সন্ধানে ঘুরিয়াছে। যৌবনে গাঁয়ের যাত্রাদলে একাধিকবার গোঁফ্ কামাইয়া রাণী সাজিয়া মেডেল লাভ করিয়াছে। কিন্তু যদু পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আজ তাহার জীবনে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পৈতৃক যৎসামান্য জমিজমা যাহা ছিল তাহা ভাগে খাটাইয়া, পরে নিজে চাষ আবাদ করিয়া এবং পাটের দালালি ও তেজারতি কারবারে কয়েক বৎসরের মধ্যেই যাকে বলে একেবারে আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ—তাহাই হইয়াছে।

অনেকে এই লেখাপড়া না-জানা গণ্ডমুখ্যু লোকটির অসম্ভব উন্নতি দেখিয়া পশ্চাতে হিংসা করিলেও সম্মুখে সকলেই তাহার ব্যবসাবুদ্ধির তারিফ করে। কেহ বলে, আজ সে লাখপতি; কেহ বলে কেবল সুদে খাটেই লাখ টাকা; আবার কেহ বলে, হাজার পঞ্চাশেকের বেশী নহে। সে যাহাই হউক, পঞ্চাশ হাজার হউক আর এক লাখই হউক গত বৎসরে অজন্মাজনিত যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল তাহাতে সে মহকুমা ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে এক-আধ পয়সা নহে, একেবারে দশ হাজার টাকা চাঁদা দিয়া রাজার জন্মদিনে 'রায়সাহেব' খেতাব পাইয়াছে। এই খেতাবপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কদরও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশেপাশে কয়েকটি মোসাহেবও আসিয়া জুটিয়াছে। আজ তাহাকে সকলে অন্তরের সহিত সম্মান করুক আর নাই করুক, বাহিরে সম্মান দেখাইতে কেহ কার্পণ্য করে না।

পরাণের এ হেন সৌভাগ্য যদু পণ্ডিত মহাশয় দেখিয়া যাইতে না পারিলেও তাঁহার স্ত্রী দীনতারিণী নয়ন ভরিয়া দেখিয়া সম্প্রতি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আজ তাঁহারই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সারা গ্রামে মহা ধূমধাম হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। দীন দুঃখী হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যবিত্ত এমন কি, বড়লোকেরাও চাহিয়া আছেন—রায় সাহেব পরাণ তাহার মাতৃ-শ্রাদ্ধে কি ঘটা করে।

পরাণের বাল্যবন্ধু হরলাল যদু পণ্ডিতের পাঠশালা শেষ করিয়া অর্থের অভাবে আর পড়াশুনা করিতে পারে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে সে বিষয়-আশয় দেখাশুনার কাজে ভারী পাকা লোক হইয়া উঠিয়াছে। শিরদাঁড়ির জমিদারের সেরেস্তায় সে অন্ততঃ আট-নয় বৎসর সুনামের সহিত কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। পরাণ তাহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচ টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দিয়া তাহার এই বন্ধুটিকে হিসাব-পত্র লেখার জন্য লইয়া আসিল।

হরলাল হিসাব-পত্র লেখার কাজে পাকা লোক হইলে কি হয়? একটি দোষ তাহার আছে—সব কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যস্ততা।

পরাণ হরলালকে পরামর্শের জন্য যখন ডাকিল যে তাহার মাতৃশ্রাদ্ধে কি করা যায়, হরলাল পরাণের কথা শেষ হইতেই স্বভাবোচিত ব্যস্ততায় বলিয়া বসিল, এ আর বেশী কথা কি! দাঁড়াও সব ঠিক করে দিচ্ছি—একটা নেমন্তন্ন চিঠি ছাপানর দরকার, এই চিঠি অন্তত হাজার খানেক জেলার বড় বড় লোকদের দেওয়া দরকার। পান-সুপুরি দিয়ে নেমন্তন্ন করার কাল এখন আর নেই—বুঝলে, এখন এই রীতি। সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম লইয়া হরলাল চিঠি লিখিয়া ফেলিল—

৺গঙ্গা

সময়োচিত নিবেদন—

বিগত ২২শে আষাঢ় সন ১৩৪৬ সাল রবিবার আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী ৺লাভ করিয়াছেন। আগামী ২রা শ্রাবণ তাঁহার আদ্যকৃত্য হইবে। অতএব সানুনয়

নিবেদন এই যে, আপনি সবান্ধবে অনুগ্রহপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া আমাকে দায়মুক্ত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

স্মারকলিপি ঃ

২রা—পূর্ব্বাহ্নে আদ্যকৃত্য ও সভাধিরোহণ
৩রা—সায়াহ্নে ব্রাহ্মণ, আত্মীয় কুটুম্ব ভোজন।
৪ঠা—নিয়মভঙ্গ ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা।

কুসুমপুর
২৮শে আষাঢ়
১৩৪৬ সাল

ভাগ্যহীন
পরাণ দেবশর্ম্মণঃ
(রায়সাহেব)

উপরোক্ত পত্রখানি লিখিয়া হরলাল পরাণকে পড়িয়া শুনাইয়া দিল। পরাণ শুনিয়া বলিল—ঠিক আছে। কিন্তু পরাণের অন্যতম বাল্যবন্ধু ও যৌবনের যাত্রাদলের প্রধান পাণ্ডা সিদ্ধেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া উঠিল, তা বললে কি হয়। তোমার মায়ের শ্রাদ্ধে দীনদাস বাবাজীর কীর্ত্তন আর গৌরাঙ্গ অপেরাপার্টির 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা—এদুটো দিতেই হবে। সুতরাং সিদ্ধেশ্বরের কথা রাখিয়া প্রথম দিন কীর্ত্তন ও দ্বিতীয় দিন পালাগান হইবে পত্রে তাহা লিখিয়া দেওয়া হইল। হরলাল বলিল, আর ত দিন নেই, সুতরাং এখুনই এই চিঠি ছাপানর জন্যে শহরে লোক পাঠানর দরকার। সিদ্ধেশ্বর হরলালকে বলিল, দেখ, অনেকে পরাণের মাতৃশ্রাদ্ধে লৌকিকতা করতে পারে কিন্তু পরাণের তা নেওয়া উচিত হবে না। সুতরাং পত্রের শেষে সেটা লিখে দাও যে লৌকিকতা গ্রহণ করা হবে না।

হরলাল এইবার বিপদে পড়িল। সে বিবাহের চিঠির শেষে লেখা থাকিতে দেখিয়াছে লৌকিকতার পরিবর্ত্তে নবদম্পতির শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়। কিন্তু শ্রাদ্ধের চিঠির শেষে কি বয়ান লেখা হয়, তাহা তাহার জানা নাই। যাহাই লেখা হউক না কেন, প্রেসের তাহা জানা আছে। প্রেস তাহা বসাইয়া দিবে এই বিশ্বাসে সে নানারূপ ইন্‌তাম্ করিয়া পত্রের শেষে একটি লাইন টানিয়া, তাহার নীচে লিখিয়া দিল—লৌকিকতার পরিবর্ত্তে ইত্যাদি বসিবে।

তখনই সদরে লোক ছুটিল পত্রগুলি ছাপাইয়া আনিতে। এদিকে হরলাল খামে জেলার বড় বড় লোকেদের নাম-ঠিকানা লিখিতে বসিল। পত্রগুলি ছাপাইয়া আসিলেই তাহা এই খামে ভরিয়া তৎক্ষণাৎ ডাকে দিবে।

শহরের প্রেসে হরলালের হাতের লেখা পত্রটি লইয়া যখন লোক আসিল তখন প্রেসে বিবাহের বহু প্রীতি-উপহার, পত্র ইত্যাদি ছাপা হইতেছে। একটি মাত্র প্রেস। তাহার এখন ভারী মরশুম লাগিয়াছে। দিনে রাতে কাজ। রায়সাহেবের চিঠি। সুতরাং বিবাহের চিঠি ছাপিতে ছাপিতে নামাইয়া রাখিয়া এই চিঠি ছাপানর ব্যবস্থা করা হইল। কম্পোজ শেষ হইলে কম্পোজিটর দেখিল কপির শেষে লৌকিকতা ইত্যাদি বসিবে লেখা আছে। সুতরাং সে অপর একটি বিবাহের চিঠি হইতে লৌকিকতা ইত্যাদি লাইনটি লইয়া রায়সাহেবের চিঠির শেষে তাহা জুড়িয়া দিল। কোন রকমে একবার প্রুফ দেখিয়া চিঠি ছাপার অর্ডার হইল। ছাপা শেষ হইলে একটি কাগজে মুড়িয়া রায়সাহেবের লোকের হাতে প্রেসের ম্যানেজার তাহা দিয়া দিলেন।

লোক পত্র লইয়া ফিরিয়া আসিলে হরলাল তাড়াতাড়ি পত্রগুলি ভাঁজ করিয়া ঠিকানা লেখা খামে পুরিয়া টিকিট আঁটিয়া রাতারাতি তাহা ডাকে দিতে শহরে লোক পাঠাইল।

পরের দিন প্রাতঃকালে সিদ্ধেশ্বর পত্র দেখিয়া অবাক! বলিল, যাঃ সর্ব্বনাশ হয়েছে।

পরাণ জানিতে চাহিল কি হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বর বলিল, তুমি বুঝতে পারবে না। হরলালকে বলিল, চিঠিগুলো বিলি হয়নি তো?

হরলাল জানাইল, প্রায় পাঁচশত চিঠি কাল রাত্রে ডাকে দেওয়ার জন্য পাঠান হইয়াছে।

সিদ্ধেশ্বর বলিল, সর্ব্বনাশ হয়েছে। মারাত্মক ভুল! রায়সাহেবের নিন্দা হবে! শহরে লোক পাঠাও—চিঠিগুলো ফেরত আনুক্।

কি হইল, কি সর্ব্বনাশ হইল রায়সাহেব তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

হরলাল হন্তদন্ত হইয়া শহরে ছুটিল।

হরলাল যখন শহরের ডাক-ঘরে আসিয়া পৌঁছিল তখন ডাক-ঘরে মহা ভিড়! মনিঅর্ডার সেভিংস্ ব্যাঙ্কের টাকা জমা দেওয়া, খাম পোষ্টকার্ড বিক্রয়ের কাজে সকলেই ব্যস্ত। হরলাল কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করে, আর কাহাকেই বা কি

বলে। এমন সময় সে দেখিতে পাইল ডাক-ঘরের ঘরের মধ্যে একটি লোক তাহার হাতের লেখা খামগুলির উপর অবিরাম শীলমোহর করিয়া চলিয়াছে। হরলাল বাহির হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, ওতে ছাপ দেবেন না, ওগুলো ফেরত নেবো—

কিন্তু লোকটি তাহার কথায় মোটেই কর্ণপাত না করিয়া যথারীতি শীলমোহর করিতে লাগিল।

হরলাল তাহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। কিন্তু কি করিবে? কাহাকে বলিবে? যাহার কাছে যায়—কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করে না। সে দেখিল শীলমোহর হইয়া গেলে পত্রগুলি ব্যাগে ব্যাগে পুরিয়া একটি লোক বাহির হইয়া আসিতেছে। হরলাল আর স্থির থাকিতে পারিল না। পিয়নকে ধরিয়া বসিল, তাহার চিঠিগুলি ফেরত দিতে হইবে। নহিলে রায়সাহেবের লজ্জার কারণ হইবে। পিয়ন বিরক্ত হইয়া জানাইল সে পারিবে না। পোষ্ট মাষ্টারের অর্ডার চাই। আর তাহা ছাড়া এখন সময়ও নাই। হরলাল জানাইল তাহা বলিলে সে শুনিবে না। যখন সময় ছিল তখন শুনিলে না কেন? এ ভুল না শুধরাইলে তাহার মুখ দেখান ভার হইবে। শেষে পিয়নের হাত ধরিয়া বুঝাইয়া বলিল, বুঝলে রায় সাহেবের চিঠি। কুসুমপুরের রায়সাহেব পরাণ দেবশর্ম্মা! তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধের চিঠিতে মারাত্মক ভুল! 'লৌকিকতার পরিবর্ত্তে নবদম্পতির শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়।' তুমি চিঠি ক'টা ফেরত দাও—নইলে রায়সাহেবের মুখ রক্ষা হয় না।

পিয়ন শুনিলনা। ব্যাগ লইয়া চলিয়া গেল।

হরলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল লৌকিকতার পরিবর্ত্তে ত শুভাশীর্ব্বাদ হইয়াছে, কিন্তু নবদম্পতির পরিবর্ত্তে কি হইবে?

নির্ভীক

শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী

(১)

মাঝ দরিয়ায় উঠছে ঝড়—দুল্‌ছে তরীখান
ডুব্‌তে পারে ডুব্‌তে পারে—ও মাঝি সাবধান।
গহন মেঘে-গগন ঢাকা
দিক্‌বিদিকে আঁধার মাখা
দুল্‌ছে নদী, দুল্‌ছে তরী কাঁপ্‌ছে আমার প্রাণ
ডুব্‌তে পারে নৌকা তোমার ও মাঝি সাবধান।

(২)

সামাল্ সামাল্ ও মাঝি ভাই ওরে ও নির্ভীক
ছাখ্‌রে আবিল কুহেলিকায় ঢেকেছে দশদিক্
বাঁচতে যদি ইচ্ছা থাকে,
ভিড়াও তীরে নৌকাটাকে।
কুল ছাপিয়ে জল ছুটেছে ঐ ডেকেছে বাণ।
নৌকা তোমার ডুবতে পারে—ও মাঝি সাবধান।

(৩)

বাদল ধারা আস্‌ছে নেমে বিজলী খেলায়
মত্তমাতাল বাদল বাতাস ছুটেছে দমকায়
ছিন্ন হ'ল পালের দড়ি
মরণ নাচন নাচছে তরী
উদাস মাঝি নির্ভয়ে ঐ গাইছে বসে গান
রাখবে রাখো মারবে মারো দয়াল ভগবান॥

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

"মনুষ্য জীবন অনন্ত রহস্যময়। কোথায় কোন্ সূত্রে মানবের জন্ম হইল, কোন্ কোন্ অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনাপুঞ্জের কিরূপ সম্মিলন বা বিয়োগে প্রাণবায়ু তাহার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিল; কিরূপে শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অবস্থা-সমূহ নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে প্রকাশ পাইল এবং শেষে ইহজীবনে কিরূপেই বা তাহার অবসান হইল……বিজ্ঞান জন্মমৃত্যুর এই মূল রহস্য আজিও উদ্ঘাটিত করিতে পারে নাই।"—'উপাসনা" পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে পরলোকগত পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তির সহিত তাঁহার জীবনের সামঞ্জস্য দেখা যায়।

নীরবে আজীবন সাহিত্য-সাধনা করিয়া বঙ্গবাণীর রত্ন-ভাণ্ডারে কত অমূল্য রত্নই যে স্বর্গীয় পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দান করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানকালের সাহিত্য-সমাজে তাহার পরিচয়ও অনেকের অজ্ঞাত। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা একান্ত নিভৃতে, সাধারণের প্রশংসা-নিন্দার বাহিরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বঙ্গ সাহিত্যে যাঁহার দান অপরিমিত, যাঁহার আজীবন ঐকান্তিক সাধনা বঙ্গ-বাণীর মন্দিরের অমূল্য ঐশ্বর্য্য—তাঁহাকে যে এত অল্প দিনে সাহিত্য-রসিকবৃন্দ বিস্মৃত হইয়া যাইতে পারেন—ইহা কল্পনা করা যায় না। জনসমাজে তিনি আপনাকে সুপরিচিত করিবার নিমিত্ত কোনও প্রকার প্রচারের ব্যবস্থা করেন নাই, আপনার গুণপণা কীর্ত্তন করাইবারও তিনি ক্যেনও প্রয়াস করেন নাই। তিনি ছিলেন যথার্থ সাধক ও জ্ঞানান্বেষী, কাজেই সম-সাময়িক সাহিত্য-সেবী ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্যিকগণের নিকট তিনি একরূপ অখ্যাত, অপরিচিত এবং অবজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছেন।

ইংরেজ কবি ফিটজেরাল্ড একমাত্র ওমর-খৈয়াম অনুবাদ করিয়াই ইংরেজী সাহিত্য-সমাজে বিখ্যাত হইয়াছেন। পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বহু পুস্তকের রচয়িতা ও অনুবাদক। বিশেষ করিয়া 'টডের রাজস্থানের অনুবাদ' বঙ্গ ভাষায় তাঁহার অমূল্য দান। রাজস্থান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রথমে রবার্ট প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। এই প্রেস হইতে তিনি অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই শাস্ত্র গ্রন্থ। কাশীখণ্ড, মহাভারত, নারদীয় পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও বরাহ পুরাণের বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত মহাশয়ের অসীম শাস্ত্রজ্ঞান ও অনুবাদ করিবার ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে। ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার বহু রচনা আছে। এতদ্ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রেরও অনেকাংশ তিনি অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

নানা প্রকার অভব্য আচরণে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া শেষ জীবনে পণ্ডিত মহাশয় দারুণ মানসিক কষ্টভোগ করিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এই দুশ্চিন্তার জন্য তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেই সময় যাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত—তাহাকে ধরিয়া বলিতেন, "আমার রচিত পুস্তকের সহিত নাকি আমার কোনও সম্বন্ধ নাই! ইহার কোনও প্রতিকার নাই!" কথাগুলি বলিবার সময় অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিত। ক্রমে তিনি বালকের ন্যায় উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেন।

বঙ্গদেশে সাহিত্য-সেবীর ভাগ্য চিরদিন রাহুগ্রস্ত। যাঁহারা বাণীর চরণ পূজা করিবার মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের শেষ জীবন নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে। বাংলা দেশে এরূপ ঘটনা একাধিক বার ঘটিয়াছে। এই সকল মনীষীর শেষ জীবনের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়। বঙ্গ-সাহিত্যে যাঁহাদের দান মণিমুক্তার অপেক্ষাও মূল্যবান, যে সমস্ত মনীষী বাংলা ভাষার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন—মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর, রজনীকান্ত প্রমুখ সেই শ্রেষ্ঠ বঙ্গ-সন্তানগণের এইরূপ শোচনীয় পরিণামের কথা চিন্তা করিতেও বেদনায় মুহ্যমান হইতে হয়।

শ্রদ্ধাস্পদ দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' নামক বাংলা সঙ্গীত পুস্তকে পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি ক্ষুদ্র জীবনী সন্নিবেশিত আছে। এতদ্ব্যতীত আশুতোষ দেব প্রণীত নূতন বাংলা অভিধানেও তাঁহার একটি ক্ষুদ্র জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। আমার পরিচিত

জন্ম—৯ই ভাদ্র, ১২৬৬ সাল　　যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়　　মৃত্যু—১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ সাল

এক সাহিত্যরসিক—অগ্রজপ্রতিম কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের পরিচয় ছিল। কিন্তু তিনিও পণ্ডিত মহাশয়ের জীবৎকালে তাঁহার নিকট তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত জানিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন: "আমি বঙ্গ-সাহিত্যের কতটুকুই বা করিয়াছি। মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরণ-প্রান্তে বসিয়া যাহা লাভ করিয়াছিলাম, তাহারই সাহায্যে বাণীর সেবা করিতে চিরদিন প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। আমি অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য ব্যক্তি—আমার মত ব্যক্তির জীবনীর প্রয়োজনই বা কি?"

বাংলা সন ১২৬৬ সালের ৯ই ভাদ্র তারিখে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী বেলুন গ্রামে মাতুলালয়ে ঐতিহাসিক পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। (ইংরেজী ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ)। তাঁহাদের পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত বেলে শিখিরা গ্রামে। মাতুলালয়েই তাঁহার শৈশব কাটিয়াছিল। মাত্র পঞ্চম বর্ষ বয়সে তাঁহার পিতা মাধবচন্দ্র পরলোকগমন করেন। কলিকাতায় তাঁহার মাতামহের এক ভাগিনেয় থাকিতেন। পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর সেই আত্মীয় ভবনে থাকিয়া বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই গদ্য পদ্য রচনায় তাঁহার হাত ছিল। মাত্র দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তদানীন্তন 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায় তাঁহার 'সমর-শেখর' নামক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভ এই উপন্যাস প্রকাশের পর হইতে সূচিত হয়। যে অগাধ পাণ্ডিত্য ও অক্লান্ত সাহিত্য-সেবার নিদর্শন তাঁহার জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত দেখা যায়, 'আর্য্য দর্শন' পত্রিকা হইতে সেই জীবনের সূত্রপাত। তৎপূর্ব্বে তিনি 'রক্তদন্ত' নামক একখানি পদ্য নাটক রচনা করেন। এই 'রক্তদন্ত' বা 'আহ্লাদ নগরের পতন' বোধ করি বঙ্গ সাহিত্যের প্রথম পদ্য নাটক।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে যজ্ঞেশ্বরবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক ময়মনসিংহ শেরপুর হইতে প্রকাশিত চারুবার্ত্তা পত্রিকা সম্পাদনার্থে প্রেরিত হন্। এই সময়ে তদীয় 'রাবণ বধ' নামক পদ্য নাটক বেঙ্গল থিয়েটর রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টডের রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ-করণে প্রবৃত্ত হন্ এবং দুই বৎসরের মধ্যেই মুদ্রিত ১২০০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই সুবিশাল গ্রন্থের অনুবাদ সমাধা করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের ইতিহাস অবলম্বনে 'রসমালা' নামক গ্রন্থের অনুবাদ করেন। পরের বৎসর তিনি পাঞ্জাব ও রাজপুতানা পরিভ্রমণ করিয়া পাঞ্জাবের ইতিহাস প্রণয়নের জন্য প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করেন।

'হিতবাদী' সংবাদপত্রের জন্ম-দিন হইতেই তিনি ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর ক্রমান্বয়ে বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদকের কার্য্য করেন। এই সময়ে তিনি ইংরেজী হইতে বাংলা ও ইংরেজী এবং বাংলা হইতে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় লিখিত এক বিরাট অভিধান সঙ্কলিত করেন। সর্ব্বসমেত ১০,০০০ পৃষ্ঠায় এই অভিধান-খানি সম্পূর্ণ। বৃহন্নারদীয় পুরাণ, মহাভারত, কাশীখণ্ড, বরাহপুরাণ ও ভবিষ্য পুরাণের বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ এবং 'ভারতে রুশ' নামক ইংরেজী পুস্তকের অনুবাদও প্রকাশিত হয়।

পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বরের 'বীরমালা' গ্রন্থখানি বঙ্গ-সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের ভারতীয় বীরবৃন্দের জীবনকাহিনী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুমহিলা' নামক ভারতীয় নারীগণের জীবনী সম্বলিত পুস্তক প্রকাশিত হয়। 'পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস' নামে তাঁহার আর এক বিরাট গ্রন্থ আছে, এই গ্রন্থ ২৫,০০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সম-সাময়িক বহু মাসিক ও সংবাদপত্রে তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

'উপাসনা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব পরলোকগত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরে যজ্ঞেশ্বর-বাবুর হস্তে ন্যস্ত হয়। এই সময় তিনি কাশীমবাজারের দানবীর মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্রের সংসারে 'পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস' রচনা-ব্যপদেশে প্রতিপালিত হইতে-ছিলেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক এবং বর্ত্তমান মহারাজার বাংলাও সংস্কৃত ভাষার গৃহশিক্ষক ছিলেন। বহরমপুর সাহিত্য-সভার সহ-সম্পাদকের কাজও তিনি করিতেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি প্রথমদিকে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু পরে তিনি স্বীয়মত পরিবর্ত্তিত করেন এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি আস্থাবান হইয়াছিলেন।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-ধারার মধ্যে প্রভেদ আছে। যজ্ঞেশ্বরবাবু উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ধারাকে আদর্শ বলিয়া মানিয়াছিলেন এবং বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত ভাষার প্রতি একান্ত আস্থাবান ছিলেন।

তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। কলেজে অধ্যাপনা কালে তাঁহার হাস্য-রহস্যের সহিত ছাত্রবৃন্দের পরিচয় ছিল। তাঁহার শিক্ষাদানের পদ্ধতি মধুর ছিল, তাঁহার অধ্যাপনা-কালে ছাত্রবৃন্দ বিমল আনন্দ সহযোগে হাস্যপরিহাসের মধ্যে শিক্ষালাভ করিত। যে কালে পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপনা করিতেন, সে কালের ছাত্র-সাধারণ বঙ্গভাষা শিক্ষা-বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন ছিল। যাহাদের বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবার প্রকৃত অভিলাষ ছিল, তাহারাই তৎকালে বাংলার অধ্যাপনা-কালে উপস্থিত থাকিত। শেষ বয়সে অক্ষমতা নিবন্ধন কলেজের অধ্যাপনা কার্য্য হইতে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। এই সময় তাঁহার আর্থিক অবস্থাও অস্বচ্ছল হইয়া পড়ে।

পণ্ডিত মহাশয় প্রথমা পত্নী বিয়োগের পর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী অদ্যাপি জীবিতা আছেন এবং বর্দ্ধমান জেলার বেলেডাঙ্গা গ্রামে বসবাস করেন। তাঁহার পুত্রকন্যাদি ছিল না। দ্বিতীয় পক্ষের সাধ্বী স্ত্রীর ঐকান্তিক সেবা ও যত্নে তাঁহার শেষ জীবনের দুঃখ কষ্টের লাঘব হইয়াছিল। মানসিক দুশ্চিন্তা এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতা শেষ জীবনে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করে, তজ্জন্য তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটিয়াছিল। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, সাহিত্য-সেবীর আশ্রয়স্থল বঙ্গ-বিক্রমাদিত্য মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের সাহায্যলাভে তিনি বঞ্চিত হন নাই এবং মহারাজের মাসিক বৃত্তির সাহায্যে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরের সাহিত্যিক জীবনেও যেমন মহারাজা সাহায্যদানে অকুণ্ঠ ছিলেন, শেষজীবনেও অক্ষম সাহিত্যসেবীর তেমনই আশ্রয়স্থল ছিলেন। সুদিনে দুর্দ্দিনে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন এবং মৃত্যুকালাবধি তাঁহাকে মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৩৩২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে বেলা ১০ ঘটিকার সময় তদীয় কাশীমবাজারস্থ বাটীতে বঙ্গ-মাতার সুসন্তান বঙ্গের এই খ্যাতনামা প্রবীণ ঐতিহাসিকের মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর সহিত বঙ্গ-সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইয়া যায়।

বঙ্গদেশে সাহিত্যসেবীর ভাগ্যে যশ ও অর্থ লাভ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। সাহিত্যিক মাত্রেই দীনদশায় কালাতিপাত করিতে বাধ্য হন। এই দেশে সাহিত্য সেবার পুরস্কার মিলে না। বিশেষ করিয়া যে সকল সাহিত্য-রথী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানার্থ আমরণ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের নাম পর্য্যন্ত সাহিত্য সমাজে অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত রহিয়া গেল। জাতীয় সাহিত্যের জন্য যাঁহারা আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি চির-স্থায়ী করিয়া রাখিতে জাতির কর্ত্তব্য আছে, এই বিষয়ে বঙ্গবাসী মাত্রেরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যজ্ঞেশ্বরবাবুর দান, বঙ্গসাহিত্যে অসামান্য ও অতুলনীয়; কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়-দিগের জন্য তাঁহার নামটিও যাহাতে সাহিত্য-সমাজে চিরস্থায়ী থাকে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা আমাদের উচিত।

মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(৩)

* *

ব্রতীদের মহলে তেমনি উৎসবের ভিড়: কিন্তু ব্রততীর লাল পেয়ালায় জমে মাকালের তলানি। ওর ভাল লাগে না; এবং বেলও ভাল লাগে না আর ওই দুর্ব্বিসহ আনন্দের দোল-খাওয়া রাংতার পুতুলগুলোকে। ওদের সরু সুতো আলোর রঙে মিশে আত্মগোপন করে মানুষের দৃষ্টি থেকে, তাই মনে হয় ওরা জীবন্ত। মনে হয়, ওদের যাওয়া-আসার সবুজ পথে ছড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়ার ঝরা পাঁপড়ি। ওদের হাসিকান্নার মহলা-দুরন্ত রূপ লোলুপ ক'রে তোলে দূর পথের যাত্রীকে। কিন্তু ওর চোখে কখন আপনা-আপনি ধরা দিয়েছে ওরা।—ব্রততী ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে; সইতে পারে না ওই প্রাণহীন জড়পিণ্ডদের চেতনাহীন উল্লাস। মনটা দ্রুতপদে পিছিয়ে আসে; তর্‌তর্‌ ক'রে নেমে পড়ে ওদের সেই বসন্ত উৎসবের আসর থেকে একেবারে দীনুদের কদর্য্য বস্তির একটা অন্ধকার ঘরে। ওর চোখের সাম্‌নে নিমেষে ভেসে ওঠে সেই অন্ধ ছেলেটা; হয়ত কাঁদ্‌ছে সে, চোখের যন্ত্রণায় এখনও হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদে একলাটি প'ড়ে।—দীনু সেদিন ছেলেটার কথা বল্‌তে কান্নায় দিশেহারা হ'য়ে উঠেছিল।

পেটের জ্বালায় মানুষ মানুষকে অন্ধ তৈরি করে! ভাব্‌তে গিয়ে সত্যি ব্রততী শিউরে ওঠে আতঙ্কে। ওর সারা গা রোমাঞ্চিত হ'য়ে আসে। মানুষকে বিশ্বাস করতেও ওর এখন ভয় হয়, ঠিক ভয় না হ'লেও সন্দেহ হয় আগেকার চেয়ে অনেক বেশী।

ও ছিল ভোরের পাখীর মত মুখর। ওর প্রভাতী গানে ক্ষণে ক্ষণে সজীব হ'য়ে উঠেছে স্যার সি, কে'র জীবনের পরিস্থিতি: ঐশ্বর্য্যের পরিবেশে সমুজ্জ্বল ওর স্বতন্ত্র জগৎ—যেখানে চেনা-অচেনার সমারোহে ওর জীবন সূর্য্যমুখীর মত একটি একটি ক'রে বিকশিত করেছে সোনালি শতদল। স্যার সি, কে এখন আর চেষ্টা ক'রেও ফিরিয়ে আন্‌তে পারেন না ব্রততীর সেই দিগন্তপ্রসারী সজীবতা।

কথা বল্‌তে বল্‌তেও যেন ও কেমন উন্মনা হ'য়ে পড়ে। ওর অভ্যস্ত সুরটুকু এমনভাবে হারিয়ে যায় কথার মাঝখানে যে, নতুন বান্ধবী শিপ্রাও বিস্মিত দৃষ্টিতে মুখপানে চেয়ে বলে—"তোমার কি ইনার্‌সিয়া এসেছে তাতু?"

ব্রততী সজাগ হ'য়ে ওঠে; একটু না হেসে পারে না।—"ইনার্‌সিয়া ঠিক নয়, রিভ্যুলেট্‌, বরং বল্‌তে পারো—ফিলিয়া।"

শিপ্রা হেসে ওঠে।—"ফিলিয়া?"

"হাঁ।"—ব্রততী আবার তেমনি একটু হাসে। হাসিটা যেন কেমন নিষ্প্রাণ; বিকাশ আছে, অথচ রূপ নেই।

"অটো-ফিলিয়া বুঝি? নইলে, তোমার ভালবাসা লাভ করবার মত ভাগ্যবান কেউ আছে ব'লে ত মনে হয় না। শুধু নেই কেন, অনাগত ভবিষ্যতেও হয় ত থাক্‌বে না কেউ।—অবশ্য এটা আমার অনুমান।"

ব্রততী একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিপ্রার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে—"হোক না অনুমান; তবুও সত্যি। যে সত্যিকারের সাপুড়ে, সে ঢোঁড়া সাপ নিয়ে খেলা ক'রে আনন্দ পায় না কখনো। আনন্দ কেন, প্রবৃত্তিই হয় ত আসে না তার। একটা জাতসাপের খোলস দেখ্‌লে যে কৌতূহল তার মনে জেগে ওঠে, একশোটা হেলে সাপের বাচ্চা দেখেও সে কৌতূহল জাগে না কোন দিন।"

"খোলসের সন্ধান কি পেয়েছ তাতু? আনাচে-কানাচে খুঁজে দেখবার অন্তত কোন ইঙ্গিত?"

"পাই নি। তবে খুঁজবার নেশাটা যেন রাতারাতি কেমন পেয়ে বসেছে শিপু। ফিলিয়া যদি কিছু এসে থাকে, সেটাকে 'লাম্‌বার' বলা চলে। খুঁজ্‌তেই আমি চাই, তোমাদের এই গণ্ডীর বাইরে আমি খুঁজে নি-

চাই পৃথিবীর ওই অপরিচ্ছন্ন জনস্রোতের ভিতর থেকে সত্যিকারের মানুষ, য়্যান আন্‌কাট্ ডায়মণ্ড।"

"কি লাভ? নতুন ক'রে পালিস দুরস্ত করবার ঝঞ্ঝাট স'য়ে শেষ পর্য্যন্ত ইম্‌গ্যাচিওর হীরেও তো বেরুতে পারে। তার চেয়ে বরং যাচাই-করা জুয়েল ঢের ভাল।"—শিপ্রার দৃষ্টি কুটিল হ'য়ে ওঠে।

ব্রততী তেমনি হেসে জবাব দেয়—"ব্যানার্‌জিকে তো দিয়েছি ট্রায়েল।"

"ট্রায়েল!"

"তা ছাড়া আর কি? আমি জানি, সে টিঁক্‌বে না শেষ অবধি। তবুও মান রক্ষে করব বাবার। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বন্ধুপুত্রের হাতে অগাধ ঐশ্বর্য্য তুলে দেবার মিডিয়াম করবেন আমাকে। মিডিয়াম দিয়ে প্রেতাত্মাকে প্ল্যান্‌চেট্ করা চলে, কিন্তু মানুষ বা দেবতাকে করা চলে না, এটা ত ঠিক।"

"কিন্তু তুমিই ত নিজে য়্যাক্‌সেপ্ট ক'রেছ তাঁর প্রোপোসাল।"

"করলুমই বা! প্রোপোসাল্ য়্যাক্‌সেপ্ট করা মানেই ত নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করা নয়। হাতের কাছ থেকে যখন মানুষ স'রে যায় দূরে, তখন তার ফসিল্-টাই হ'য়ে ওঠে পূজোর আধার। কিন্তু সেই ফসিল নিয়ে যে জীবন গ'ড়ে তোলা চলে না, সে কথা তুমিও জানো, আমিও জানি।"

শিপ্রা বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞেস করে—"ওঁদের তুমি ফসিল্ ব'ল?"

"তা ছাড়া আর কি বলা চলে? আছে ত শুধু অবয়বটা। ভিতরের মানুষ যে কতকাল আগে মিলিয়ে গেছে, ওই ফসিলেরাও হয় ত রাখে না তার খবর। যাক, ওকথা রেখে দাও, একটা মেয়েলি-পুরুষের লাগাম ধ'রে যে আনন্দ, তার চেয়ে পুরণো একখানা ভাঙা বেবি অষ্টিন্ ড্রাইভ করার আনন্দ ঢের বেশী। অন্তত ম্যাল্-য়্যাড্‌জাস্টমেণ্ট-এর ভয় থাকে না।"—ব্রততী হেসে ওঠে।

"সাবাস্ তাতু! এবার সত্যি হাসালে তুমি। মেয়েলি-পুরুষের চেয়ে ভাঙা বেবি অষ্টিনও ভাল, একথা অন্য দেশের মেয়েরা বল্‌তে পারে, কিন্তু—"

—"কিন্তু নেই, দরকার হ'লে এ দেশের মেয়েরাও পারে। তবে, পুরুষের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া যাঁরা জীবনের দ্বিতীয় কোন পরিণতি ভাব্‌তে পারেন না, তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। ক্লিন্ শেভ্‌ড্ ছোটখাট একটি মোলায়েম পুরুষ যখন ঠাণ্ডা গলায় দুটো গজল গেয়ে, বাঁ হাতের চেটোটা উল্‌টে দিয়ে মেয়েলি ঢঙে ভাবের একটু আমেজ দেবার চেষ্টা করে, তখন তাকে দেখে আত্মসমর্পণ করবার প্রবৃত্তি কোন মেয়ের জাগে কি-না জানি না। যেটুক্ অনুভূতি মনে জাগে, সেটা অন্তত আমার মতে মমতা। তাতে ক'রে বড় জোর নিজের হাতে তৈরি দুখানা মাছের কচুরি, না-হয় থিন্ এরোরুট বিস্কিটে মাখানো একটু জ্যাম বা পেয়ারার জেলি সযত্নে হাতে তুলে দেবার বৃত্তিটা জেগে ওঠাই বোধ হয় মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক।"—ব্রততী আবার হাসে।

—"ব্যানার্‌জিকে তুমি নিশ্চয়ই পার না সেই ক্যাটাগোরিতে ফেল্‌তে।"

—"পারি না ব'লেই ত ডেমি-য়্যাপ্রুভাল-এ কন্‌ডিসেণ্ড করেছি।"

—"কন্‌ডিসেণ্ড?"

—"হাঁ। বাইরের চাহিদা আমার কম শিপ্রা, তাই বাইরেটা দেখে আমি পারি না ষোল আনা অনুমোদন করতে। আমি খুঁজি মানুষ। মানুষকে আমার বড্ড ভাল লাগে শিপারিন্। মানুষ, অন্তত, পুরুষ হবে বজ্রের মত তীব্র। স্নিগ্ধ, কালো মেঘের অন্তরালে বাষ্প-সজল পরিবেশ তার পুরুষত্বকে ভিজিয়ে দিতে পারে না। যে পুরুষ, সে জীর্ণ অনশনক্লিষ্ট হ'লেও তার পুরুষত্ব বেঁচে থাকে ইলেক্‌ট্রিক চাবুকের মত। তেলচিটে ধরা লইন্ ক্লথ-এর পার্সনালিটি তার চাপা পড়ে না কোন দিন।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে ব্রততী আবার কেমন উন্মনা হ'য়ে যায়।

শিপ্রা আপনমনেই বলে—"ওটা তোমার পারভার্সন তাতু, তুমি বোধ হয় নিজেই জানো না, কি চাও!"

"তা হবে।"

"হবে নয়, তা-ই।" শিপ্রা উৎসুক দৃষ্টিতে ব্রততীর মুখপানে চায়।

ব্রততী কি ভেবে নিয়ে বলে—"নিজের কথা অতখানি ভাববার অবসর আমি পাই না শিপ্রা। আমার ভাল লাগে না; নিজেকেও যেন ভাল লগে না আর। হয় ত ভাববে ইনার্‌সিয়া কিংবা কম্‌প্লেক্স, কিন্তু তা নয় মোটেই।

ঐশ্বর্য্য আমার সত্যি ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, পৃথিবীর অসংখ্য লোককে বঞ্চিত ক'রে আমরা কেড়ে নিয়েছি তাদের সুখের গ্রাস। তাদেরই সেই কেড়ে নেওয়া অন্নের এককণা ফিরিয়ে নেবার জন্যে তারা হাত পেতে কাঁদে আমাদের দরজায় দরজায়। সেই কান্নার সুর জোগাতে মানুষ মানুষকে তৈরি করে অন্ধ। দুগ্ধপোষ্য শিশুর চোখ উপড়ে দেয় লোহার কাঁটা দিয়ে—"

শিপ্রার চোখ দুটো আরও প্রখর হ'য়ে ওঠে। সে বোঝে না, ব্রততীর কথার একবিন্দুও প্রবেশ করে না তার মগজে। কিন্তু এটুকু অক্লেশে অনুমান করে যে, তাতুর জীবনে কোথায় যেন সুরু হয়েছে একটা বিপ্লব। তার প্রচণ্ড আঘাতে ওর সতেজ অনুভূতিগুলো থেকে থেকে জ্বলে উঠ্‌ছে। ওর বসন্তের শেষে শাখায় শাখায় লেগেছে দৈবাৎ শীতের ছোঁয়া। ওদের কথা শেষ না হ'তেই বেয়ারা এসে খবর দিল যে, বাইরের ঘরে এসেছে দীনু।

"দীনু?"—শিপ্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়।

ব্রততী একটু থেমে বলে—"ভিখিরী বল্‌লে অপমান করা হয়, একটি বাউল।"

"বাউল! ভাল গাইতে পারে বুঝি?"—শিপ্রা যেন কিছু অনুমান করবার চেষ্টা করে!

"বাউল আখ্যার সঙ্গে ভাল গাইতে পারার কি কোন অচ্ছেদ্য অভিধান আছে শিপার?"

"না। ওটা আমার ইন্‌ফারেন্স, ওই ধরণের কোন একটা বিশেষ গুণ না থাক্‌লে মিস্ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কাজেই ইন্‌ফারেন্স-এর ডেটা-ও আছে।"—শিপ্রা হাসে। শুধু কথাটুকু বলার আত্মপ্রসাদ ছাড়া হয়ত অন্য কিছু ছিল না তার সেই হাসিতে।

তবুও ব্রততী বলে—"হাসলে যে? ওরা কাঙাল; পথ-ভিখিরী না হ'লেও—ভিখিরী। কিন্তু ওই দীনুকে দেখ্‌লে আজও স্পষ্ট মনে হয় শিপ্রা, ভিখিরী হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না বলেই বোধ হয় ও হয়েছে ভিখিরী। নইলে—"

"নইলে হ'ত বাংলা দেশের একজন লিডার, কিম্বা ওই রকম একটা বড় কিছু?"—শিপ্রার কথায় কেমন একটু শ্লেষ; ঠিক প্রচ্ছন্ন না হ'লেও প্রকট নয়।

ব্রততী ঈষৎ তপ্ত সুরে বলে—"লিডার না হ'লেও ভিখিরী হ'ত না সে। নিজের দারিদ্র্যকে নিয়ে ও এতটুকুও বিব্রত নয়; বরং অদ্ভুত তার অহঙ্কার। ওর দারিদ্র্যের অহঙ্কার তোমার আমার যৌবনের অহঙ্কারকেও ছাপিয়ে যায় শিপারিন্। ওর সেই অহঙ্কারের প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের এই ঐশ্বর্য্যের দেমাক্ হাজার বাতির স্যাণ্ডেলিয়ারের মত ঝন্‌ঝন্ ক'রে ভেঙে পড়ে।"

"আশ্চর্য্য!"

"মোটেই নয়। নিতান্ত অদৃষ্টের বিপাকে কাঙালের ঘরে তার জন্ম, তাই ব'লে নিজে সে নয় একটি পয়সারও কাঙাল। এমন কি, ওকে দেখে অবধি শুধু এই কথাটাই আমার মনে হ'য়েছে যে, কাঙাল হওয়া ওর জীবনে হয়ত অপরিহার্য্য একটা অভিশাপ। তাই ঐশ্বর্য্যের বিরুদ্ধে জীবন্ত রেবেল্ হ'য়ে দেখা দিয়েছে ও।"

"ঐশ্বর্য্যের বিরুদ্ধে সে রিবেলিয়ন করুক তাতু, তার ভয় করি না। কিন্তু তোমার জীবনেও যেন দীনু বিদ্রোহের সূচনা করেছে ব'লে মনে হয়।" উত্তরের আশায় শিপ্রা সকৌতুক দৃষ্টিতে ব্রততীর মুখপানে চায়।

ব্রততী বেশ শান্তভাবেই বলে—"বিদ্রোহের সূচনা করুক আর না করুক, অন্তত একটা নতুন জগতের সঙ্গে যে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ওই দীনু, সেটা অস্বীকার করব না কোন দিনই।"

শিপ্রা হেসে জবাব দেয়—"আমরাও বল্‌ব না কোন দিন অস্বীকার করতে। বরং মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখ্‌ব চেয়ে: তুমি হবে তোমার সেই নতুন জগতের ফ্লোরেন্স নাইটিংগেইল, আর দীনু—"

কথা বল্‌তে বল্‌তে ওরা দুজনেই নেমে এলো নীচে। দীনু তখনও দাঁড়িয়ে বাইরের ঘরের দরজার সাম্‌নে।

এবার দীনু অনেক দিন পর এসেছে, চেহারাটা ওর বদ্‌লে গেছে। মাথার লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল আর একমুখ দাড়ির আওতায় মুখখানা যেন হ'য়ে গেছে এতটুকু। চোখ দুটো আগুনের মত প্রখর হ'য়ে উঠেছে; হেঁট মুখে মাটির দিকে চেয়ে থাক্‌লেও ওর দৃষ্টি চাপা থাকে না, ভ্রূর ফাঁক দিয়ে ছাপিয়ে ওঠে সেই আগুনের শিখা।

"দীনু!" ব্রততী থম্‌কে দাঁড়ায়।

শিপ্রা অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে। এরা সত্যি যেন আর এক জগতের মানুষ। ওদের সর্ব্বাঙ্গে অতীত মানুষের

ছাপ : তারই ভাঁজে ভাঁজে পড়েছে বর্ত্তমানের ভাঙা-গড়ার দাগ।

শিপ্রা ব্রততীর চেয়েও আধুনিক, ও শাড়ি পরে না। দামী পাড়-বসান পেটি-কোটের ওপর জড়িয়ে নেয় পাঁচ হাত একখানা ভিনিসিয়ান ওড়না; শিঙ্গল্ করা বেণী দুলিয়ে দেয় চিবুকের পাশ দিয়ে। ওর ফিরোজা রঙের ব্লাউস ভেদ ক'রে দেখা দেয় স্কিন্-কলারের কর্সেট। হাতে ছোট্ট একটি জাপানী ছাতা, অন্য হাতে লিজার্ড-চামড়ায় ওরিয়েণ্টাল ছবি এম্বস্-করা একটি নতুন ডিজাইনের ভ্যানিটি ব্যাগ। হাসির সঙ্গে ওর হিল-তোলা জুতোর এমন একটা সঙ্গৎ বাঁধা যে, হাস্য-কৌতুকের প্রত্যেক ভঙ্গীমায় হিলের শব্দটা ঠিক সমানে তাল দিয়ে যায়।

সযত্ন রচিত পরিচ্ছদটার সম্পর্কে ও যেন ইচ্ছে ক'রেই উদাসীন হ'য়ে থাকে। হয়ত নিজেই জানে না শিপ্রা, এ বেলা ওর ওড়নার কি রঙ।—কিন্তু দীনুর দিকে চেয়ে ও যেন আজ আপনা-আপনি উঠ্‌ল সজাগ হ'য়ে। শিপ্রা সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে; ওর পরিচ্ছদ নিতান্ত অকারণ ওকে বিব্রত ক'রে তোলে দীনুর সাম্‌নে। এমন অস্বস্তি ও আর কোন দিনও অনুভব করে নি। মনে মনে শিপ্রা বার বার আবৃত্তি করে—পথ ভিখিরী না হ'লেও দীনু ভিখিরী; হ'লই বা ব্রততীর মতে একটা ডাইনামিক্ পার্সনালিটি। ভিখিরীর আবার পার্সনালিটি! একটা পয়সার জন্যে যারা রাস্তার লোকের পায়ে ধরে!

ব্রততী দীনুর সঙ্গে কথা পাড়বার আগেই শিপ্রা বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।—দীনু তেমনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে; ব্রততী কি বল্‌বার চেষ্টা করে, কিন্তু ভেবে উঠ্‌তে পারে না প্রথম আলাপের জিজ্ঞাস্যটা। দ্রুতপদে ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতেও শিপ্রা শঙ্কিত দৃষ্টিতে ফিরে ফিরে চায়; মনে হয়, দীনুর ওই ক্ষুধিত দৃষ্টিতে বুঝি হঠাৎ দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌বে ওর স্কার্ট—ওর ভিনিসিয়ান ওড়নার হাল্‌কা আঁচল!

ওদের সম্পর্কে নতুন ক'রে কোন কথা জান্‌বার না থাক্‌লেও ব্রততীর ইচ্ছে হয়—জিজ্ঞেস করে একবার সেই অন্ধ ছেলেটির কথা। কিন্তু সাহস হয় না, পাছে দীনু সেদিনের মত আবার যায় বিগ্‌ড়ে। ছেলেটার কথা বল্‌তে বল্‌তে সেদিন যেন দীনুর চোয়ালের হাড় দুখানা লোহার এঙ্গেলের মত শক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল; মনে হ'চ্ছিল—ওর দাঁতে দাঁতে আঘাত লেগে চক্‌মকির মত ফিন্‌কি ছুট্‌বে।

ব্রততী জোর ক'রে গছিয়ে দিল একটি টাকা। টাকা দীনু চায় না; এমন কি, একটা পয়সারও আর দরকার হয় না ওর। ব্রততীর অনুরোধ ও না মেনে পারে না, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাকাটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে।

ব্রততী হেসে বলে—"আর ত গান গাও না তুমি। এদিকে আসাও কমিয়ে দিয়েছ। তাই দিলুম, যে ক'দিন বাদ গেছে, মনে কর সেই ক'দিনের পয়সা একসঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ আজ।"

—"আমি না এলেও আর পাঁচজন ত এসেছে। পাওনা হিসেবে তাদের আর আমার পাওনায় তফাৎ নেই কিছু। ভিখিরীকে দেবার পয়সা, একজনকে দিলেই আর-একজনের পাওনা শোধ হয়। তবে—" কথা বল্‌তে গিয়ে দীনু হঠাৎ কি ভেবে থেমে যায়।

ওর মুখপানে চেয়ে ব্রততী বুঝ্‌তে পারে। একটুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করে—"থাম্‌লে যে?"

"বল্‌ছিলাম কি"—দীনু ইতস্তত করে।

"বল।"

"আপনি ইচ্ছে করলে অনায়াসেই হয়; সবারই পাওনা রোজ রোজ খয়রাৎ না ক'রে যদি একসঙ্গে একদিন শোধ করেন ওদের ঋণ, অম্‌নি ভিখিরী অনেকে আশ্রয় পায় সারাটা জীবন।"—দীনু যেন অতি কষ্টে কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেল্‌ল।

ব্রততী ওর কথাটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারে নি। ঈষৎ বিস্ময়াবিষ্টের মত চুপ ক'রে থেকে পুনরায় জিজ্ঞেস্ করবার উপক্রম করতেই হঠাৎ ফিরে এলো শিপ্রা।

এবার আর দীনু নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল না। শিপ্রা ওদের কাছে এগিয়ে আস্‌বার আগেই দীনু ব'লে উঠ্‌ল—"যারা অক্ষম, তারা ভিখ্ মেগে মেগে রাস্তায় গড়িয়ে বেড়ায় আশ্রয় নেই ব'লে। আর আমার মত যে সব ভিখিরী লোকের দরজায় হাত পাতে, তারা বেকার। খাটতে চাইলেও কেউ খাটায় না তাদের। এত বড় দেশে ওই অসহায় কাণা-খোঁড়াগুলোর মাথা গুঁজ্‌বার একটু ঠাঁই নেই!"

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দীনু দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। ব্রততী স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর পথপানে।

শিপ্রা ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে তাতুর পাশে।—"আবার ফিরে আস্‌তে হ'ল ব্রতী!"

—"এসো।"—দীনুর কথাগুলো রিম্‌ঝিম্ করে ব্রততীর মনের ভিতর; এত বড় দেশে ওদের একটু মাথা গুঁজ্‌বার ঠাঁই নেই! একটা অনভ্যস্ত অনুভূতিতে মনটা ওর সজল হ'য়ে ওঠে বারবার।

"একজাক্টলী হোয়াট্ ইউ সেইড্ তাতু!"—একটু থেমে শিপ্রা আবার বলে—"লোকটা অদ্ভুত।"

"হুঁ।"—ব্রততী আর কোন উত্তর দেয় না।

ওরা দুজনেই যাচ্ছিল ব্রততীর পড়ার ঘরের দিকে; হঠাৎ গেটের ভিতর মোটরের হর্ন শুনে থম্‌কে দাঁড়াল।

একটু পিছিয়ে ফিরে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই দ্রুতপদে সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন ডাক্তার অধিকারী।—"গুড্ডে, মিসেস্!"

ব্রততী অভ্যর্থনা জানাবার আগেই ডাঃ অধিকারী ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ব'লে উঠ্‌লেন—"কে বেরিয়ে গেল বলুন ত, এক্ষুণি— এই মাত্র? ছেঁড়া-ময়লা কাপড়-পরা, লাইক্ এ বেগার?"

অধিকারীর মুখচোখের দিকে চেয়ে ব্রততী হঠাৎ থতমত খেয়ে বলে—"ভিখিরী, একজন বাউল। আগে গান গাইত; এখন এম্‌নি ঘুরে বেড়ায়।"

—"আই ডোণ্ট বিলীভ্। হি ইজ্ সেন—নিশ্চয়ই মিঃ সেন।"—ডাক্তার অধিকারী চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন। কথা বল্‌তে তাঁর কণ্ঠস্বর যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে।—"মোটরটা থামাবার আগেই ও তাড়াতাড়ি সরে' পড়েছে। আই রিকগ্‌নাইস্‌ড্ হিম রাইট। হ'তে পারে না—কিছুতেই হ'তে পারে না আমার ভুল। গাড়ীটা থামিয়ে যখন চারিদিকে চাইলুম, ও তখন পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়েছে কোন একটা গলিতে কিম্বা আর কোথাও।"

অধিকারীর কথা শুনে ওরা দুজনেই হতভম্ব হ'য়ে যায়; ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারে না ওর বক্তব্যের আগাগোড়া। ব্রততী বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠ্‌বার পূর্ব্বেই শিপ্রা সকৌতূহলে জিজ্ঞেস করে—"হোম্ ইউ মীন্ ডক্টর অধিকারী?"

"আই মীন্ সেন—সত্যেন সেন, যিনি আপনাদের চেরি ক্লাবের ছিলেন সেক্রেটারী, সবুজ সঙ্ঘের ফাউণ্ডার-প্রেসিডেণ্ট।"

ব্রততী চম্‌কে ওঠে—"সত্যেন সেন!"

"এক্‌জাক্টলী।" এই মাত্র বেরিয়ে গেল এ বাড়ী থেকে। মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, পরনে ছেঁড়া নেকড়া, মুখে দাড়ি! —এ কার্স্‌ড্ সোল, য়্যান্ আন্‌ফরচ্যুনেট্ এঞ্জেল!"

"এঞ্জেল্!"—শিপ্রা কপালটা কুঁচ্‌কিয়ে বলে—"চোখে না দেখ্‌লেও শুনেছি সব ডক্টর ক্যারী, তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল। হি ডিফাল্‌কেটেড্ ব্যাঙ্ক মানি; য়্যাণ্ড ইজ্ নাউ রীপিং দি কন্‌সিকোয়েন্স। সেই ফলই তা হ'লে ভোগ করছেন এখনো। সেদিনও সুরেখাদি বলছিল—"

"সুরেখাদি?"—ডাক্তার অধিকারী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন শিপ্রার মুখপানে।

"হাঁ, সুরেখা খাণ্ডেলওয়াল।"

"খাণ্ডেলওয়াল! য়্যাট্ মিস্ মজুমদার?—এ সাক্‌রি-লিজাস ভারলেট্।"

ডাক্তার অধিকারী আবার এগিয়ে চল্‌লেন গেটের দিকে। ব্রততী ও শিপ্রা কতকটা মন্ত্রমুগ্ধের মত চল্‌ল তাঁর পিছু পিছু। ব্রততী যেন কেমন নন্‌প্লাস্‌ড্ হ'য়ে গেছে।

চল্‌তে চল্‌তে ডাক্তার অধিকারী আপন মনেই বলেন—"হি হ্যাজ্ বীন্ ডিউপড্ অল্ থ। রিয়েলী এ গ্রেট্ সোল্। বাঙালীর ছেলের অতবড় হৃদয় আমি দেখিনি আর। আমার সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা তার কোন দিনই ছিল না। তবু, বিলেত যাবার সময় এক কথায় সে আমার সাহায্য করেছে থ্রি থাউজেণ্ড রূপিজ। তখন সে ব্যাঙ্কের চাকরি নেয় নি।"—চাপা দীর্ঘশ্বাসে অধিকারীর ঠোঁট দুখানা কেঁপে ওঠে।

ব্রততী একটু থেমে জিজ্ঞেস করে—"অবস্থা ওঁর ভাল ছিল বুঝি?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি যখন ফিরলুম ইংল্যাণ্ড থেকে, তখন ও রিক্ত; শুন্‌লুম, জেল থেকে বেরিয়ে ও অন্তর্ধান করেছে কোথায়। কেউ কেউ বলেছিল—হয়ত নেই। তার সম্ভাবনাই ছিল বেশী। অতবড় ট্র্যাজেডি মানুষ সইতে পারে না।"

গেট ছাড়িয়ে ওরা এলো রাস্তায়। কিন্তু কোথায় দীনু! ওই মহানগরীর জনস্রোতে ও তখন কোথায় মিলিয়ে

গেছে। ডাক্তার অধিকারী হঠাৎ ব্রততীর দিকে মুখ ফিরাতেই দেখ্‌লেন, তার মুখখানা কেমন শক্ত হ'য়ে গেছে; একবিন্দু রক্তও যেন নেই ওর চোখে।

*　　*　　*　　*

দুপুরটা যেন কাট্‌তে চায় না। নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে দীনু ধীরে ধীরে এসে বসল পার্কের একখানা বেঞ্চে। ওর অতীতের রুদ্ধ দ্বারে আজ অকস্মাৎ যে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে, তার জেরটা ও কোন রকমেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না। মণি অধিকারীর মোটরখানা যখন দুঃস্বপ্নের মত এসে পড়ল দীনুর চোখের সাম্‌নে, তখন নিমেষে ওর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আড়ষ্ট হ'য়ে গেল বিমূঢ়তায়।—মণি ফিরেছে বিলেত থেকে ডাক্তার হ'য়ে!—নতুন একখানা হিলম্যান কিনেছে; নিজেই ড্রাইভ্ করে!

প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে দূরে ঠেলে নিয়ে ও করেছে মণির দৃষ্টিপথ থেকে আত্মগোপন। কিন্তু সেই আকস্মিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়াটা এখনও অবসাদের মত জমে আছে দীনুর প্রত্যেকটি তন্ত্রীতে। মণি অধিকারী থেকে আরম্ভ ক'রে ওর অতীত পথের প্রত্যেকটি মাইল-ষ্টোন, এমন কি, দৈনন্দিন খুঁটিনাটির অগভীর রেখাগুলি পর্য্যন্ত যেন পলকে পিল পিল করে উঠ্‌ল মগজের ভিতর।—মণি, তড়িৎ, তপন, সুরেখা, মঞ্জরী, টেম্পল্, চাংওয়াহ্, ডমিনিয়ন, এম্পায়ার, গার্ষ্টিন প্লেস্,—গ্রে-ক্রেহাম্, ক্যামেরন!—কপালের শিরা দুটো টিপে ধরে দীনু একবার মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহটা দেখে নেয়।

পার্কে লোক নেই ব'ল্‌লেই চলে। ক্বচিৎ দু-একজন যায়-আসে; কেউ বা এদিকের ফটক দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে যায় ও-পাশের চরখি গেটের পাশ দিয়ে, হয়ত চলার পথে বাইরের রাস্তাটা সংক্ষেপ করে। কোণে গাছতলার বেঞ্চখানা দখল ক'রে ঘুমচ্ছে একজন হিন্দুস্থানী: কোন আপিসের দারোয়ান কিম্বা বেয়ারা, চিঠি জারি ক'রতে বেরিয়ে পথের পরিশ্রমটা একটু লাঘব ক'রে নিচ্ছে।

দীনু পা-দুটো গুটিয়ে একটু আরাম ক'রে বস্‌বার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। এতখানি পথ উর্দ্ধশ্বাসে হেঁটে এসে পায়ের গ্রন্থিগুলো যেন কেমন জড় হ'য়ে গেছে। বাসায় ফির্‌তে পারলে একটু শুয়ে পড়ত সেই ছেঁড়া মাদুর-খানায়। কিন্তু তাও আর ইচ্ছে করে না। দিনরাত সেই বস্তির অন্ধকার ঘরে ব'সে থেকে, বাইরের আলো দেখে চোখ দুটো ওর টাটিয়ে ওঠে। পারে না ও ওই দুর্ব্বিসহ জীবনের নির্ম্মম একঘেয়েমি সইতে।—অতসী ফেরেনি এখনও; বাসায় আছে হয়ত দু-একটা নুলো ভিখিরী, আর গন্নাকাটি পদ্ম!

অবসাদে মাথাটা আস্তে আস্তে হেলে পড়ে বেঞ্চের হাতলে। দীনু আন্‌মনে ভাবে ওর বর্ত্তমানের প্রতিটি দিন: গত কাল, আজ আর আগামী কাল। জীবনের ক্যালেণ্ডারে দিনগুলো যেন ঠাসাঠাসি বোনা; কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। সাম্‌নের পথে অগণিত দিন পাশাপাশি রেল লাইনের মত একসঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়েছে কোন্ দূর দিক্‌চক্রে; পিছনের পথে জ্বল্‌ছে কতকগুলো লাল আলো, আর থম্‌থম্ করে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে চোখ দুটো কেমন ভারি হ'য়ে আসে।—ট্যাঁক থেকে টাকাটা বের ক'রে দীনু একবার হাতের মুঠোয় চেপে ধরে; নিবিড়ভাবে অনুভব করে সেই প্রাণহীন ধাতুখণ্ডের স্পর্শ। টাকাটা পেয়ে অবধি কেমন একটা অস্বস্তি ওকে মাঝে মাঝে পীড়িত ক'রে তোলে। এক বার, দু বার, তিন বার,—এমনি কত বার টাকাটা ট্যাঁক থেকে বের করে আর নাড়াচাড়া ক'রে গুঁজে রাখে আবার ট্যাঁকে।

অমনি ক'রে বসে থাক্‌তে থাক্‌তেই কখন একটু ঘুম আসে চোখের পাতায়। ওর স্বস্তি আর অস্বস্তির এক সঙ্গে সমাধি হয় সুপ্তির ছোঁয়ায়।

—ওর ভাল লাগে না, তবুও তড়িৎ জোর ক'রে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যায়। তপনের গাড়ীখানা সে বাগিয়েছে আজ মস্ত একটা ধাপ্পা দিয়ে। ওর নাম শুনে তপন এতটুকুও আপত্তি করে নি।

তড়িতের পিছনে সুরেখা আর রেবা সোম। তড়িৎকে জবাব দেবার আগেই সুরেখা অভ্যস্ত-হাসির ফিন্‌কি ছড়িয়ে বলে—"আজ ইম্‌প্রিণ্টের শিওর টিপ্। যাবে না তুমি?"

"জেকিউট্, কিউপিড, ফ্লেয়ার! সঙ্গে যাবেন মিস্

মজুমদার আর রেবা। এমন শনিবারটা স্পয়েল্ করবে তুমি?"—তড়িৎ টানে ওর হাত ধ'রে।

ওরা উঠে বসে। তড়িৎ ড্রাইভ করে। তড়িৎ-এর পাশে বসে রেবা, আর পিছনে ওরা দু'জনে পাশাপাশি। ওর হাতখানা কোলের ওপর টেনে নিয়ে সুরেখা আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করে। সুরেখার কোলের ভিতরটা কি উষ্ণ! সে উত্তাপের স্পর্শ ওর প্রতিটি লোমকূপের অন্তর দিয়ে এসে পৌছয় হৃৎপিণ্ডে।

শহরের জনপ্রবাহ ছাড়িয়ে গাড়ী এসে পৌঁছয় ব্যারাক্‌পুরের প্রশস্ত পথে। এখন আর গাড়ীর গতি প্রতি চক্রাক্ষেপে ব্যাহত হয় না। শহরের চেয়ে গাড়ী ঘোড়ার ভিড় কম; পরিচ্ছন্ন সমতল পথ; এশ্‌ফল্টামের ঝক্‌ঝকে বুকে যেন গাড়ীর প্রতিবিম্ব চলমান ছায়ার মত কাঁপে!

"সেন!"—সুরেখা বড় বড় চোখ দুটো তুলে চায় ওর মুখপানে। এমনি পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে সে যেন পৃথিবীতে এই প্রথম চাইল। সদ্য ফোটা কুমুদ ফুলের মত চোখের পাতায় পাতায় জড়ানো সজল জড়িমা। ওর ইচ্ছে করে, আস্তে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে সুরেখার ওই সদ্যস্ফূর্ত্ত চোখের পাতাগুলো!

হাতখানা টেনে নেবার চেষ্টাও করে না; তন্দ্রালু অবসন্নতায় মাথাটা হেলিয়ে দেয় কুশানের ওপর। ওর চোখে নামে হাল্‌কা নেশার লঘু ঘুম।

—"মল্লিকা আর সেন রয় ফিরেছে বুধবার বিকেলে। ওদের এন্‌গেজমেণ্ট ভেস্তে গেছে মন-ভাঙাভাঙিতে।"

"মন-ভাঙাভাঙি?"

"হাঁ।"

"মল্লিকাকে বাদ দিয়ে শুধু ওর গানটুকু নিয়েই মানুষ বেঁচে থাক্‌তে পারে অনন্তকাল।"—চোখ দুটো মেলে একবার সত্যেন দেখে নেয় সাম্‌নের পথ আর আশ-পাশের নির্জ্জন বাগানগুলো।

সুরেখা ওর হাতখানা বুকের কাছে তুলে নিয়ে বলে—"কাল সাঁ-সুচি স্টেজে হবে মল্লিকার লীরিক্ ডান্স। নতুন স্টেজের উদ্বোধন করবেন কবিগুরু! পরশু হবে অভিনয়,—'তাসের দেশ'। যাবে না?—নিশ্চয়ই যাবে। মল্লিকা জানিয়েছে সাদর নিমন্ত্রণ!"

'যাবে; নিশ্চয়ই যাবে ও। ইম্‌প্রিণ্টকে টিপ দেবে উইন, আর বাকী তিনটের প্লেস্! জেকিউট, কিউপিড্ আর ফ্লেয়ার!'—চোখ দুটো আবার বন্ধ হ'য়ে আসে। তড়িৎ-এর মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে ভেসে আসে শ্যাম্পেনের ঈষৎ গন্ধ!

সত্যেন অনুভব করে, দু হাত দিয়ে অনুভব করে এক গোছা নোট, সেই সঙ্গে অনেকগুলো টাকা। ওর দুই পকেটে মুঠো মুঠো সিকি দু-আনি, আধুলি। বিরক্তিকর কতকগুলো রেজ্‌কির বোঝা!

ভিড় ঠেলে ভিতরে যাওয়া যায় না। তবুও যায় ওরা দু'জনে। সুরেখা আর রেবা ব'সে থাকে বাইরে, গাড়ীতে।

স্টার্ট দিয়েছে! ঘোড়াগুলো তীর বেগে এগিয়ে আসে ওদিকের কার্ভ ছাড়িয়ে। সকলের আগে বেরিয়ে আসে জেকিউট! তার পিছনে ফ্লেয়ার আর কিউপিড্ পাশাপাশি; আরও পিছনে ইম্‌প্রিণ্ট। ইম্‌প্রিণ্টের জকিটা যেন ইচ্ছে ক'রেই রাশ আল্‌গা দিচ্ছে না। কিউপিড্‌কে ছাড়িয়ে ফ্লেয়ার জেকিউটের সঙ্গ ধরেছে। জকিটা নাইস কন্‌ট্রোল্ করে!—কিন্তু ইম্‌প্রিণ্ট? জকিটার ওপর রাগে ওর আপাদ-মস্তক জ্বলে ওঠে। ইচ্ছে হয়, ছুঁড়ে মারে ওর ঘাড়ে একটা হাণ্টার।

ব্র্যাভো! বাক্ আপ্ ইম্‌প্রিণ্ট! এবার ছেড়েছে রাশ। ইম্‌প্রিণ্ট মেক আপ্ করে—চোখের নিমেষে মেক্ আপ করে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছাড়িয়ে গেল সবগুলোকে। ব্রিলিয়াণ্ট গেট! থ্রিলিং!

গেল! গেল! দর্শকরা আশঙ্কায় চীৎকার ক'রে ওঠে। —সেভ্‌ড্! গোল্ডকুইনের জকিটা খুব সেভ্‌ড্ হ'য়ে গেল আজ।—ইম্‌প্রিণ্ট! ইম্‌প্রিণ্ট! ইম্‌প্রিণ্ট উইন করে। দ্যাট্'স্ ইট্!—উল্লাসে সত্যেনের সর্ব্বাঙ্গ উতরোল হ'য়ে ওঠে। তড়িৎ ওর পিঠে হাত-থাব্‌ড়া দিয়ে বলে' ওঠে—"বাক্-আপ বন্ধু, বাক্-আপ!"

কোথা থেকে যেন সুরেখা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ওর গলাটা!—কখন্ ঢুকে পড়েছে সে ওর পিছু পিছু।

ওর সর্ব্বাঙ্গে লাগে সুরেখার স্পর্শ! এত নিবিড়,

এমনি একান্ত স্পর্শ ওর জীবনে এই প্রথম! ওর লালায়িত দেহ মন—

ঘুম ভেঙে যায়।

দীনু চম্‌কে ওঠে। পার্কে লোক চলাচল বেড়ে গেছে। সূর্য্যটা হেলে পড়েছে পশ্চিমের আকাশে। ওর মুখে এসে পড়ে অপরাহ্ণের রুক্ষ রৌদ্র।

মনটা কেমন গ্লানি আর অস্বস্তিতে ভ'রে যায়। হাতের তেলোটা ঘেমে উঠেছে।—ওর হাতের মুঠোয় তখনও রয়েছে সেই টাকাটা।

না, না; ও পারে না সইতে। কোন দিনও পারবে না আর। দীনু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গায়ের চামড়ায় কেমন একটা জ্বালা! মনে হয়, সর্ব্বাঙ্গে যেন কেউ জলবিছুটি মাখিয়ে দিয়েছে।

সাম্‌নের পুকুরে গাছের ছায়াগুলো কাঁপে। ছোট ছোট ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে বাঁধানো ঘাটের রানায় চোট খেয়ে।

টাকাটা দীনু তুলে ধরল চোখের সাম্‌নে। বেশ ক'রে দেখে চেয়ে। ধারের দাগগুলোয় নখ দিয়ে শব্দ ক'রে, একবার নিয়ে এলো কানের কাছে; তার পর কি ভেবে সেটা জোরে ছুঁড়ে মারল পুকুরের মাঝখানে।—ও পারে না, পারে না সইতে এই একটা গোটা টাকা।

ক্ষীণ একটা শব্দ! ঢেউগুলো তেমনি নির্ব্বিকার। গাছের ছায়াগুলো যেন আরও বেশী দুলে উঠ্‌ল একবার। তারপর দীনু অবসন্নভাবে আবার ব'সে পড়ল বেঞ্চখানার একটি পাশে।

(ক্রমশ)

বন্দী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

খাঁচা যে কঠিন সত্য জানে তাহা পাখী।
তবু থাকি থাকি
মরে ঝাপটিয়া পাখা কী আবেগ ভরে!
শুধু ঝরে
দু-চারিটি পালক কেবল,
নিস্পন্দ অচল
পড়ে থাকে খাঁচার তলায়,
কভু আর চঞ্চলতা জাগিবে না তায়!

তুমি আসি কৌতূহলভরে
তুলি' লও করে
সে ঝরা পালক।
যার হাতে অন্তরীণ হ'ল পলাতক
পলক পড়ে না চোখে তার!
কি ভাবিছ পর্ণটিরে কপোলে বুলায়ে বার বার?
রাখিবে খোঁপায়,
কবরী বন্ধনে বন্দী করিবে সে ছিন্ন পাখ্‌নায়?

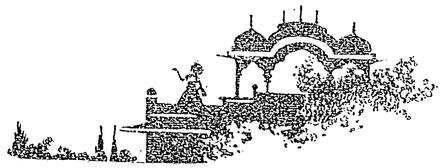

দৃষ্টিশক্তির স্বাস্থ্য

ডাঃ শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় এফ-আর-সি-এস, ডি-ও, ডি-ও-এম-এস

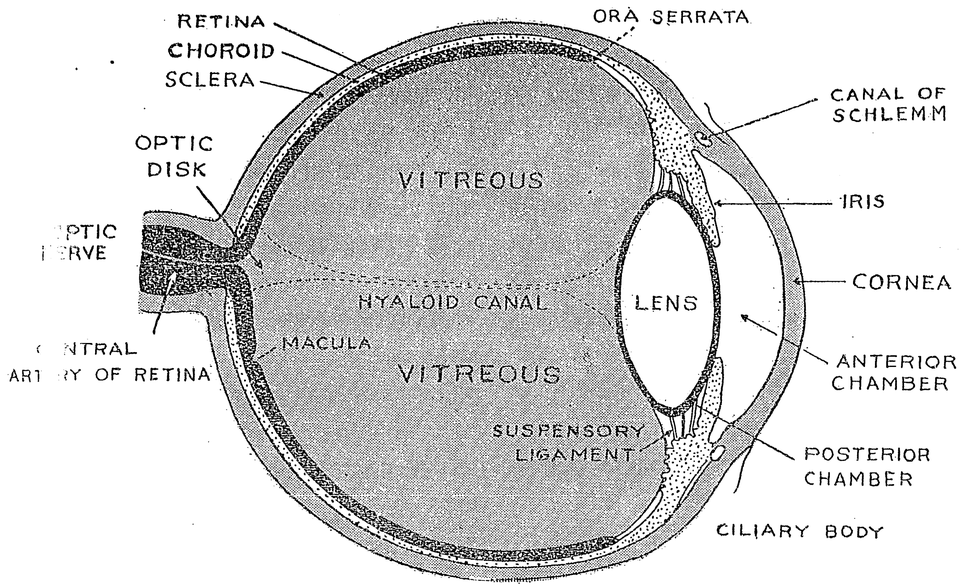

HORIZONTAL SECTION OF THE EYE-BALL

ভারতীয় সাধারণ বাড়ী কিম্বা স্কুলে প্রায়ই দৃষ্টিশক্তির স্বাস্থ্যের দিকে অবহেলা দেখা যায়। পাড়াগাঁয়ে এ বিষয়ে নজর নাই বলিলেই চলে। ইহার কারণ শিক্ষার অভাব ও অজ্ঞতা। দৃষ্টিশক্তির কোন দোষ থাকিলে যত শীঘ্র ইহা বুঝিতে পারা যায় ততই ভাল, কেন না অবহেলাবশতঃ দোষ ধরা না পড়িলে দৃষ্টিশক্তি আরও খারাপ হইতে পারে।

দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকিলে কি হয়? দৃষ্টিশক্তি শিশুর সমস্ত সুখের কারণ এবং ইহা লাভ করিবার শিশুর জন্মগত অধিকার আছে। স্কুলের ছাত্রকে ইহা বিদ্যা উপার্জ্জনের পথে দ্রুত লইয়া যায় এবং পরিণত বয়সে অর্থ উপার্জ্জনের ইহা প্রধান সহায়।

স্কুলে যাইবার পূর্ব্বের সময়—এই সময়ে শিশুদিগের দৃষ্টিশক্তির উপর নজর রাখা পিতামাতা বা অভিভাবকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই শিশু কোন জিনিষের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারে না। অনবরতই তাহার দৃষ্টি এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে। শিশু ৬ মাসের হইলেই চিত্তাকর্ষক বস্তুর উপর দৃষ্টি রাখিতে শিখে। এই বয়সের পরেও যদি দেখা যায় যে শিশু কোন বস্তুর উপর দৃষ্টি স্থির রাখিতেছে না, কোন আলো স্থির ভাবে দেখিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে যে শিশুর চোখের কিছু দোষ হইয়াছে এবং সেই জন্য তাহাকে কোন চক্ষু চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাইতে হইবে।

এই সময়ে শিশুর দর্শন ইন্দ্রিয়ের একটি প্রয়োজনীয় ক্রিয়ার বিকাশ হয়। দৃষ্ট পদার্থের দুই চক্ষুতে দুইখানি

চিত্রকে শিশু একখানি করিয়া দেখিতে শিখে। এই শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশু ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের বিভিন্ন আকার ও অবস্থা দেখিতে শিখে এবং তাহাদের দূরত্ব, উচ্চতা, গভীরতা প্রভৃতি দেখিতে অভ্যাস করে। শিশুর দৃষ্টির দোষ থাকিলে দৃষ্ট পদার্থগুলিকে বিশেষ ভাবে দেখিবার সময় চক্ষুর মাংসপেশীগুলির ক্রিয়া অযথাভাবে হইয়া থাকে এবং ইহার ফলে একটি চক্ষুর মাংসপেশী নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে এবং ইহাতেই শিশু ট্যারা হয়। শিশুর চোখ ট্যারা হইতে আরম্ভ হইলে প্রায় সন্ধ্যার সময় চোখের বিকলতা ধরিতে পারা যায়, কেন না এই সময়ে সমস্ত দিনের অঙ্গচালনার পরে সর্ব্ব শরীরের মাংসপেশীগুলির সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর মাংসপেশীগুলিও অবসন্ন হইয়া পড়ে। শিশুর জননী বা অভিভাবক ইহা দেখিলেই শিশুকে চিকিৎসার জন্য চক্ষু চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাইবেন। যদি চিকিৎসা না হয় তাহা হইলে ট্যারা চোখটিতে শিশু ভাল দেখিতে পাইবে না। আর যদি শিশুর ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে আদৌ চিকিৎসা না হয় তাহা হইলে ট্যারা চোখের দৃষ্টির সংশোধন হইবে না।

স্কুলে অধ্যয়নের সময়—এই সময়টি দৃষ্টিশক্তির পক্ষে বড় বিপজ্জনক সময়; কেন না লেখাপড়ার অতিরিক্ত কাজটি চক্ষুর উপর অতিরিক্ত ক্রিয়া করে। ভৃত্যের মত চক্ষু দ্বারা অতিরিক্ত কাজ করাইয়া লই। দিনের বেলায় শিশু স্কুলে থাকে বলিয়া তাহার দৃষ্টির উপর দেখাশুনা করিবার ভার শিক্ষকগণের বা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের হাতেই থাকে। য়ুরোপ বা আমেরিকার অধিকাংশ দেশে স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে মধ্যে চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। যে সকল ছাত্রছাত্রীর দৃষ্টির দোষ আছে তাহাদের চিকিৎসা করা হয় এবং যাহাদের দৃষ্টিশক্তি এক বিশিষ্ট পর্য্যায়ের নিম্নে পড়ে তাহাদিগকে দৃষ্টিশক্তিরক্ষোপযোগী শ্রেণীতে পাঠান হয়। এই সকল শ্রেণীর পঠিতব্য বিষয়গুলিতে চক্ষু চালনার প্রয়োজন খুব কমই আছে, সুতরাং এখানে দৃষ্টিশক্তি অধিকতর খারাপ হইতে পারে না। এই সকল দেশে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদিগের চক্ষু পরীক্ষার ভার একটি শিক্ষা বিষয়ক সরকারী বোর্ড ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সরকারী বোর্ডের হাতে ন্যস্ত এবং বৎসরে একবার করিয়া পরীক্ষা লওয়া হয়। ভারতবর্ষে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদিগের চক্ষু পরীক্ষা করিবার নিয়মিত ব্যবস্থা নাই। সুতরাং পিতামাতার, অভিভাবকগণের এবং শিক্ষকগণের এ বিষয়ে দায়িত্ব খুবই বেশী।

পিতামাতার এবং অভিভাবকদিগের কর্ত্তব্য কি?

১। শিশুকে স্কুলে পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহার দৃষ্টিশক্তি যে স্বাভাবিক এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত। এ পরীক্ষা করিতে হইলে শিশুকে একটু দূর হইতে ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে জিজ্ঞাসা করিবে। (ঘড়ি হইতে দূরত্ব ঘড়িতে লিখিত অঙ্কের আকারের উপর নির্ভর করে)। শিশুর উত্তর একজন স্বাভাবিকদৃষ্টি লোকের উত্তরের সঙ্গে মিলাইয়া লইবে! এইভাবে প্রত্যেক চক্ষুকেই পরীক্ষা করিতে হইবে। একটি চক্ষু হাত দিয়া কিম্বা একখানা মোটা কাগজ দিয়া চাপা দিয়া অপরটি পরীক্ষা কর। তাহার পর এক ফুট দূর হইতে শিশুকে সূচে সুতা পরাইতে হইবে—এক একটি চোখ দিয়া। এই সব কাজের মধ্যে শিশু কোন একটি না পারিলে তাহাকে স্কুলে পাঠাইবার পূর্ব্বে কোন চক্ষু-চিকিৎসকের নিকট পাঠাইতে হইবে, কেন না চোখের দোষ না সারিলে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যাইবে। শিশুকে চশমা পরাইতে দরকার হইলে পিতামাতার কিম্বা অভিভাবকের চশমা দিতে যেন কোনরূপ সঙ্কোচ না হয়। অনেক শিশুকে লেখাপড়ায় অমনোযোগিতার জন্য কিম্বা বুদ্ধিহীনতার জন্য শিক্ষকেরা শাস্তি দেন; তাঁহারা জানেন না শিশুর চোখের দোষ থাকিতে পারে, যাহার জন্য সে পড়া বা লেখার কাজ রীতিমত করিতে পারে না।

২। শিশুর পড়িবার ঘরে রীতিমত আলো থাকা দরকার।

৩। শিশু মাথাটি সামনের দিকে একটু নোয়াইয়া খাড়া হইয়া বসিবে। বিছানায় শুইয়া শিশুকে পড়িতে দিবে না, কিম্বা মাদুরে বা খাটিয়ায় বসিয়া বইখানির উপর ঝুঁকিয়া কিম্বা হাতে বই লইয়া ঝুঁকিয়া বসিয়া শিশুকে পড়িতে দিবে না।

৪। রাত্রে কৃত্রিম আলোকে শিশুকে যথাসাধ্য অল্প কাজ করিতে দিবে।

৫। প্রাতরাশের পূর্ব্বে খালি পেটে শিশুকে কোন কাজ করিতে দিবে না।

৬। শিশুর স্বাস্থ্য ক্ষীণ হইলে তাহার পড়াশুনা করিবার সময় কমাইয়া দেওয়া উচিত, কিম্বা পড়াশুনা বন্ধ

করিয়া দেওয়া উচিত, কেন না স্বাস্থ্য ক্ষীণ হইলে যেমন শরীরের মাংসপেশীগুলি ক্ষীণ হয়, সেইরূপ চোখের মাংসপেশীগুলিও ক্ষীণ হয়।

৭। দৃষ্টি যন্ত্রের উপর চাপ বা জোর পড়িতেছে এরূপ কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই যেমন পড়িতে পড়িতে চোখ দিয়া জল পড়িলে বা মাথা ধরিলে, কিম্বা পড়িবার পর চোখ লাল হইলে, এরূপ লক্ষণকে অবহেলা না করিয়া শিশুকে নিকটস্থ চোখের হাসপাতালে বা চক্ষু চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসার জন্য লইয়া যাইবে।

স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের কি করা উচিত—

১। স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাঁহারা একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিবেন এবং তিনি যেন অন্ততঃ বৎসরে একবার ঐ ছাত্রছাত্রীগণের চক্ষু পরীক্ষা করেন। ভারতবর্ষে প্রত্যেক স্কুলে ইহা অতি সহজেই হইতে পারে। যদি প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হয় তাহা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসককে অবৈতনিকভাবে পাওয়া যাইতে পারে।

২। তাঁহাদের দেখা উচিত যেন স্কুলের প্রত্যেক ঘরে যথেষ্ট আলো থাকে অথচ চক্ষুর পীড়াদায়ক তীক্ষ্ণ আলো (glare) না থাকে।

৩। দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার উপযোগী একখানি চার্ট (ফলক) রাখিবেন—একখানি ঈ চার্ট, অর্থাৎ "ঈ" অক্ষর দিয়া একখানি চার্ট—ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন "ঈ" অক্ষরগুলির বাহুগুলি ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রসারিত।

শিক্ষকগণের কি করা উচিত—

স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণের দৃষ্টিশক্তি রক্ষারূপ প্রয়োজনীয় কার্য্য শিক্ষকগণ করিতে পারেন এবং ছাত্রছাত্রীগণের কোন চক্ষুরোগ হইলে শিক্ষকগণ রোগের প্রারম্ভেই সাধারণ লক্ষণগুলি ধরিতে পারিবেন আশা করা যায়। তাঁহারা ছাত্রগণকে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতে দেখেন, সুতরাং তাহাদের চোখের দোষ হইলে সহজেই তাঁহারা ধরিতে পারেন।

১। চক্ষুর গঠনপ্রণালী ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষকগণের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার।

২। কি উপায়ে চক্ষুকে সুস্থ রাখা যায় ও স্কুলের ঘরগুলিতে কি রকম আলো থাকা দরকার তাহা শিক্ষকগণের জানা উচিত।

CHARTS RECOMMENDED IN VISION TESTING

Snellen Scale
M = metre

৩। "ঈ" চার্টের সহযোগে কিরূপে দৃষ্টিশক্তি নির্ভুলভাবে পরীক্ষা করা যায় তাহা শিক্ষকগণের জানা উচিত।

৪। যে চিহ্ন ও লক্ষণগুলি থাকিলে চক্ষুরোগের সম্ভাবনা প্রকাশ পায় সে চিহ্ন ও লক্ষণগুলি শিক্ষকগণের মোটামুটি ভাবে জানা উচিত। সে লক্ষণগুলি নিম্নে লিখিত হইল :—

(ক) চক্ষুর উপর চাপ বা ভারের (strain) লক্ষণ—মাথা ধরা, ক্লান্ত চক্ষু, মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট বা জ্যাব্‌ড়া দেখা, পড়িবার পর চোখ লাল হওয়া, চোখের পাতা ফুলা বা ভারি হওয়া, চোখের দৃষ্টি অস্থির হওয়া।

(খ) লিখিবার ও পড়িবার সময় মাথাটি অস্বাভাবিক ভাবে রাখা এবং চোখ ভিন্ন ভিন্ন দিকে থাকিলে দৃশ্যমান পদার্থের আকারের পরিবর্ত্তন ('astigmatism)।

(গ) বোর্ডের দিকে চাহিবার সময় একটু একটু চোখ বুজান কিম্বা পড়িবার সময় বইখানা একেবারে চোখের কাছে লইয়া যাওয়া (বার্ ইঞ্চির মধ্যে)—এগুলি অ-দূর-দৃষ্টির লক্ষণ (short-sightedness)।

(ঘ) লেখাপড়ায় অপটুতা

(ঙ) চোখ অস্বাভাবিক রকম লাল হওয়া, চোখ দিয়া জল পড়া, আলোর দিকে চাহিতে অক্ষমতা—এগুলি চক্ষু রোগের লক্ষণ—যাহা এই রোগাক্রান্ত ছাত্রদিগের জন্য অবহেলা করা উচিত ত নয়ই, অপরাপর ছাত্রদিগের জন্যও অবহেলা করা উচিত নয়, কেন না এই সকল লক্ষণযুক্ত অনেক চক্ষুরোগ সংক্রামক।

৫। দৃষ্টিশক্তির দোষের কিম্বা চক্ষুরোগের পূর্ব্ববর্ণিত চিহ্ন ও লক্ষণগুলির মধ্যে যদি কোন চিহ্ন বা লক্ষণ প্রকাশ পায় শিক্ষকের কর্ত্তব্য ইহা স্কুলের ডাক্তারের গোচরে আনা। যদি স্কুলের ডাক্তার না থাকে, তাহা হইলে ইহা শিশুর পিতা মাতা বা অভিভাবককে বলিতে হইবে, যেন অবিলম্বে তাহার চোখের চিকিৎসা হয়। শিশুকে কোন চক্ষুচিকিৎসার হাসপাতালে লইয়া যাইবার জন্যও অভিভাবককে পরামর্শ দিতে পারেন।

৬। শিক্ষকগণ দেখিবেন যে সমস্ত ছাত্রকে চশমা ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন ক্লাসে চশমা ব্যবহার করে, আর সেই সব ছাত্র যেন সম্মুখের বেঞ্চে বসে, তাহা হইলে তাহাদের চোখের উপর চাপ বা ভার (strain) যথাসম্ভব কম হইবে।

৭। যে সব ছাত্র নূতন ভর্ত্তি হইবে শিক্ষকগণ তাহাদের দৃষ্টি পরীক্ষা করিবেন এবং দেখিবেন যেন ছয় মাস অন্তর একবার এইরূপ পরীক্ষা করা হয়।

৮। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চশমা ব্যবহার করা ভাল নয় এরূপ কুসংস্কার অনেক পিতামাতার ও অভিভাবকের থাকিতে পারে। শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য এই কুসংস্কার দূর করা। কোন কোন অজ্ঞ লোক মনে করে, শিশুকে চশমা ব্যবহার করিতে দিলে তাহার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ খারাপ হইয়া যায়; আর যদি তাহাকে চশমা ব্যবহার করিতে না দেওয়া হয় তাহা হইলে সময়ে তাহার চোখের দোষ কাটিয়া গিয়া দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হইয়া যাইবে—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

স্কুলের ঘরে আলোক—ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। চোখের উপর চাপ বা ভার (strain) পড়ে দুই কারণে :—প্রথমত অল্প আলোক এবং দ্বিতীয়ত বেশী আলোকে (glare) অর্থাৎ চক্‌চকে আলোকে, যে আলোকের দিকে ঠাহর চাওয়া যায় না। ক্লাসে যেন এই দুই কারণের কোন কারণই না থাকে। আদর্শ স্কুল-ঘরের আলোক চলাচলের ব্যবস্থা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। স্কুলবাড়ীর সর্ব্বত্র যেন প্রচুর দিনের (সূর্য্যের) আলো থাকে।

২। ছাত্রদিগের বসিবার স্থান ও ডেস্ক এরূপ ভাবে সাজাইতে হইবে যেন আলোক উপর দিয়া এবং ছাত্রদিগের বাম স্কন্ধের উপর দিয়া আসে, যাহাতে লিখিবার সময় যেন কলমের ও হাতের ছায়া কাগজের উপর পড়িয়া কাগজখানি অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় করিতে না পারে।

৩। স্কুলের দরজা বা জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিতে যেন ছাত্রদিগকে না হয়, শিক্ষককেও না হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের স্কুলে এরূপ প্রায়ই হইয়া থাকে।

৪। শিক্ষক কখনও খোলা দরজা বা জানালার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইবেন না, কেন না তাহা হইলে ছাত্রদিগকে আলোকের পথের দিকে সোজাসুজিভাবে চাহিতে হইবে।

৫। যদি কোন ক্লাসের ঘরে উচ্চে অবস্থিত জানালা দিয়া আলো প্রবেশ করে তাহা হইলে সেই ঘরটি আদর্শরূপে আলোকিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

৬। যে সময়ে মরশুমি বাতাস বহিতে থাকে অর্থাৎ বর্ষা বাদ্‌লার দিনে অধিকাংশ ক্লাসের ঘর অন্ধকার হয়, সে সময়ে রীতিমত কৃত্রিম আলোকের ব্যবস্থা না থাকিলে লেখাপড়ার কাজ বন্ধ দেওয়া উচিত। কৃত্রিম আলো উপযুক্ত প্রখর হওয়া উচিত। ইহা একটু হলদে রংএর

হইবে এবং ইহাতে একটি আবরণ থাকিবে, যেন ইহার চাকচিক্য (glare) চোখে না লাগে।

অপরাপর কারণ যাহা চোখের চাপ বা ভার (strain) উপস্থাপিত করে :—১। (glare)

(ক) পালিশ করা জিনিষের উপর আলোক প্রতিফলিত হইয়া চোখের glare উপস্থাপিত করে। এইজন্য স্কুলের আসবাব পত্র যেন পালিশ করা না হয়। বোর্ডগুলি প্লেটের তৈরি হওয়া উচিত, আর যদি কাঠের তৈরি বোর্ড থাকে তাহা হইলে সেগুলিতে মধ্যে মধ্যে কাল রং দেওয়া উচিত যেন সেগুলি চক্‌চকে না হইয়া যায়। পালিশ করা কাগজে ছাপা বই ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নয়।

(খ) আলো সোজাসুজিভাবে চোখে পড়িলে glare উপস্থিত করে। এই কারণে স্কুলে ছাত্রদিগের বসিবার স্থান ও ডেস্ক এমন ভাবে সাজাইতে হইবে যেন ছাত্রদিগকে খোলা দরজা, জানালা বা আলোকের দিকে মুখ করিয়া বসিতে না হয়। রাত্রে ছাত্রেরা প্রায় আলোটি সাম্‌নে রাখিয়া পড়িতে বসে—এ অভ্যাসটিও ত্যাগ করাইতে হইবে।

(গ) তীক্ষ্ণ অসামঞ্জস্য glare উপস্থিত করে। এইজন্য দরজা বা জানালার মধ্যে বোর্ড রাখিবে না। ডেস্কগুলি সমানভাবে আলোকিত হওয়া উচিত।

ছাত্রদিগের অবস্থিতি—ছাত্রদিগকে ঝুঁকিয়া কোন কাজ করিতে দিবে না। তাহারা মাথাটি একটু সাম্‌নে নোয়াইয়া খাড়া হইয়া বসিবে; এই ভাবে বসিতে সুবিধা হয় এরূপ উচ্চতার ডেস্কগুলি হওয়া চাই। ছাত্রদিগের উচ্চতা অনুসারে যে সব ডেস্কের উচ্চতা কমাইতে ও বাড়াইতে পারা যায় সেইগুলিই আদর্শ ডেস্ক। শিশুদিগকে শুইয়া পড়িতে দিবে না, কিম্বা তাহাদের খেয়াল মত নানা অদ্ভুত ভাবে অবস্থান করিয়া পড়িতে দিবে না।

পুস্তকের ছাপা—এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। ছাত্রের বয়স যত কম হইবে ছাপাও তত বড় হওয়া দরকার। লাইনগুলি বিশেষ ভাবে ফাঁকফাঁক থাকিবে এবং অক্ষরগুলির মধ্যেও যেন ফাঁক থাকে।

বোর্ডের লেখা—বোর্ডের লেখাগুলি যেন বেশ বড় বড় হয় এবং ছাত্রেরা যেন বোর্ড হইতে বেশি দূরে না বসে। যে সমস্ত ঘরে ছাত্রদিগকে বোর্ড হইতে বিশ ফুটের অধিক দূরে বসিতে হয় সেই সমস্ত ঘরের বোর্ডে সাধারণ ক্লাসের ঘরে সচরাচর যে পরিমাণ আলোকের দরকার হয় তাহা অপেক্ষা শতকরা ষাট ভাগের বেশি আলোকের দরকার।

দৃষ্টি পরীক্ষা বা দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা—ছোট ছোট শিশুদিগের বেলায় "ঈ" চার্ট ব্যবহৃত হইবে এবং বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য সাধারণ snellen চার্ট ব্যবহৃত হইবে। প্রত্যেক চক্ষু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরীক্ষা করা উচিত। একখানি মোটা কাগজ (card board) নাকের উপর বাঁকা ভাবে ধরিয়া একটি চোখকে সম্পূর্ণ ভাবে ঢাকিয়া ফেলিবে। যে চোখটি কার্ড বোর্ডের সাহায্যে ঢাকা দেওয়া হইল সে চোখটি বুজাইবে না বা তাহার উপর কোন চাপ দিবে না। এই ভাবে শিশুরা খোলা চোখ দিয়া দেখিবে। চোখের উপর সোজা ভাবে বা পাশ দিয়া যেন আলো আসিয়া না পড়ে। চার্টের উপর আলো সোজা ভাবে আসিয়া পড়িবে, অথচ যেন চক্‌চক্ না করে (যেন glare না হয়)। চার্টখানি ছয় মিটার (বিশ ফুট) তফাতে ঝুলান থাকিবে এবং চার্টে লিখিত "ছয়" অক্ষরটি যেন চোখের সঙ্গে এক সমতলে থাকে। যে লাইনটিতে "ছয়" অক্ষরটি লেখা আছে সেই লাইনটি ছয় মিটার দূর হইতে পড়িতে পারিলে বুঝিতে হইবে যে দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে অর্থাৎ সুস্থ আছে। সমস্ত চার্টখানিতে যেন সমানভাবে আলো পড়ে।

দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষার ফলগুলি এই ভাবে লিখিত হয় :—৬/৬, ৬/৯, ৬/১২, প্রথম অঙ্কটি চার্ট হইতে কত মিটার দূরে পরীক্ষা লওয়া হইল বুঝাইবে (এক মিটার ৩৯ ইঞ্চি) এবং দ্বিতীয় অঙ্কটি চার্ট লিখিত কোন লাইনটি পঠিত হইল বুঝাইবে।

যে সমস্ত শিশু ৬।৬ অপেক্ষা ভাল পড়িতে পারে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ বুঝিতে হইবে; কিন্তু যদি বুঝা যায় যে উহা পড়িতে তাহাদের চোখে একটু কষ্ট হইয়াছে (strain হইয়াছে) তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, তাহাদের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক নয় বা সুস্থ নয় এবং তাহাদিগকে বিশেষ পরীক্ষার জন্য চক্ষু হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে। যদি কোন শিশুর দৃষ্টি শক্তির দোষ থাকে তাহা

হইলে তাহাকে তাহার পিতামাতার বা অভিভাবকের নিকট একখানি পত্রসহ পাঠাইয়া দিতে হইবে; ঐ পত্রে শিশুর দৃষ্টিশক্তির দোষের কথা লেখা থাকিবে এবং কোন চক্ষু চিকিৎসকের দ্বারা তাহার চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া তাহার রীতিমত চিকিৎসা করাইবার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইবে।

পরিণত বয়স—স্কুলে পড়িবার সময় যেমন আলোকে থাকিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, glare ত্যাগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে এবং যে আলো একবার নিবিয়া যায় ও একবার জলে সে আলোর দিকে চাহিতে বারণ করা হয়, পরিণত বয়সেও সেইগুলি প্রযোজ্য। পরিণত বয়সে লোকে নিজেদের চোখের যত্ন লইতে পারে বলিয়া দায়িত্ব তাহাদের নিজেদের উপরেই থাকে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর কিম্বা একটু বেশি বয়সে মানুষের চাল্‌শে (চল্লিশে) ধরে, অর্থাৎ পড়িবার সময় বা সূক্ষ্ম কাজ করিবার সময় চশ্‌মার প্রয়োজন হয়। চশ্‌মা যেন কোন চক্ষু চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে লওয়া হয় এবং সোজাসুজি চশ্‌মা বিক্রেতার নিকট হইতে না লওয়া হয়। সাধারণের ধারণা আছে, যদি কেহ কিছু কাল চশ্‌মা না লইয়া চালাইতে পারে, তাহা হইলে আবার তাহার দৃষ্টিশক্তি ভাল হইবে এবং তাহার চশ্‌মা লইবার দরকার হইবে না। এই ধারণা ভিত্তিহীন। পড়িবার জন্য এই বয়সে চশমা লইতে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়, কেন না ইহা চোখের কোন রোগ নয়, ইহা পরিণত বয়সের চোখের স্বাভাবিক পরিণতি।

বৃদ্ধ বয়স—এই বয়সে চোখের অনেক বিপদ ঘটে। এ সময়ে চোখে ছানিপড়া এরূপ সাধারণ যে, এ বয়সে দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গেলেই লোকে মনে করে ছানি পড়িয়াছে এবং বন্ধুরা চোখের তারাগুলি সাদা দেখিয়া তাহাদের ঐ বিশ্বাস দৃঢ় করে। অনেক লোক এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া চিরকালের মত অন্ধ হইয়া যায়, কেন না এই দৃষ্টিশক্তিহীনতা একেবারেই ছানির জন্য না হইতে পারে। চোখের গোলকের মধ্যে কোন রোগ হইলে কিম্বা বার্দ্ধক্য সুলভ গ্লকোমা রোগ হইলে দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়; বৃদ্ধ বয়সে চোখের তারা সাদা হওয়া স্বাভাবিক। অতএব যদি গ্লকোমার জন্য কিম্বা চোখের গোলকের মধ্যে কোন রোগের জন্য দৃষ্টিশক্তিহীনতা জন্মে, আর ছানি হইয়াছে মনে করিয়া কবে ছানি পাকিবে ইহার জন্য অপেক্ষা করা যায় তাহা হইলে চক্ষুচিকিৎসার অতি মূল্যবান সময় নষ্ট করা হয়। তাহার পর যখন দৃষ্টিশক্তির সম্পূর্ণ লোপ হয় এবং রোগী মনে করে ছানি পাকিয়া অস্ত্রোপচারের উপযুক্ত হইয়াছে তখন সে চক্ষু-চিকিৎসকের কাছে যায় এবং শুনে যে তাহার অন্ধতা ছানির জন্য নয় আর সে অবস্থায় ইহা চিকিৎসাসাধ্যও নয়। চিকিৎসার জন্য চক্ষু হাসপাতালে আগত অনেক রোগীর এই দুঃখের কাহিনী শুনা যায়। এই বয়সে দৃষ্টিশক্তি কমিতে আরম্ভ করিলেই কোন চক্ষুচিকিৎসকের দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার যে ছানির জন্য দৃষ্টিশক্তি কমিতেছে। তাহা হইলে রোগী নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করিতে পারে এবং পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবার আশাও পোষণ করিতে পারে।

দৃষ্টি শক্তির উপর সিনেমা দর্শনের ক্রিয়া—পুনঃ পুনঃ সিনেমা দেখিতে গেলেও দৃষ্টিশক্তির কোন অনিষ্ট হয় না যদি দর্শক পর্দ্দা (screen) হইতে অন্তত বিশ ফুট তফাতে বসে এবং পর্দ্দার উপর ছবিখানি না কাঁপে। ভারতবর্ষে গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ সূর্য্যের বক্র কিরণগুলি চক্ষুর অনিষ্টকারক। ভারতীয়দিগের চক্ষু অধিক পরিমাণ রংএর দ্বারা স্বাভাবিক উপায়ে রক্ষিত হয়। য়ুরোপীয়দিগের চক্ষু উপযুক্ত টুপি ও চশ্‌মা (glare glasses) দ্বারা রক্ষিত করিতে হইবে। য়ুরোপ কিম্বা আমেরিকা অপেক্ষা ভারতবর্ষে ছানি পড়া একটি সাধারণ রোগ এবং ইহার কারণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অনিষ্টকর সূর্য্যকিরণ; কিন্তু শিক্ষিত ভারতীয়দিগের মধ্যে, যাঁহারা সূর্য্যকিরণ হইতে চক্ষুকে রক্ষা করেন, এই রোগ শীতপ্রধান দেশের লোকদিগের অপেক্ষা বেশি দেখা যায় না।

যাহারা সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যের দিকে চায় তাহাদের মধ্যে আংশিক অন্ধতার কারণ দেখা যায়। সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে একখণ্ড কাচে ধোঁয়ার কালি ফেলিয়া সেই কাচের মধ্য দিয়া দেখিতে হইবে এবং এই ভাবেও অল্পক্ষণের জন্য দেখিবে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

মাকড়সা ও তাহার স্বজাতি

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

প্রকৃতির রাজ্যে কত যে বিচিত্র জীবের সমাবেশ তাহা গণনায় শেষ করা যায় না। এই বিচিত্র জীব জগতের মধ্যে মানুষের তুলনায় অনেক নিম্ন শ্রেণীর জীব রহিয়াছে যাহাদের শিল্প চাতুর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাহাদের শিল্পকলা নৈপুন্য দেখিয়া শ্রেষ্ঠ মানবকেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। জন্মগত শিল্পচাতুর্য্য লইয়া যে সকল নিম্নশ্রেণীর জীব জন্মগ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে মাকড়সা অন্যতম। অনেকেই ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ মাকড়সাকে পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করেন না। পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের দেহ মাথা, বক্ষ ও উদর এই তিন-ভাগে বিভক্ত এবং তাহাদের ছয়টি পা থাকে। কিন্তু মাকড়সার দেহ দুই ভাগে বিভক্ত এবং তাহাদের সর্ব্বসমেত আটটি পা আছে। প্রাণিতত্ত্ববিদগণ সেইজন্য ইহাদের Arachnida শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া থাকেন। মাকড়সার ন্যায় কাঁকড়াবিছা, একজাতীয় অতি ক্ষুদ্র প্রাণী (mite), শস্যচ্ছেদক পোকা (Hervester) এবং অন্যান্য কয়েকজাতীয় জীব Arachnida শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

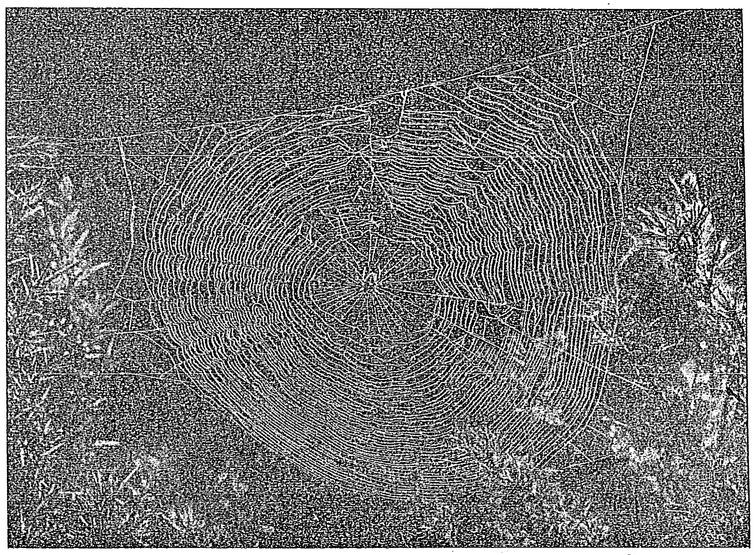

মাকড়সার জাল

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মাকড়সা দৃষ্ট হয়। কোলাহলময় সহর হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গম অরণ্য এবং উচ্চ গিরিশিখরে পর্য্যন্ত মাকড়সার খোঁজ পাওয়া যায়।

একমাত্র দেহের আয়তন ও বর্ণের তারতম্য ব্যতীত পৃথিবীর সকল মাকড়সার দৈহিক গঠন একরূপ। প্রাণিতত্ত্ব-বিদগণের মতে প্রকৃতির রাজ্যে এইরূপ দৈহিক গঠনের অভিন্নতা খুব কম শ্রেণীর জীবের মধ্যে দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর কোন কোন জীব যাহারা সর্ব্বত্রই বিস্তৃত রহিয়াছে তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দৈহিক গঠনের বিশেষ তারতম্য দেখা যায়; গ্রীষ্মপ্রধান ও শীত প্রধান দেশের জীবের মধ্যে বিভিন্নতা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য হয়। ডিম হইতে আত্মপ্রকাশ করিবার পর মাকড়সার দৈহিক গঠনের আর কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। পরিণত অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে ইহাদের কয়েকবার দেহের খোলস পরিবর্ত্তন হয়। মাকড়সা শাবক প্রথম খোলস পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে খাদ্যগ্রহণ এবং জাল নির্ম্মাণে সক্ষম হয় না।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জস্থিত মাকড়সার ছয় হইতে আটটি চক্ষু থাকে। অন্যান্য দেশে দুই চক্ষুবিশিষ্ট মাকড়সা পাওয়া যায়। কপালের উপরিভাগে চক্ষুগুলি এইরূপভাবে সজ্জিত থাকে যে, যে কোন দিক হইতে কোন বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করিতে পারে। ফলতঃ এতগুলি চক্ষু থাকা সত্ত্বেও ইহাদের দৃষ্টিশক্তি সেই অনুপাতে শক্তিশালী নয়। চক্ষুগুলির আকারও বিভিন্ন; কোনটির আকার খুব বড় আবার কোনটির এত ছোট যে, অণুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে তাহার

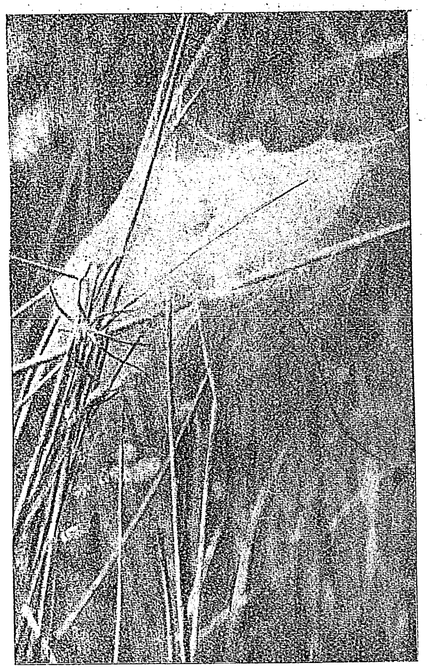

লম্ফদানপটু মাকড়সার জাল

প্রকৃত রূপ নির্ণয় করিতে হয়। কোন কোন শ্রেণীর মাকড়সার চক্ষু হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল। আবার কয়েক জাতীয় মাকড়সার চক্ষু পীত বর্ণের আবরণে আবৃত। এই জাতীয় মাকড়সার চক্ষু দেখিয়া তাহাদের অন্ধ বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে মাকড়সার দৃষ্টিশক্তি খুবই সীমাবদ্ধ। কদাচিৎ কয়েক জাতীয় মাকড়সা মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরের বস্তুর উপস্থিতি বুঝিতে পারে। বিশেষভাবে স্পন্দিত অথবা উজ্জ্বল বস্তু না হইলে সংখ্যাধিক্য মাকড়সাই এক ইঞ্চির বেশী দূরের জিনিষ দেখিতে সক্ষম হয় না।

বাৎসল্য প্রীতি মাকড়সা জাতীর মধ্যে বিশেষ করিয়া অনুভূত হয়। ইতরপ্রাণীর মধ্যে অনেক জাতীয় প্রাণী আছে যাহাদের ডিম প্রসবের পর ডিমের উপর আর কোন অনুরাগ থাকে না। সেই জন্য তাহাদের ডিমগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু স্ত্রী মাকড়সার সন্তান প্রীতি অতুলনীয়। সন্তান প্রতিপালনে তাহাদের কোনরূপ পরিশ্রান্ত হইতে দেখা যায় না। ডিম থেকে সন্তান আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে ডিমগুলির উপর উত্তাপ দানে এবং শত্রুর হাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে ইহারা বিশেষ মনোযোগ দেয়। স্ত্রী উলফ্ মাকড়সাকে (Wolf-spider) ডিমের থলিটিকে যত্নসহকারে বহন করিয়া আহার ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরিশ্রান্ত হইয়া থলিটি পরিত্যাগ করে না। একমাত্র ডিমে উত্তাপ দেবার সময় থলিটি নামাইয়া রাখে। এইরূপে যখন ডিম হইতে মাকড়সা শিশুর আবির্ভাব হয় তখন স্ত্রী মাকড়সাকে নূতন উদ্যমে সন্তান পালনে ব্যস্ত দেখা যায়। ঐ জাতীয় স্ত্রী মাকড়সা তাহার প্রায় শতাধিক শিশুকে নিজ পৃষ্ঠের উপর বহন করিয়া তাহাদের প্রতিপালন করে। যতদিন না শিশুগুলি বড় হইয়া আত্মনির্ভরশীল হয় ততদিন নিজের তত্ত্বাবধানে রাখে।

প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে অনেক সময় এই সকল ডিমের থলিগুলি প্রকৃত মালিকের অধিকারচ্যুত হয়। কিন্তু স্ত্রী মাকড়সা সন্তানসহ ভ্রমণে বাহির হইয়া তাহাদের স্বজাতীয় মাকড়সার ডিমের থলি এইভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেই যত্নের সহিত নিজ তত্ত্বাবধানে উহা গ্রহণ করে। নূতন ডিমের থলি এবং নিজের সন্তানদের পৃষ্ঠে বহন করিতে স্ত্রীমাকড়সাকে বিশেষ কষ্টস্বীকার করিতে হইলেও তাহারা ডিমের থলির উপর কোনরূপ অযত্ন করে না। আপন সন্তানদেরই মত অপরের সন্তানদের যত্ন লইয়া থাকে।

সকল মাকড়সাই বিষাক্ত। তবে মাত্র কয়েক জাতীয় মাকড়সার দংশন মানুষের পক্ষে মারাত্মক। মাকড়সার মুখ বিবর দুইভাগে বিভক্ত। একভাগে একজোড়া বিষাক্ত চুয়াল এবং অপরভাগে সাঁড়াসী আকারে একজোড়া অনুভব যন্ত্র। পৃথিবীর কোন কোন দেশে কয়েক মিনিটের মধ্যে

গাধীরও মৃত্যু ঘটাইতে পারে এইরূপ বিষাক্ত মাকড়সা পাওয়া যায়। সকল শ্রেণীর পুরুষ মাকড়সা স্ত্রী মাকড়সা অপেক্ষা আকারে ছোট; এবং তাহাদের অনুভব-যন্ত্রের (pedipalp) গঠন বিশেষভাবে জটিল। যৌনসঙ্গমের সময়ে এই সকল অনুভব-যন্ত্র শুক্রকীটের আধারে পরিণত হয়; এবং ইহার দ্বারাই স্ত্রী ও পুরুষ মাকড়সার মিলন সংঘটিত হয়। প্রধানতঃ এই সকল যন্ত্র স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। মাকড়সার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি খুবই সীমাবদ্ধ হইলেও অনুভব শক্তি অদ্ভুত।

মাকড়সার তলপেটে (Abdomen) চার হইতে ছয়টি সূক্ষ্ম সংযোজিত বস্তু (appendage) থাকে এবং ইহারাই প্রকৃতির খেয়ালে মাকড়সার সূতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্রে (Spinneret) পরিণত হয়। প্রত্যেক সূতাপ্রস্তুত যন্ত্রে প্রায় একশটি করিয়া সূতার নলী (Spinner's spools) থাকে। সূতার নলীগুলি আবার একটি মাংসগ্রন্থির (Gland) সহিত সংযুক্ত। এই মাংস গ্রন্থিই লালা প্রস্তুত করে এবং এই লালা হইতে রেশমী সূতা প্রস্তুত হয়। মাকড়সা তাহার যন্ত্র হইতে প্রায় একশত ফিট সূতা তৈয়ার করিতে সক্ষম হয়। লালা প্রস্তুতকারী মাংস গ্রন্থিটি আবার পেশীযুক্ত প্রকোষ্ঠের মধ্যে রক্ষিত। পেশীর সঙ্কো-

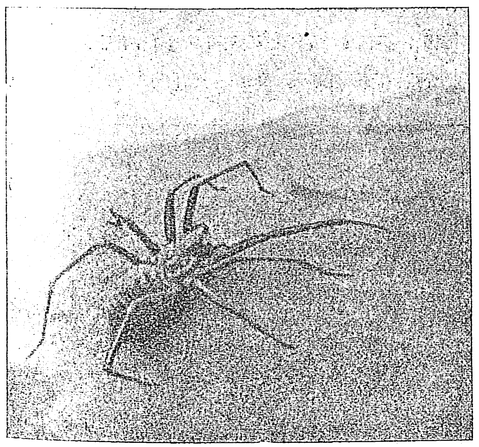

গৃহবাসী মাকড়সা

চনে রেশম জলীয় আকারে নালা বাহিয়া সূতার নলীতে আসিয়া পড়ে। কোন কোন জাতীয় মাকড়সার তিন প্রকারের লালা পূর্ণ মাংস গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থিগুলি নানা আকারের সূতা বয়ন করে।

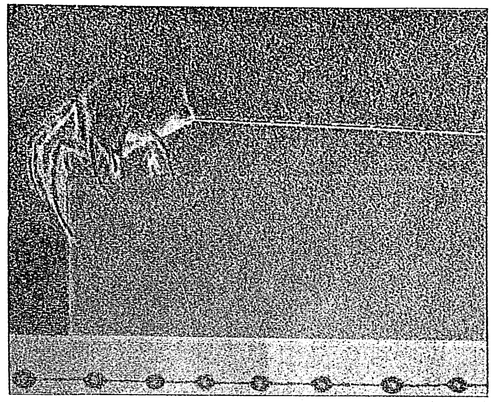

উপরিভাগে বাগানবাসী মাকড়সা তাহার সূতা প্রস্তুত করিবার (spinneret) হইতে সূতা বয়ন করিতেছে; নিম্নে মাকড়সার সূতাকে বৃহত্তর আকারে দেখান হইয়াছে। সূতায় সুস্পষ্ট আঠাল বর্ত্তুলগুলি শীকারকে আয়ত্বের মধ্যে আনিয়া থাকে

জলীয় রেশম সূতার আকার ধারণ করিলে উহা বাতাসে সঙ্কুচিত হইয়া শক্ত হয়। মাকড়সা যখনই বিপদে পড়ে এবং আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে যাইয়া তাহার পদস্খলন হয় তখনই সে রেশমের সূতা বুনিয়া ফেলে; এবং তাহার সাহায্যে দূরত্ব পথ অল্প সময়ে সমাপ্ত করিয়া আত্মগোপন করে। এই সূতা বয়ন করিয়া মাকড়সা শিকারের জন্য ফাঁদ পাতে, নিজদের ও সন্তানদের রক্ষা করে।

মাকড়সার অতি সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিবার এবং জটিল জাল বুনিবার অদ্ভুত কৌশল মানুষ স্মরণাতীত যুগ হইতে দেখিয়া আসিতেছে। গ্রীক পুরাণতত্ত্বে Arachne নামক গল্পে মাকড়সার জন্ম ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গল্পের নাম হইতেই মাকড়সা যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহার নামকরণ হয়। গল্পে প্রকাশ, Arachne নামে একজন কুমারী বয়ন শিল্পে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন। বয়ন শিল্প প্রতিযোগিতায় দেবী এথেলী তাঁহার নির্ভুল বয়নশিল্পে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার রচিত সুন্দর কাপড়খানি ছিঁড়িয়া ফেলেন। দেবীর এইরূপ কার্য্যে অতিশয় নিরাশ হইয়া কুমারী Arachne রজ্জু বন্ধনে আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত

হইলেন। কিন্তু দেবতারা তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া গলদেশের সংলগ্ন রজ্জু শিথিল করিয়া দিয়া মাকড়সার জালে

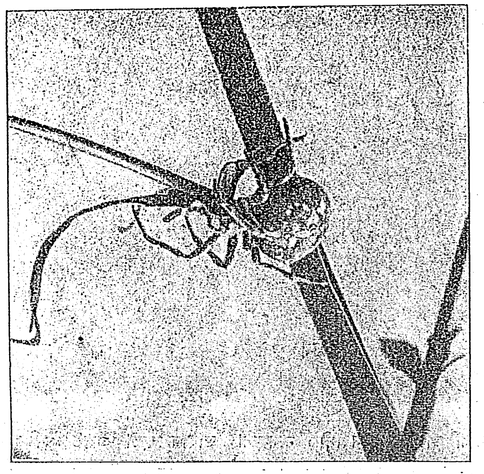

গোপনীয় স্থানে শীকারের অপেক্ষায় মাকড়সা

রূপান্তরিত করিলেন। ইহার পর হইতে কুমারী Arachne মাকড়সায় রূপান্তরিত হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া জাল বুনিতে লাগিলেন।

সকল মাকড়সাই তথাকথিত রেশমী সূতা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয়; এবং প্রস্তুত রেশম তাহাদের বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। তবে সকল মাকড়সাই ডিমের জন্য রেশমের গুটী ব্যবহার করে। সেইজন্যই মনে হয় প্রধানতঃ ইহার জন্য প্রকৃতি মাকড়সাকে রেশম প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। মাকড়সা নানা উপায়ে সূতার গুটীর দ্বারা ডিমগুলিকে রক্ষা করে। কয়েক জাতীয় মাকড়সা গাছের পাতার নিম্নভাগে পাতার উপর ডিম প্রসব করিয়া তাহার উপরিভাগে রেশমের আবরণ বুনিয়া দেয়। আবার কোন কোন শ্রেণীর মাকড়সা প্রথমে সূক্ষ্ম সূতার দ্বারা প্রস্তুত রেশমী চাদরের উপর ডিম প্রসব করে, পরে উপরিভাগে আবরণ তৈয়ার করিয়া একটী ছোট প্রকোষ্ঠ তৈয়ার করে। উপরিভাগ ও নিম্নভাগের চাদরের চারিধার আবার সংযুক্ত করিয়া দেয়। কোন কোন সময়ে রেশমী সূতার সহিত গাছের গুঁড়া ছাল, ছোট মাটির পিল লইয়া মাকড়সা গৃহ নির্ম্মাণ করে।

মাকড়সার জাল নির্ম্মাণ কৌশল সত্য সত্যই তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক বুদ্ধির পরিচয় দেয়। প্রকৃত পক্ষে যাহাদের চিন্তা করিবার কোন ধারা নাই তাহাদের এইরূপ কৌশলের কথা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

মাকড়সার জালের বহির্ভাগের সূতাগুলি যে সুসামঞ্জস্য ভাবে নিকটস্থ বস্তুতে সংলগ্ন থাকিবে এইরূপ অবশ্য কোন কারণ নাই। সূতার দ্বারা বাহিরের কাঠাম প্রস্তুত হইলে গাড়ীর চাকার স্পোকের আকারে সূতা বুনিয়া জালের মধ্যস্থলে আসে এবং একই কেন্দ্র হইতে চক্রাকারে সূতা বুনিয়া মাকড়সা যখন তাহার জাল বুনা শেষ করে তখন তাহা দেখিয়া মনে হয় ইহা যেন নিখুঁতভাবে তৈয়ার করা হইয়াছে।

ডারউইন উল্লেখ করিয়াছেন মাকড়সার জাল বুনা স্বয়ং গতিশীল। মাকড়সার পক্ষে ইহা কোন বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় নহে। যখনই তাহারা কোন জাল নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করে ইহাদের পায়ের দৈর্ঘ্য সূতার প্রসারণ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। ফলে সূতা যখন আঁটা হয় তখন আপনা হইতেই জালের প্রকৃত আকার ধারণ করে।

এই উক্তি কতদূর সত্য তাহা লইয়া প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। যাঁহারা মাকড়সার জাল বুনা কৌশলে মুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা মাকড়সা সঠিক কিরূপ ভাবে জাল নির্ম্মাণ করে তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারেন। সমস্ত ঘটনাটি সম্যক উপলব্ধি করিয়া এই অনুমান সত্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে পারেন।

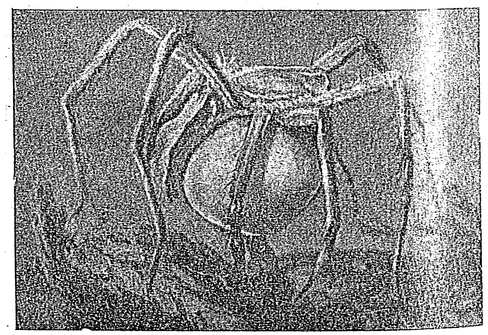

মাকড়সা ও তাহার ডিমের থলি

মাকড়সা উপযুক্ত স্থান ঠিক করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করে। প্রথমে কোন নির্ব্বাচিত স্থানের উপর হইতে

শিল্পী—সুনীলকুমার দাসগুপ্ত, কলিকাতা

অমরনাথের পথ

মিলন-সন্ধ্যা

শিল্পী—দিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা

"হেথা দুইবেলা ভাঙ্গা-গড়া-খেলা
—অকূল সিন্ধুতীরে—"

শিল্পী—সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, মান্দ্রাজ আর্ট স্কুল

নিম্নদেশে সূতা বয়ন করিতে করিতে নামিয়া আসে। তাহার পর সূতার শেষভাগ যথাসময়ে নিম্নদেশে উপযুক্ত স্থানে আটকাইয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায় দুই প্রান্তে সংলগ্ন সূতাটিকে চক্রবালের ন্যায় দেখায়। ইহার পর মাকড়সা সূতা বাহিয়া উপরে উঠিয়া যায়; এবং পুনরায় উপর হইতে সূতা বুনিতে বুনিতে নিম্নভাগে নামিয়া গিয়া প্রথম প্রস্তুত সূতার বিপরীত দিকের নিম্নভাগের কোন স্থানে সূতার শেষ প্রান্ত সংলগ্ন করে। এইরূপে সূতার দ্বারা মাকড়সা প্রথমে চতুর্ভুজ আকারে একটি কাঠাম তৈয়ার করে। ইহার পর চতুর্ভুজের মধ্যভাগে গাড়ীর চাকার স্পোকের মত সূতা বুনিয়া চতুর্ভুজক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়। মধ্যস্থল হইতে প্রায় চক্রাকারে (চতুর্থ চিত্রে বর্ণিত উপায়ে) কিছুদূর সূতাবুনিয়া বাতাস গমনাগমনের জন্য কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়া আবার নূতন করিয়া ঐরূপে সূতা বুনিতে আরম্ভ করে। এইরূপে সূতা বুনা শেষ হইলে মাকড়সা পুনরায় মোটা আঠাল সূতা দ্বারা পূর্ব্ব নির্ম্মিত সূতার উপর পুনরবয়ন করিয়া জালটিকে শক্ত করে। মাকড়সা ইহার পর জালের কেন্দ্রস্থল হইতে কতকগুলি সূতা বয়ন করিয়া নিকটস্থ বৃক্ষের গোপনীয় স্থানে লইয়া যায়। সর্ব্বক্ষণ জালের উপর উপস্থিত না থাকিয়াও শিকারের আগমন এই সূতা সাহায্যে বুঝিতে পারে। জালটী কেহ স্পর্শ করিলে এই সূতা সাহায্যে তাহা বুঝিতে পারিয়া মাকড়সা তৎক্ষণাৎ জালের উপর উপস্থিত হয়।

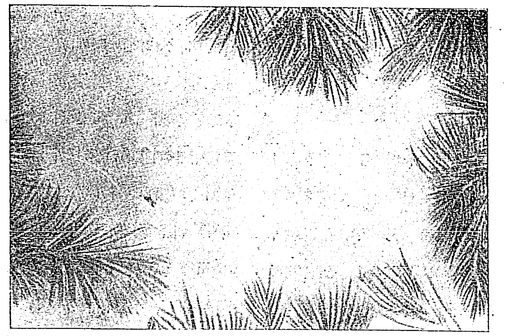

(১)
মাকড়সা তাহার জালের প্রথম সূতা বয়ন করিয়াছে

কয়েক জাতীয় মাকড়সা ঘাস কিম্বা শাকশব্জীর ভিতর সুড়ঙ্গ আকারে জাল বুনিয়া যায়। আবার মাটির নীচেও সুড়ঙ্গ আকারে গৃহ নির্ম্মাণ করে। যাহাতে গর্ত্তের ভিতরে মাটি ঝরিয়া না পড়ে সেইজন্য মাকড়সা পুরু রেশমের আচ্ছাদন তৈয়ার করিয়া গর্ত্তটী আবৃত করে। অনেক সময় আবার সুড়ঙ্গের শেষ দিকে রেশমের একটি আবরণে দরজা প্রস্তুত করে। দরজাটির কেবলমাত্র ভিতর দিক হইতে খুলিবার পথ রাখায় সুড়ঙ্গ মধ্যে অন্য কাহারও অনধিকার প্রবেশ সম্ভব হয় না। এই সকল আবরণ খুব সূক্ষ্ম সূতার দ্বারা প্রস্তুত হয়; এবং কেবলমাত্র অনুবীক্ষণ

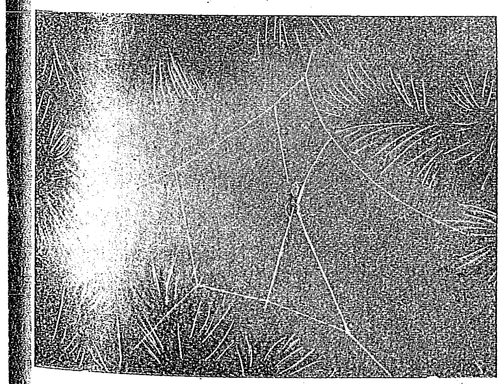

(২)

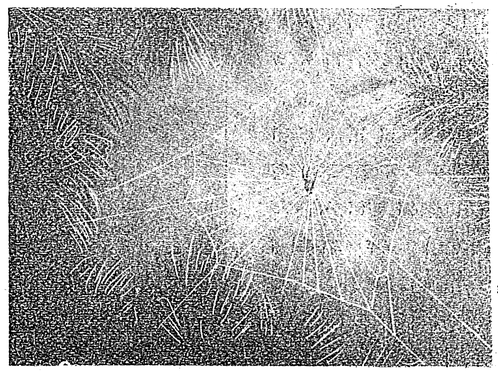

(৩)

(বামদিকে) জালের কাঠামো শেষ হইলে উহাকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া গাড়ীর চাকার স্পোকের আকারে সূতা বয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। (ডানদিকের চিত্রে) চতুর্ভুজের মধ্যভাগে গাড়ীর চাকার স্পোকের আকারে সূতা বুনা শেষ করিয়া মাকড়সা জালের মধ্যস্থলে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম লইতেছে

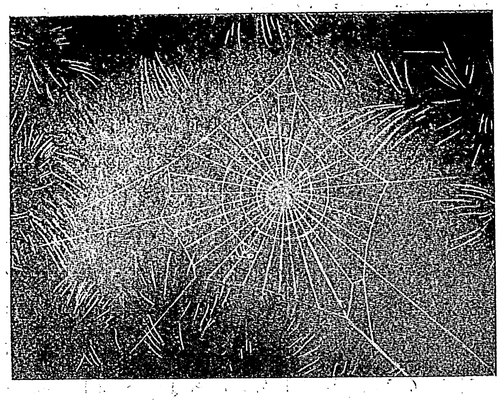

(৪)

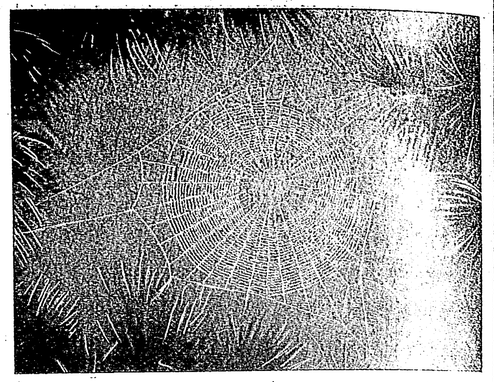

(৫)

(বামদিকে) জালের মধ্যস্থল হইতে চিত্রে বর্ণিত আকারে সূতা বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে।
(দক্ষিণদিকে) মাকড়সার সম্পূর্ণ তৈয়ারী জাল

যন্ত্র সাহায্যে নিয়মিত স্থানে সূতায় ক্ষুদ্র বর্ত্তুলগুলি লক্ষিত হয়।

নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে মাকড়সা কয়েক প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। শত্রুর আক্রমণের সম্ভবনা থাকিলে শত্রুর নাগালের বাহিরে উচ্চ স্থানে জাল রচনা করে। কয়েক জাতীয় মাকড়সা জলের তলদেশে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে। যে সকল শত্রুর আক্রমণ বেশী সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে মাকড়সা ছলনা অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করে। মাকড়সার এই ছলনা অবলম্বন কৌশল লক্ষ্য করিবার বিষয়। শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা পাগুলি গুটাইয়া নির্জীব হইয়া পড়িয়া থাকে। শত্রু একটু অন্যমনস্ক হইলেই সুযোগ বুঝিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

কয়েকজাতীয় মাকড়সা অপরিণত অবস্থাতেও বহু দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতে সক্ষম হয়। এক জাতীয় মাকড়সা খুব উচ্চস্থান হইতে সূতা বুনিয়া শূন্যে ঝুলিতে থাকে। পরে বাতাসের সাহায্যে বহুদূরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া যায়। শুনা যায় এই জাতীয় মাকড়সা না কি শত শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে এইভাবে আকাশ পথে ভ্রমণ করে। উচ্চস্থানের বায়ুমণ্ডলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য একবার আমেরিকায় এ্যারোপ্লেন সাহায্যে ২৫০০ ফিট উচ্চে আরোহণ করা হইয়াছিল। এ্যারোপ্লেনটি মাটিতে অবতরণ করিলে দেখা যায় ছাকনির ঝিল্লিতে জালসহ বহু মাকড়সা রহিয়াছে। এইরূপ ঘটনার খবর বহুবার পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা বহুবার দেখা গিয়াছে যে, রঞ্জিত মাকড়সার জাল শূন্য হইতে নিক্ষেপ করায় বেশীর ভাগ সময়ে জালটী শতমাইল দূরবর্ত্তী স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

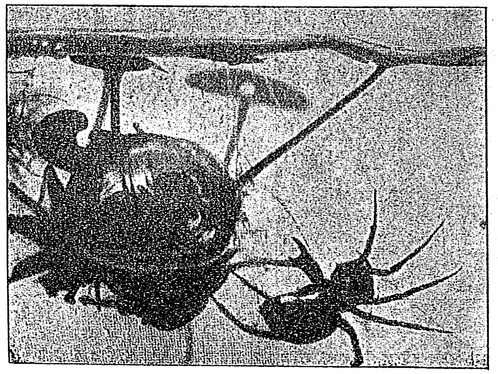

জলের তলদেশে দুইটি জলবাসী স্ত্রী মাকড়সার যুদ্ধ

প্রায় সকল জাতীয় মাকড়সাই গৃহ নির্ম্মাণ করে। কিন্তু জলবাসী মাকড়সার বাসগৃহ নির্ম্মাণ কৌশল অতুলনীয়। জলবাসী মাকড়সা জলের তলদেশে বেশীর ভাগ সময়েই অতিবাহিত করে। এই জাতীয় মাকড়সার গাত্র লম্বা লম্বা লোমে আবৃত। এই লম্বা লোমগুলি বাতাসের বুদ্বুদ ধারণ করিতে পারে এবং জলের তলদেশে অবস্থানকালে মাকড়সাকে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে সাহায্য করে। জলবাসী জাতীয় মাকড়সার মধ্যে জলদস্যু মাকড়সার

(Pirate spider) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের শরীর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমে আবৃত থাকায় শরীরের ভিতর জল প্রবেশ করিতে পারে না। জলদস্যু মাকড়সা জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারে, ডুবিয়া যায় না। বিপদের সঙ্কেত বুঝিতে পারিলেই ইহারা জলের তলদেশে ডুবিয়া যায়; এবং বিপদ না যাওয়া পর্য্যন্ত জলীয় উদ্ভিদের মধ্যে আত্মগোপন করে। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বায়ু এইরূপ সুব্যবস্থায় থাকে যে, জলের নীচে প্রয়োজনীয় সময়ে বুক (বইয়ের আকারে ইহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের যন্ত্র) লোমে সামান্য আঘাত দ্বারা অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে পারে। ভেলা-তৈয়ারকারী জলবাসী মাকড়সা (Raft spider) কতকগুলি ছোট পাতা রেশমী সূতা দ্বারা বাঁধিয়া একটি ছোট ভেলা প্রস্তুত করিয়া লয়। এই ভেলার উপর চড়িয়া জলের চারিধারে পরিভ্রমণ করে এবং শীকারের খোঁজ পাইলেই জলের উপর লাফাইয়া শীকার নিজ আয়ত্তের মধ্যে লইয়া আসে। প্রকৃত জলবাসী মাকড়সা বলিতে Silver spindle জাতীয় মাকড়সাই বুঝায়। এই জাতীয় মাকড়সার দৈহিক গঠন টেকোর (spindle) ন্যায় দেখিতে। জলে ডুব দিবার সময়ে

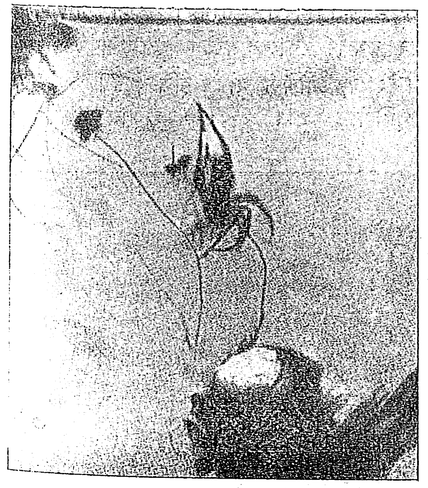

জলবাসী মাকড়সা পশ্চাৎভাগের পা সাহায্যে বৃহৎ জল বুদ্বুদ আনিতেছে

ইহাদের গাত্রস্থ লোমের বায়ু বুদ্বুদ শরীরে রৌপ্য বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করে। জলবাসী মাকড়সা জলের তলদেশে রেশমী গুটী প্রস্তুত করে এবং বাসগৃহ বায়ুপূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। কিরূপ কৌশলে ইহারা তাহাদের বাসগৃহ বায়ুপূর্ণ করে তাহা দেখিয়া তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

জলবাসী মাকড়সার গৃহের ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে বায়ু বুদ্বুদ।

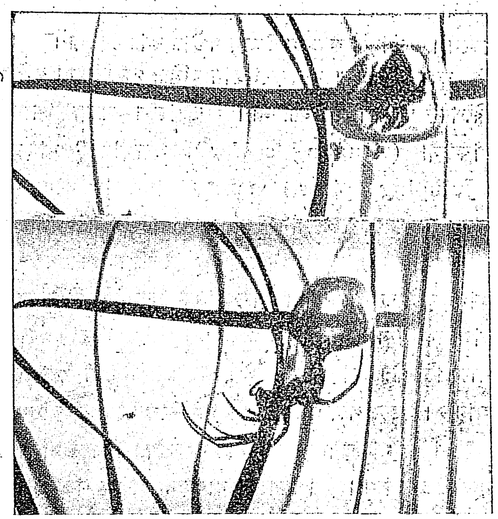

উপরিভাগের চিত্রে জলবাসী মাকড়সার বাসগৃহ। সূক্ষ্ম রেশম দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করায় গৃহ মধ্যস্থ মাকড়সাকে চিত্রে দেখা যাইতেছে। (নিম্ন চিত্রে) মাকড়সা বাসগৃহ হইতে বাহির হইতেছে

বাসা নির্ম্মাণের পূর্ব্বে জলের কিছু তলদেশে জলীয় উদ্ভিদের সহিত মাকড়সা কতকগুলি সূতা বাঁধিয়া লয়। এই সূতাগুলিকে নোঙ্গরের কাছি (Mooring lines) বলা চলে। মাকড়সা সেই সূতাগুলির সাহায্যে সাঁতার কাটিয়া জলের উপরিভাগে বায়ু আনিবার জন্য উপস্থিত হয় এবং লোমপূর্ণ পায়ের সাহায্যে দেহের জল দূর করিয়া শীঘ্রই দেহ শুষ্ক করিয়া লয়। এইরূপ অবস্থায় দেহের লম্বা লোম সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে বায়ু বুদ্বুদ সংগ্রহ করিয়া বুদ্বুদ ফাটিয়া যাইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ জলে ডুবিয়া যায়। মাকড়সাকে বায়ুর উপরিভাগে ঠেলিয়া তুলিতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও মাকড়সা নোঙ্গর কাছি অবলম্বনে জলের তলদেশে গমন করিতে সক্ষম হয়।

নির্ব্বাচিত জলীয় উদ্ভিদের নিকট পৌছিয়া মাকড়সা অদ্ভুত কৌশলে বায়ু বুদ্বুদগুলিকে ঠিকমত যথাস্থানে রেশমী

সূতার মধ্যে বাঁধিয়া ফেলে। বুদ্বুদ আকারে বড় হইলে মাকড়সা পশ্চাৎভাগের পা সাহায্যে উহাকে জলের তলদেশে আনিয়া থাকে। এইরূপে প্রচুর বায়ু সংগ্রহ হইলে মাকড়সা ঠিকমত গৃহ নির্ম্মাণে মন দেয়। সূক্ষ্ম সূতার দ্বারা বায়ু বুদ্বুদগুলিকে চারিধারে অতি কৌশলে নিপুণতার সহিত বুনিয়া উদ্ভিদের উপর একটি ছোট তাঁবু তৈয়ার করিয়া ফেলে। তাঁবুটীকে জলে উজ্জ্বল ঘণ্টার ন্যায় দেখায়।

কয়েক জাতীয় মাকড়সা জাল বুনিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ উৎসাহিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ শিকারী মাকড়সা (Hunting spider), লম্ফদানপটু মাকড়সা (Jumping spider) ও উল্‌ফ মাকড়সার নাম করা যায়। অনেকের অনুমান ইহাদের পায়ের গঠনপ্রণালী অন্য জাতীয় মাকড়সার পা হইতে কিছু ভিন্নরূপ হওয়ায় ইহারা জাল বুনিতে পারে না। কিন্তু এই অনুমান ঠিক নহে। বাগানবাসী মাকড়সার (Garden spider) ন্যায় ইহাদের পায়ে চিরুণীর দাঁড়ার মত নখ নাই। পাগুলি লোমদ্বারা আবৃত। তবে লম্ফদানপটু মাকড়সা একেবারে গৃহহীন নহে। এই জাতীয় মাকড়সা জাল বুনিয়া তাহাদের ডিমের থলিটিকে লুক্কায়িত রাখে। শিকারী মাকড়সা কিন্তু ডিমগুলিকে রক্ষার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। এই জাতীয় স্ত্রী মাকড়সা ডিমের থলিটী পায়ের সাহায্যে শরীরের নিম্নদেশে রাখিয়া সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে সময়ে সময়ে ডিমের থলিটী তাহাদের অধিকারচ্যুত হয়। এইরূপ অবস্থায় স্ত্রী মাকড়সার মধ্যে দুঃখজনিত সকল লক্ষণই প্রকাশ পায়। কিন্তু অপরের ডিমের থলি তাহাকে দেওয়া হইলে সে সন্তুষ্ট চিত্তে অদৃশ্য হইয়া যায়। অপরের ডিম হইলেও স্ত্রী মাকড়সা নিজের ডিমের মতই ইহার উপর যত্ন লয়। লম্ফদানপটু মাকড়সার (Jumping spider) শিকার ধরিবার কৌশল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের দেহে সাদা ও বাদামী রংয়ের ডোরা পর্য্যায়ক্রমে অঙ্কিত। ইহার জন্য ইহাকে জেব্রা মাকড়সা নামেও অভিহিত করা হয়। লম্বায় ইহারা ½ ইঞ্চি। মার্চ্চের প্রথম হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত মশা মাছির সচরাচর যেখানে অবস্থান সেখানে ইহাদের আবির্ভাব হয়। এই জাতীয় মাকড়সার আটটি চক্ষু তিনটি সারিতে অবস্থিত। চক্ষুগুলি চওড়া কপালের উপর সজ্জিত এবং মনে হয় অন্যান্য জাতীয় মাকড়সা অপেক্ষা ইহাদের চক্ষু শক্তিশালী। কারণ ইহারা এক ফুট দূরের ছায়া কিম্বা আলো দেখিতে সক্ষম হয়। লম্ফদানপটু মাকড়সা একই সময়ে প্রতি তিন ইঞ্চি মাপে প্রায় ১২ বার লম্ফদান করিতে পারে। লম্ফদানপটু মাকড়সার আর এক জাতীয় বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়। ইহাদের দেহে বিচিত্র বর্ণের সুন্দর সমাবেশ দেখা যায়। এই জাতীয় মাকড়সার পশ্চাৎভাগ গাঢ় সবুজবর্ণ এবং দেহের কৃষ্ণবর্ণ লোমের কয়েক স্থানে সবুজ ও সুবর্ণ বর্ণের লোম ইহাদের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করে।

পৃথিবীতে প্রায় ২০,০০০ হাজার শ্রেণীর মাকড়সা

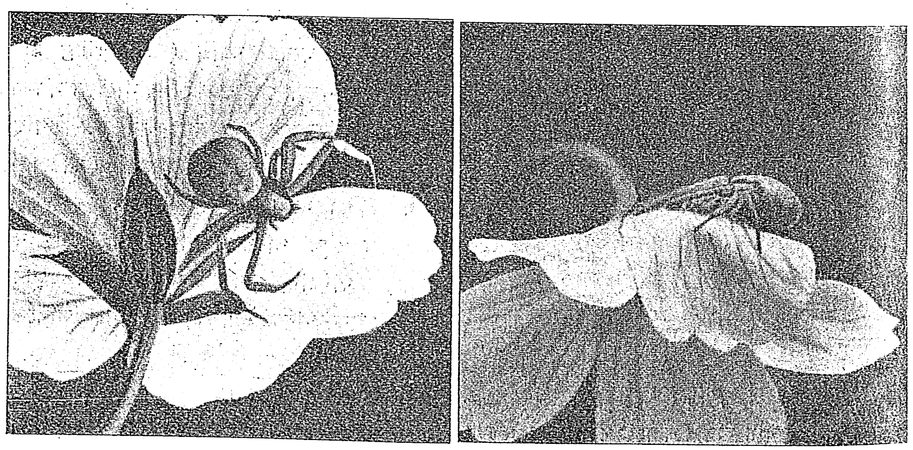

কাঁকড়া মাকড়সা শিকারের জন্য ফুলের পশ্চাৎভাগে অপেক্ষা করিতেছে

পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের গর্ত্তবাসী মাকড়সা প্রায় আট বৎসরকাল জীবিত থাকে।

মাকড়সা জাতীর মধ্যে ইহারাই দীর্ঘজীবী বলিয়া পরিচিত। কাঁকড়া জাতীয় মাকড়সাও লম্ফ দিয়া তাহাদের শিকার

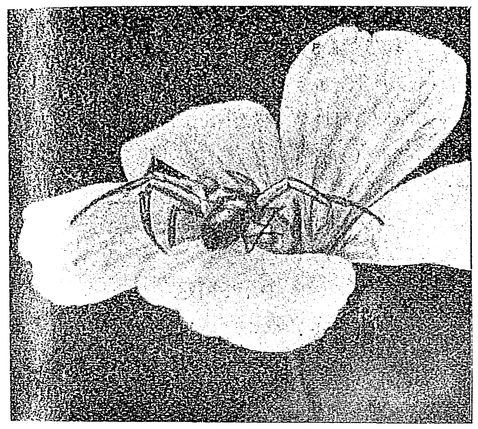

কাঁকড়া মাকড়সা ও তাহার শিকার

ধরিয়া থাকে। ইহাদের গায়ের বর্ণ হলুদে এবং উপরিভাগ নানা বর্ণে চিত্রিত। কাঁকড়া মাকড়সা ফুলের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং মৌমাছি কিম্বা প্রজাপতি মধু সংগ্রহে ফুলের উপর বসিলেই লাফাইয়া শিকারকে ধরিয়া ফেলে। Misumena Vatia নামে পরিচিত মাকড়সা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই জাতীয় মাকড়সাকে বহুরূপী বলা যাইতে পারে। ইহারা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী গায়ের রং নানা বর্ণে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। যে কোন রংয়ের ফুলের উপর বসিয়া প্রায় তিনদিনের মধ্যে সেই ফুলের রংয়ের ন্যায় নিজের শরীরের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। ইহাদের আক্রমণ করিলে কাঁকড়ার ন্যায় চারিদিকে পাশ দিয়া হাঁটিয়া যায়। আলোর ন্যায় সুন্দর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া এক জাতীয় মাকড়সা 'আলো তৈয়ারকারী' মাকড়সা নামে পরিচিত হইয়াছে।

মাকড়সার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্ত্রী ও পুরুষ মাকড়সার মিলনকাল (Mating Season). সকল জাতীয় পুরুষ মাকড়সা স্ত্রী মাকড়সা অপেক্ষা দৈহিক গঠনে খর্ব্ব। মিলনকালে পুরুষ মাকড়সা স্ত্রী মাকড়সার বাসস্থান এবং সঙ্কেত পাঠাইবার সূতার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। পরে বাসস্থান ও সঙ্কেত পাঠাইবার সূতা খুঁজিয়া পাইলে বাসস্থানের কিছু দূরে পুরুষ মাকড়সা অপেক্ষা করে; এবং স্ত্রী মাকড়সা রচিত যে রেশম সূতাগুলি তাহার রচিত জালের মধ্যস্থলে সংলগ্ন থাকিয়া সঙ্কেত পাঠাইবার কার্য্য করে সে সূতাগুলিকে সম্মুখ ভাগের পা দ্বারা টানিয়া স্ত্রী মাকড়সাকে নিজের আগমনের সঙ্কেত পাঠায়। এই আগমন সঙ্কেত পাঠাইবার কারণ স্ত্রী মাকড়সার নিকট সুপরিচিত। স্ত্রী মাকড়সা সঙ্কেত পাইয়া সূতার উপর দিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া আসে। পুরুষ মাকড়সা পূর্ব্ব হইতেই তাহার লম্বা পায়ের দ্বারা সঙ্কেত সূতা অনুভব করিয়া বুঝিতে পারে স্ত্রী মাকড়সার নিকট হইতে সে কিরূপ ব্যবহার পাইবে। সেই অনুযায়ী তাহাকে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকিতে হয়।

বিপদসঙ্কুল মিলনে ব্যাপৃত হইতে হয় বলিয়াই পুরুষ মাকড়সার এইরূপ সঙ্কোচের কারণ। তাহার দিক হইতে কোনরূপ ত্রুটী থাকায় যে কেবল স্ত্রী মাকড়সার ভালবাসা হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হয় এমন নহে, বেশীর ভাগ

আলো তৈয়ারকারী মাকড়সার গৃহ

সময়েই স্ত্রী মাকড়সার হস্তে তাহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। পুরুষ মাকড়সা মিলনের পূর্ব্বে স্ত্রী মাকড়সাকে সন্তুষ্ট করিতে

না পারিলে স্ত্রী মাকড়সা তাহাদিগকে খাইয়া ফেলে। মাকড়সার জীবন-ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিয়া থাকে।

এইরূপ বিপদ জানিয়াও পুরুষ মাকড়সা কামচরিতার্থের নিমিত্ত স্ত্রী মাকড়সার জন্য অপেক্ষা করে। ভীতিপ্রদর্শনের নিমিত্ত নানারূপ অঙ্গভঙ্গি, লজ্জাশীলতার ভাব দেখাইবার পর স্ত্রী মাকড়সা উভয়ের মিলন ঘটাইবার অনুমতি দেয়।

কিন্তু মিলনের শেষেও পুরুষ মাকড়সার জীবন নিরাপদ থাকে না। স্ত্রী মাকড়সার সঙ্গ শীঘ্র ত্যাগ করিতে না পারিলে ইহারা পুনরায় তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে পুরুষ মাকড়সার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে এক জাতীয় মাকড়সা স্ত্রী মাকড়সাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য মিলনের পূর্ব্বে মক্ষিকা শিকার করিয়া লইয়া যায়। স্ত্রী মাকড়সা রাগান্বিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে পুরুষ মাকড়সা শিকারটী তাহাকে উপহার দেয়; এবং স্ত্রী মাকড়সা যখন তাহা ভক্ষণে ব্যস্ত থাকে সে সময় সুযোগ বুঝিয়া পুরুষ মাকড়সা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লয়। এই জাতীয় স্ত্রী মাকড়সারা সুতার বন্ধনে পুরুষ মাকড়সাকে বন্দী করিয়া জীবন্ত অবস্থায় নিজ বাসস্থানের নিকট ঝুলাইয়া রাখে।

প্রকৃতির এই কুহেলীকাপূর্ণ জগতে কত আশ্চর্য্য ঘটনাই না সংঘটিত হইতেছে আর মানুষ তাহার অদম্য অধ্যবসায় সহকারে প্রকৃতির উন্মোচন খুলিয়া ফেলিয়া তাহার ইতিহাসের কথা লিখিয়া যাইতেছে।

নিশিকান্ত করকমলে

সৌম্য

হে তরুণ!
মানুষেরে জানিবার মাঝে কিছু নাই,
তুচ্ছ সে সঞ্চয়।
মানুষেরে জানিবার মাঝে
রয়েছে মনের পরিচয়—অম্লান আনন্দঘন।
বৃথা শ্রম তারে দেখিবার
তারো চেয়ে বড় সত্য—প্রাণ ভ'রে
ভালোবাসিবার অধিকার পাওয়া।
কে মোরে দিবে সে-অধিকার—
স্মরণের তীক্ষ্ণসূত্রে সমন্বিত মণির ঝঙ্কার?
তাই দেবে তাই দেবে হে অচেনা কবিবন্ধু মোর
তোমারে আমার সাথে বেঁধে দেবে অভিন্ন সে-ডোর
বিশ্বপরিচয়হীন।
বাহিরের পরিচয়মাঝে
অবগ্নিত উচ্ছ্বাসের নিষ্প্রাণ ছন্দই শুধু বাজে
নয়নের কল্পিত স্পর্ধায়।
অন্তরের প্রশান্ত সন্ধ্যায়
জাগে এই মরমের মুক্তিগন্ধে বিকশিত রজনীগন্ধায়
সলজ্জ সরমরাগে
সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার পানে তাকাবার সাধ।
বলো বন্ধু, সেথা তারে না-জানার ক্ষুদ্র পরমাদ
থাকে কি সুদৃঢ় হ'য়ে?
তোমারে জানার আগে তাই
তোমারে মানার পালা সমাপ্ত হয়েছে··জেগে নাই
তোমার আমার মাঝে ব্যবধানে লুপ্তির নির্দেশ।
তব মধুচক্র তরে মর্ম মোর হ'ল নিরুদ্দেশ।

সৌম্যেন্দ্র করকমলে

নিশিকান্ত

হে কিশোর!
সঙ্গোপন উৎস হ'তে তোমার ছন্দের গতি প্রবাহিত,
অন্তরের কেন্দ্রাসীন অন্তরতমের আত্মসমাহিত
মগ্নতায় অবিচ্ছিন্ন তোমার চেতনা।
তাই তব বিকাশের পুলকবেদনা
বিমৌন রহস্যলীন গভীরের মর্মবিমন্থিত

আনন্দতরঙ্গময় ধ্বনির সংঘাতে
ওঠে উচ্ছলিয়া
অনাহত রাগিণীর সঙ্গীতলীলাতে
তোলে ঝলকিয়া
চিরন্তন অমলতা, স্বচ্ছ সুররাশি।
আত্মার অম্বর হ'তে উঠিল উদ্ভাসি'
তোমার প্রকাশচন্দ্র, হে সৌম্যেন্দ্র! দাও নির্ঝরিয়া
মাধুরীমদির তব: জ্যোতির আসব:
সোমরসধারা।
জীবনের মৃন্ময়তা আলোক-উৎসব
লভি' আত্মহারা
হোক সেই দীপ্তরসে, জীবন তোমার
প্রতি পলে হোক অবিশ্রান্ত—অনিবার
বিকাশের প্রেরণায়। ধরণীর যে-কালের কারা

মৃত্যুর প্রাচীর রচি' রুধিয়া দাঁড়ায় মর্ম-অমরতা,
বিচূর্ণ করুক তারে তব অভীপ্সায় দৃপ্ত দুর্দমতা,
অবগ্নিত প্রগতির অভিলাষ তব
বিলাক মর্ত্যের পথে নিত্য নব নব
উপলব্ধ বৈভবের অনশ্বর প্রোজ্জ্বল বারতা।

অনশন ত্যাগ—

আন্দামান ও দমদম জেলের যে ৮৯ জন রাজনৈতিক বন্দী বিনাসর্ত্তে এবং অবিলম্বে মুক্তির দাবী জানাইয়া গত ৭ই জুলাই তারিখে অনশন অবলম্বন করিয়াছিলেন, সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় গত ৩রা আগষ্ট সন্ধ্যায় তাহার অবসান হইয়াছে। এই সংবাদে শুধু বাঙ্গলা নয়, সমগ্র ভারত আশ্বস্ত হইবে।

পূর্ণ চারি সপ্তাহকাল অনশন চলিয়াছিল। দুই জন বন্দীর অবস্থা এমনই সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। অন্যান্য সকলের শক্তিও অতি দ্রুত কমিয়া আসিতেছিল। তাঁহাদের জীবনের কথা ভাবিয়া দেশের লোকের উদ্বেগের আর অন্ত ছিল না। বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল পুরাতন আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টি দিয়া দেখিতে এবং আমলাতান্ত্রিক বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে অভ্যস্ত। এই সর্ব্বত্যাগী অপরাধীদের তাঁহারা সাধারণ অপরাধী ছাড়া আর কিছু বলিয়া ভাবিতে পারেন না। কিন্তু দেশবাসী ইঁহাদিগকে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও সস্নেহ দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন।

চারি সপ্তাহ অনশনের দ্বারা যে দৃঢ়তা ইঁহারা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং গান্ধীজির প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই অনুরোধ করিয়াও রাজনৈতিক বন্দীগণকে অনশন ত্যাগ করাইতে পারেন নাই। তাঁহারা দৃঢ় পণ করিয়াছিলেন যে, হয় তাঁহাদের প্রত্যেকের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনাসর্ত্তে মুক্তির আশ্বাস দিতে হইবে, নয় তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত অনশন চালাইবেন।

মহাত্মা ও পণ্ডিতজি—

রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ও মুক্তিসমস্যা লইয়া ভারতের ছোট-বড় সকল নেতাই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি এবং পণ্ডিত জওহরলালের উক্তির আলোচনার প্রয়োজন আছে।

বাঙ্গলার রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য গান্ধীজি অনেক সময় ও শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। বস্তুত বাঙ্গলার যে বহু সহস্র রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার চেষ্টাতেই সম্ভব হইয়াছে। এবারেও অন্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তিনি নিজে আসিতে না পারিলেও শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বন্দীদের অনশন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া বাণী পাঠাইয়াছিলেন। বাঙ্গলার বন্দী মুক্তি সমস্যাকে সর্ব্বভারতীয় সমস্যায় পরিণত করিয়া প্রত্যেক কংগ্রেসী প্রদেশে মন্ত্রী-সঙ্কট উপস্থিত করা হইবে কি-না, সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মতামত তিনি প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটি যদি এ বিষয়ে মন্ত্রী-সঙ্কট সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব গ্রহণও করেন, তথাপি অবিলম্বে বন্দী-মুক্তি হইবে না। সত্যাগ্রহের ফলাফলও সময়-সাপেক্ষ। গান্ধীজির এই উক্তিতে বাঙ্গালী সন্তুষ্ট হয় নাই। তিনি যদি বাঙ্গালাকে এ অবস্থায় কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতি গ্রহণের উপদেশ দিতেন, বাঙ্গালা তথা ভারত তাহা সানন্দে গ্রহণ করিত এবং তাহাই গান্ধীজির উপযুক্ত কার্য্য মনে করিত। গান্ধীজির বর্ত্তমান উক্তি পাঠ করিলে মনে হয়—পূর্ব্বের গান্ধীজি আর এই গান্ধীজি এক ব্যক্তি নহেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যে উক্তি করিয়াছেন তাহা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। বাঙ্গলাতে কংগ্রেসী-মন্ত্রিত্ব যে সম্ভব হয় নাই তাহার জন্য ম্যাকডোনাল্ডের বাঁটোয়ারা যেমন দায়ী, পুণা চুক্তিও ততখানি না হইলেও অনেকখানি দায়ী। কিন্তু সে কথা যাক। বাঙ্গলাতে কংগ্রেসী-মন্ত্রিত্ব সম্ভব হয় নাই বলিয়াই অন্য প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মন্ত্রিত্ব ত্যাগের জন্য ব্যাকুলতার যে কদর্য্য ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব

রাজন্যগণকে জানাইয়াছেন, শক্ত থাকিও। কিছুতেই যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিও না। আমরা জানি না, যে ভারত গবর্ণমেণ্ট এতকাল জিন্না সাহেবকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য পণ্ড করিবার অস্ত্ররূপে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া আসিলেন, শেষ বয়সে তাঁহারা জিন্না সাহেবের প্রাণে দাগা দিবেন কি-না।

লর্ড সিংহের দাবী—

পরলোকগত লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পুত্র লর্ড অরুণ সিংহ গত ১৩ বৎসর হইতে পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় তাঁহার ন্যায়সঙ্গত আসনের জন্য দাবী জানাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার লর্ড উপাধি গ্রহণে কোন বাধা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু লর্ড সভায় আসন দিতে আপত্তি উঠিয়াছিল। এতদিন পরে লর্ড সভার প্রিভিলেজ কমিটি তাঁহার দাবী সমর্থন করিয়া তাঁহাকে লর্ড সভায় আসন গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন।

কর্ম্মচ্যুতদের পুনর্নিয়োগ—

রাজনৈতিক কারণে যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়াছিলেন, অথবা যাঁহারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছিলেন বিহার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে পুনর্নিযুক্ত করিতেছেন। যাঁহাদের নূতন করিয়া কাজ করিবার বয়স নাই, তাঁহাদের পূর্ব্বতন কর্ম্মকালের হিসাবে কাহারও জন্য পেন্সন, কাহারও জন্য গ্র্যাচুয়িটির বন্দোবস্ত হইয়াছে। গ্র্যাচুয়িটির টাকা তাঁহারা এককালীন পাইবেন। ইহার দ্বারা শুধু যে পূর্ব্বতন সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি সুবিচার করা হইল তাহাই নয়, কংগ্রেসের জয় ঘোষণাও করা হইয়াছে।

পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা হইবে, কি যথা নিয়মে নূতন নির্ব্বাচন হইবে ভারত সরকার সে সম্বন্ধে কিছুদিন হইতেই বিবেচনা করিতেছিলেন। যদি যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে অনর্থক নূতন নির্ব্বাচন করিয়া লাভ নাই। আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পরিষদের নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল অন্তে নূতন নির্ব্বাচনই বিধেয়। সম্প্রতি বড়লাট ঘোষণা করিয়াছেন, ১লা অক্টোবর হইতে আরও এক বৎসরের জন্য পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা হইল। ইহাতে বোঝা যাইতেছে, আগামী বৎসরের শেষের দিকে তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের আশা করেন। সমস্ত ভারতের বিরোধিতা সত্ত্বেও এইরূপ আশা করিবার হেতু কি আমরা জানি না। হয় তাঁহারা ভারতের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া গায়ের জোরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করিবেন, অথবা তাঁহারা বিশ্বাস করেন আগামী বৎসরের মধ্যে বিরোধিতার ভিত্তি শিথিল হইবে। আসলে ব্যাপারটা কি হইবে, তাহা কালক্রমে জানা যাইবে। কিন্তু আপাততঃ দেখা যাইতেছে, এক মিঃ জিন্নার অন্তঃকরণ ছাড়া আর কোথাও বড়লাটের ঘোষণায় বিন্দুমাত্রও তরঙ্গ ওঠে নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ—

গত ১লা আগষ্ট হইতে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের নূতন এসিয়াটিক বিলের প্রতিবাদে প্রবাসী ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ ঘোষণার কথা ছিল। এ বিষয়ে তাঁহারা গান্ধীজির আশীর্ব্বাদও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনের দুই দিন আগে গান্ধীজি অকস্মাৎ সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তিনি আশা করেন, সত্যাগ্রহের আর আবশ্যক হইবে না। ভারত ও বৃটিশ সরকারের সহিত ইউনিয়ন সরকারের যে আলোচনা চলিতেছে তাহাতেই ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাইতে পারে। পাওয়া গেলে তাহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সময়ে আকস্মিকভাবে স্থগিত রাখিবার নির্দ্দেশ সত্যাগ্রহের পক্ষে যে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি—

১৯৩৯ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রথম সাধারণ সভায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয় এবং নূতন কার্য্যকরী সমিতি ও কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনের অধিকার তাঁহাকে প্রদান করা হয়। তদনুসারে সেই সময় তিনি কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিলে শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় খাদি-দলের সহযোগে তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—ঐ সমিতি গঠনের সময় সুভাষচন্দ্র তাঁহাদের

সহিত পরামর্শ করেন নাই, কাজেই উহা পক্ষপাতদুষ্ট হইয়াছে। কার্য্যকরী সমিতির প্রথম বৈঠকেই তাঁহারা আবার এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন যে, সমিতি বৈধভাবে গঠিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের সে আপত্তি অধিকাংশের ভোটে বাতিল হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় হইতেই শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের দল বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির বিরুদ্ধে নানাভাবে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ প্রচার করিতেছিলেন। সুভাষচন্দ্রই যখন এই সমিতি গঠনের জন্য দায়ী, তখন তাঁহাকেই ইহার জন্য বিরুদ্ধ সমালোচনা ও অপবাদ সহ্য করিতে হইয়াছিল। কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের মৌলিক অধিকার গণতন্ত্রসম্মতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাংগ্রেস কমিটীর ১৭৫ জন সদস্যের অনুরোধে গত ২৬শে জুলাই কমিটীর এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় কমিটীর ৫৪৬জন সদস্যের মধ্যে ২৬৩জন উপস্থিত ছিলেন; নূতন যে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহাতে ২৩শে এপ্রিল তারিখে সুভাষচন্দ্র কর্ত্তৃক গঠিত সমিতির প্রায় সকল সদস্যই আছেন; কেবল শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ের দলের সদস্য সংখ্যা আরও কম করা হইয়াছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে যে দলের সদস্য সংখ্যা অধিক, কার্য্যকরী সমিতি গঠনের সময় সমিতিতে সেই দলেরই সমস্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন ইহাই সাধারণ অলিখিত নিয়ম। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালার সকল দলের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্য ২৩শে এপ্রিল সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন দেখিলেন যে তাহার ফলে সর্ব্বদাই কার্য্যে বাধাপ্রাপ্ত হইতে হয়, তখন তিনি শুধু নিজের দলের অধিকাংশ সদস্য লইয়া নূতন সমিতি গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার ফলে বিরুদ্ধবাদীরা সুভাষচন্দ্রের উপর দোষারোপ করিলেও আইনের দিক দিয়া সুভাষচন্দ্রের কার্য্যের নিন্দা করিবার কিছু নাই। অধিকন্তু ২৬শে জুলাই গঠিত নূতন কার্য্যকরী সমিতিতেও তিনি বিরুদ্ধবাদী দলের নেতাদের গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এখন সমিতিতে বিরুদ্ধবাদী দলের সদস্য সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছে যে সমিতির কার্য্যে আর তাঁহাদের বাধা দিবার সুবিধা নাই। সেই অভিমানে শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ নেতারা নূতন সমিতির সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন। পুরাতন সদস্যদিগের স্থানে যে সকল নূতন সদস্য গৃহীত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রীদলভুক্ত। কাজেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিক দিয়াও কোনরূপ আপত্তি হইবার কারণ নাই। যাঁহারা সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াও সংখ্যাল্পতার জন্য অভিমানে পদত্যাগ করিলেন, তাঁহারাই গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেসী কাউন্সিলারগণের মধ্যে অধিকাংশই সুভাষচন্দ্রের দলভুক্ত। সে জন্য ১৯৩৯-৪০ বর্ষের প্রথমে অর্থাৎ গত ১লা এপ্রিলের পর কর্পোরেশনের বিভিন্ন কার্য্যের জন্য যে সকল ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী গঠিত হইয়াছিল, সেগুলিতে সুভাষচন্দ্রের দলের সদস্য সংখ্যাই অধিক ছিল। শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ের দল ঐ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন না; কিন্তু কংগ্রেসী কাউন্সিলারগণের ভোটে ঐ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনেরও কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেজন্য শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় তথা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের দলের কয়েকজন কাউন্সিলার কর্পোরেশনের মনোনীত ও শ্বেতাঙ্গ কাউন্সিলারগণের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতায় পূর্ব্ব-গঠিত ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন করিয়া ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী গঠন করিয়াছেন। ইহার ফলে কর্পোরেশনে কংগ্রেসের প্রভাবই ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য এবং বাঙ্গালায় কংগ্রেসের সম্মান রক্ষার ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত আছে। তাঁহার মত লোককে ব্যক্তিগত ক্রোধের বশে এইভাবে কংগ্রেসের বিরোধী শ্বেতাঙ্গ দল ও মনোনীত কাউন্সিলারদিগের সহিত সহযোগিতা করিতে দেখিয়া বাঙ্গালী মাত্রই ক্ষুব্ধ হইয়াছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যখন সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের পর সাগ্রহে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার স্বরূপ বুঝা গিয়াছিল—কাজেই তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্যে বিস্ময় প্রকাশের আমরা কোন কারণ দেখি না। কিন্তু কর্পোরেশনের অন্যান্য যে সকল কংগ্রেসদলভুক্ত কাউন্সিলার বিধানবাবুর দলে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বা যে কোন কংগ্রেসী কাউন্সিলার জনমত পদদলিত করিয়া পরে তাহার যত কৈফিয়তই প্রদান করুন না কেন, কলিকাতার করদাতারা তাঁহাদের কিছুতেই ক্ষমা করিবে না।

মিথ্যা। বন্দী-মুক্তি সম্বন্ধে মন্ত্রী-সঙ্কট সৃষ্টি করিবার যে দাবী বাঙ্গলা হইতে উঠিয়াছিল তাহা শেষ পন্থা হিসাবেই উঠিয়াছিল। নহিলে পন্থজিকে মন্ত্রীর মসনদ ত্যাগ করাইয়া বাঙ্গলার কোন লাভ হইত না। বাঙ্গলার সংবাদপত্রগুলি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের যে ভাবে সমর্থন করিয়া থাকে, তাহা দেখিলেই তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিতেন।

মন্ত্রী-সঙ্কটের দ্বারা ঈপ্সিত ফল লাভ সম্ভব হইত কি-না সে স্বতন্ত্র কথা। তর্কের খাতিরে যদি পণ্ডিতজির যুক্তি মানিয়াই লওয়া যায় যে, ফল হইত না, তথাপি যে সময়ে বাঙ্গলার ৮৯জন বন্দী জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া, সেই সময়ে কি তাহা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিবার অনুকূল সময়! ভগবানের ইচ্ছায়, সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় অনশনের অবসান হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁহার অসময়োচিত উক্তির দ্বারা বন্দী-মুক্তির কতখানি ক্ষতি করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

কৃষির আয়কর বিল—

গত ৪ঠা আগষ্ট আসামের উভয় আইন সভার যুক্ত বৈঠকে (৬৫-৫৬) অধিক ভোটে কৃষি আয়কর বিল পাশ হইয়াছে। এই ব্যাপারে সমগ্র আসামে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

এই আয়কর সাধারণ কৃষককে স্পর্শ করিবে না। যাহাদের কৃষি আয় ৩০০০৲ টাকার অধিক কেবল তাহাদেরই উপর এই আয়কর বসিবে। ইহার প্রধান আঘাতটা চা-বাগানের মালিকদের উপরই পড়িবে। সেই কারণে তাঁহাদের মধ্যেই বিক্ষোভ বেশী হইয়াছে। চা-বাগানের মালিকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করেন। যেখানে সাধারণ কৃষকেরা বিঘা প্রতি গড়ে বারো আনা হারে কর দিয়া থাকে, সেখানে চা-বাগানে খাজনার হার মাত্র ছয় আনা। ইহারও উপর শোনা যাইতেছে, কোন কোন চা-বাগানের মালিক যত জমি বন্দোবস্ত লইয়াছেন, ভোগ করেন তাহার চেয়ে বেশী জমি।

নূতন একটা কর স্থাপনের কারণ বিবৃত করিয়া জানানো হইয়াছে যে, রাজস্বের ঘাট্‌তি পূরণের জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল কৃষকের খাজনা শতকরা ৫০৲ টাকা মকুব করিয়াছেন, বন্যায় সাহায্য করিয়াছেন এবং শীঘ্রই আফিম বর্জ্জনে হাত দিতে চলিয়াছেন। নূতন ব্যবস্থার কল্যাণে গবর্ণমেণ্টের প্রায় ২০ লক্ষ টাকা আয়বৃদ্ধি হইবে।

সকলের চেয়ে পরিতাপের বিষয়, এই কৃষি আয়কর বিলকে উপলক্ষ করিয়া আসামে মন্ত্রীমণ্ডল ধ্বংসের একটা ব্যাপক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ইউরোপীয় দল। অন্যান্য দলের এই বিলের বিরুদ্ধে বলিবার কিছু ছিল না। কিন্তু মন্ত্রিত্বের লোভে তাঁহারা ইউরোপীয় পতাকা-তলে সমবেত হইয়াছিলেন। কিছু কিছু দল ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়াছিল এবং যাহাতে কোরাম না হয় সে চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

সিংহলে ভারতীয় বিতাড়ন—

সিংহলে ভারতীয় বিতাড়ন সম্বন্ধে যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে ভারতে গভীর বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পন্থা গ্রহণের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিগত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই স্থির হয় যে, কোন প্রকার সংঘর্ষমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে আপোষ-মীমাংসার জন্য একটা শেষ চেষ্টা করা হইবে। সেজন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে কংগ্রেসের দূতরূপে সিংহল পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়।

পণ্ডিতজি সিংহল গিয়া মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইতিমধ্যে ভারত সরকারও এই সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সিংহলের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি করিতে দৃঢ়ভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই সময় শোনা গেল, সিংহল গবর্ণমেণ্ট নীতি হিসাবে ভারতীয় বিতাড়নের সঙ্কল্প ত্যাগ না করিলেও এই ব্যবস্থায় সম্মত হইয়াছেন যে, যে কয়েক সহস্র ভারতীয় শ্রমিক স্বেচ্ছায় সিংহল ত্যাগের জন্য আবেদন করিয়াছে তাহারা ছাড়া আর কাহাকেও বিতাড়িত করা হইবে না। বিতাড়ন আইন পাশ হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে না।

এখন শোনা যাইতেছে, এ সমস্ত ভূয়া কথা। সিংহল ভারতের মৈত্রী প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। পণ্ডিতজির দৌত্য

সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। সিংহল গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় বিতাড়নে দৃঢ়সঙ্কল্প। মাদ্রাজের শ্রমমন্ত্রী জানাইয়াছেন, প্রত্যহই সিংহল হইতে বহুসংখ্যক ভারতীয় দিনমজুর মাদ্রাজ আসিতেছে। ভারত সরকারের পরামর্শ অনুসারে মাদ্রাজ সরকার স্থির করিয়াছেন, কোন অনিপুণ শ্রমিককে (unskilled labour) মাদ্রাজ বন্দর হইতে সিংহলের জাহাজে চড়িতে দেওয়া হইবে না।

ইহা ভারতীয় শ্রমিককে অপমানের হাত হইতে রক্ষা করিবার একটা উপায় হইতে পারে, কিন্তু সিংহলের ভারতীয় শ্রমিক সমস্যা সমাধানের পন্থা নয়। তাহার জন্য অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। ত্রিবন্দ্রমে সিংহলের শুল্ক নারিকেল-শস্য বর্জ্জনের একটা আন্দোলন ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আশা করি, কংগ্রেস এ সম্বন্ধে এবার জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জ্জনের অনুরূপ একটা ব্যাপক এবং কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিবেন।

বোম্বাইয়ে মদ্যবর্জ্জন—

গত ১লা আগষ্ট হইতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট মদ্য-বর্জ্জন নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই জন্য বিশেষ পুলিশ ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছে। ৩১শে জুলাই তারিখের শেষ মদ্যপান রাত্রির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে একটি "করুণ প্রহসন" বলা চলিতে পারে। ইউরোপীয়দের, সৈন্যদের এবং যে সকল ব্যক্তির পক্ষে মদ্য ত্যাগ অসম্ভব, মদ্য ত্যাগ করিলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে, তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের প্রতিপক্ষ জুটিয়াছে দুইটি সম্প্রদায়—পার্শী ও মুসলমান। পার্শীগণ বোম্বায়ের সব চেয়ে ধনীসম্প্রদায়। সেখানে মদের ব্যবসায় তাহাদের একচেটিয়া বলিলেও হয়। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহাদের আর্থিক ক্ষতি হইবে বলিয়াই তাহারা উত্তেজিত হইয়াছে। সংসারে দুর্নীতির প্রশ্রয়কারী ব্যবসা অবলম্বন করিয়া অনেকে জীবন ধারণ করে। জীবিকানির্ব্বাহের উপায় বলিয়া তাহার সাত খুন মাপ হইতে পারে না। পার্শীসম্প্রদায়ের ক্রোধ অহেতুক। জীবিকা-নির্ব্বাহের সাধুবৃত্তির অভাব নাই। তাহাদের টাকা আছে। স্বচ্ছন্দে সেইরূপ কোন ব্যবসায়ে তাহারা আত্মনিয়োগ করিতে পারে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্রোধও সম্পূর্ণ অহেতুক। ব্যক্তিগত ভাবে কোন কোন মুসলমান মদ্যপান করিলেও সম্প্রদায় হিসাবে তাহারা পানদোষ হইতে মুক্ত। এ বিষয়ে মুসলমান-শাস্ত্রের কঠোর নিষেধ আছে। সেই নিষেধ হজরত মহম্মদ কেবল তাঁহার মতানুবর্ত্তী বিশেষ একটা সম্প্রদায়ের জন্যই করেন নাই, আপামর সাধারণের জন্যই করিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া মদ্যপান নিবারণের কোন ব্যবস্থা মুসলমান সাধারণের সমর্থনীয়। কিন্তু রাজনীতি আজ ধর্ম্মনীতি এবং ধর্ম্মবোধকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। যেহেতু এ ব্যবস্থা কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন, সুতরাং পয়গম্বরের ঈপ্সিত কার্য্যকেও বাধা দিতে হইবে। সেজন্য একটা যুক্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা এই যে, মদ্যপান নিবারণের জন্য রাজস্বে যে ঘাটতি পড়িবে তাহা সম্পত্তির উপর নূতন একটা কর বসাইয়া পূরণ করা হইবে। একদল মুসলমান আপত্তি করিয়াছেন, তাঁহারা যখন মদ্যপান করেন না, তখন সম্পত্তি-করের বোঝা বহিতে নারাজ।

শুধু ধর্ম্মনীতি কেন, সাধারণ যুক্তির দিক দিয়াও ইহা অচল। একটা প্রদেশের কোন একটা অংশে দুর্ভিক্ষ অথবা বন্যা হইলে রাজকোষ হইতে অর্থ-সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সেই ঘাটতি পূরণের জন্য যদি একটা বিশেষ করের আবশ্যক হয়, অন্য অংশের লোকেরা কি আপত্তি জানাইয়া বলিতে পারে যে, আমাদের অংশে যখন দুর্ভিক্ষ হয় নাই, তখন আমরা এই নূতন কর দিব কেন? বলাবাহুল্য সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির প্ররোচনাতেই একদল মুসলমান এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করিতেছেন। সুখের বিষয়, সে বিরোধিতা ইহার মধ্যে অনেক কমিয়া আসিতেছে।

মিঃ জিন্নার আশঙ্কা—

মিঃ জিন্নার আশঙ্কা হইয়াছে, কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিবে। আশঙ্কা হইবার কথা বটে। চিরকাল কংগ্রেসের অসহযোগ নীতিকেই তিনি তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। এখন যদি কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে সহযোগিতা করে, তাঁহার ব্যবসা একেবারেই মাটি হইয়া যাইবে। তাই তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন, কাজটা ভাল হইবে না। কংগ্রেসের সঙ্গে কোন আলোচনা করিও না। আর দেশীয়

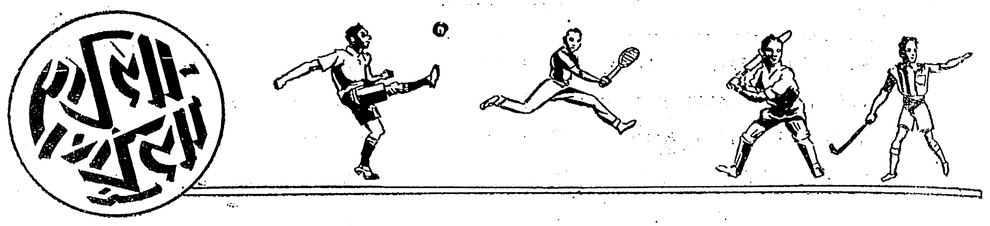

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৩ই জুলাই শীল্ড খেলা আরম্ভ হয় জল-কাদায় এবং ৫ই আগষ্ট শুক্‌নো মাঠে সমাপ্ত হয়েছে। ঐ দিনই মোহনবাগান তাদের লীগের শেষ খেলায় এরিয়ানদের হারিয়ে লীগ-চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

১৯৩৯ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হ'লো কলিকাতা পুলিশ ২-১ গোলে কাষ্টমসকে হারিয়ে। ১৯৩৭ সালে পুলিশ শীল্ড ফাইনালে ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেডের কাছে ৪-১ গোলে পরাজিত হয়। ফাইনালে কাষ্টমসের এটি চতুর্থ পরাজয়। ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে গর্ডনের কাছে ২-০ ও ১-০ গোলে এবং ১৯১৫ সালে ক্যালকাটার সঙ্গে প্রথম দিন ড্র ক'রে দ্বিতীয় দিনে ৩-০ গোলে তারা পরাজিত হয়েছিল। কাষ্টমস ক্যামারোনিয়ান্সকে ২-১ গোলে এবং পুলিশ ই বি আরকে ১-০ গোলে হারিয়ে এবার ফাইনালে ওঠে। কে ভট্টাচোর্য্যের ক্যামারোনিয়ান্সের বিরুদ্ধে বিজয়সূচক গোলটি এবারে শীল্ডে সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় গোল নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ই বি আরের দুর্ভাগ্য তারা পর পর দু'বার শীল্ডের সেমিফাইনালে হেরে গেল। তারা যাদের কাছে হেরেচে, তারাই দু'বার শীল্ড পেয়েচে।

১৯৩৯ সালের শীল্ড বিজয়ী পুলিশদল ছবি—হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড

পুলিশের শীল্ড-বিজয় অনেকটা অপ্রত্যাশিত। সকলেই আশা ক'রেছিলো কাষ্টমস শীল্ড পাবে; দল হিসাবেও কাষ্টমস তাদের চেয়ে শক্তিশালী। ফাইনালে পুলিশের কোন খেলোয়াড় ব্যক্তিগতভাবে অসাধারণ না খেললেও তাদের দলগত সহযোগিতা ছিল ভাল। ফরওয়ার্ডরা সুযোগ-সন্ধানী এবং তাদের আক্রমণে বিশেষ তীব্রতা ও ক্ষিপ্রতা ছিল। সুযোগ পেলেই তারা গোলে সট করেছে। কাষ্টমসের খেলা প্রথম কয়েক মিনিট ব্যতীত অত্যন্ত নিরু হয়েছে। এরকম খেলা তারা কোন কালে খেলে নি

সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব পরিলক্ষিত হ'য়েছিলো। একমাত্র ডেভিস, কে ভট্টাচার্য্য ও হজেসের খেলা ভাল হয়েছিল। ডেভিসের খেলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হাফ ব্যাকদের অকৃতকার্য্যতাই কাষ্টমসের পরাজয়ের কারণ। আউটে নীল ও রাদারফোর্ডের খেলা অত্যন্ত হতাশজনক। রেণ্টনের অভাবে কাষ্টমসের আক্রমণ ভাগ দুর্ব্বল ছিল। প্রথমার্দ্ধ শেষ হবার ঠিক আগেই রবিন্সনের পাশ থেকে মায়ার্স প্রথম গোলটি করে। বিশ্রামের পর খেলা আরম্ভ হ'লে কাষ্টমস খুব চেপে ধরে। কে ভট্টাচার্য্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও উপযুক্ত সহযোগিতার অভাবে অকৃতকার্য্য হন, খেলাও তাঁর নামোচিত

খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ছবি—আনন্দবাজার

হয় নি। তিনি বার বার রাদারফোর্ডকে পাশ করেছেন, আর সে সব বলগুলি নষ্ট করেছে, কিন্তু সীম্যানকে মোটেই খেলান নি। ১৮ মিনিট খেলা চলবার পরে সীম্যান ডিফোণ্টসের কাছ থেকে বল পেয়ে ফাষ্ট-টাইম সটে গোলটি পরিশোধ করেন। কিছুক্ষণ পরে পুলিশ আবার অগ্রবর্ত্তী হয়, ডিমেলোর একটা সট জার্ডিন ঠিক মত ধরতে না পারায় বলটি পায় টেম্পণ্টন এবং জার্ডিনকে পরাভূত করে। শেষ সময়ে ভট্টাচার্য্য বহু চেষ্টা ক'রেও গোলটি পরিশোধ ক'রতে পারেন নি।

পুলিশ ঃ—জে মিলস ; ওয়েক ও ওয়াট ; ফলস, রবিন্সন ও জে ডি মেলো ; টেম্পণ্টন, জোনস, পি ডি মেলো, মায়ার্স ও এলেন।

কাষ্টমস ঃ—জার্ডিন ; ডেভিস ও হজেস ; স্মিথ, রেবেলো ও ভৌমিক ; নীল, ডিফোণ্টস, সীম্যান, কে ভট্টাচার্য্য ও রাদারফোর্ড।

এবারের সেমি ফাইনালের দলগুলি স্থানীয় হওয়ায় দর্শক সমাগম বেশী হয়নি। শীল্ডের একটা খেলাও উচ্চাঙ্গের বা আকর্ষণীয় হয়নি। মিলিটারী দল যে তিনটি এসেছিল, তারাও অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়। বাইরের সিভিল দলের ভেতর ই আই আর এবং বি এন আর ভাল ছিল। বি এন আর পুলিশের কাছে হেরে যায়, আর ক্যালকাটা ভাগ্যক্রমে ই আই আরের কাছে জেতে। বর্ত্তমান বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দুর্ভাগ্যক্রমে এরিয়ান্সের কাছে প্রথম দিন গোল শূন্য ড্র করে দ্বিতীয় দিনে এক গোলে হেরে যায়। গোলটি সম্পূর্ণ অফ-সাইড থেকে হয়েছিল। ব্যাক ও গোলরক্ষক কেহই গোল রক্ষা করতে চেষ্টা করেন নি। অফ-সাইড ভেবে চুপ করে থাকা উচিত নহে, যতক্ষণ না রেফারি বাঁশী বাজায়। প্রথম দিন এরিয়ান্স ভাল খেলে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন মোহনবাগান তাদের চেয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট খেলেও হেরে যায়। তারাই সর্ব্বক্ষণ বিপক্ষকে চেপে থাকে ; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কিছুতেই গোল করতে পারে না। গোল রক্ষক এম দাস অত্যাশ্চর্য্যরূপে গোল রক্ষা করেছিল। লীগের শেষ খেলায় মোহনবাগান এই এরিয়ান্সকেই ৩-১ গোলে হারিয়েছিল। গতবারের বিজয়ী ইষ্ট ইয়র্ক দলে পূর্ব্বের অনেক খেলোয়াড় ছিল না। তারা প্রথম দিন ড্র করে দ্বিতীয় দিনে অপ্রত্যাশিতভাবে এক গোলে হেরে যায় বি এন আরের কাছে। অনেকের মতে গোলটি সন্দেহজনক। ইষ্ট ইয়র্কের গোলরক্ষক ওয়াটকে রেল দলের খেলোয়াড় ধাক্কা দেওয়ায় বল তার হস্তচ্যুত হয়। ধাক্কাটি ন্যায্য হ'য়েছিলো কিনা সে সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে।

১৯৩৯ সালের আই এফ এ শীল্ডের ফলাফল ঃ

প্রথম রাউণ্ড	দ্বিতীয় রাউণ্ড	তৃতীয় রাউণ্ড	চতুর্থ রাউণ্ড	সেমি-ফাইনাল	ফাইনাল
কানপুর ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ০	১ম ইষ্ট ইয়র্কস্ রেজিমেণ্ট ২-০	বি এন আর ০	পুলিস এ সি ৩	পুলিস এ সি ১	পুলিস এ সি ২
বি এন আর এথলেটিক এসোঃ ৯	বি এন আর ২-১				
মহারাণা ক্লাব (গৌহাটী) ০	পুলিস এ সি ৪	পুলিস এ সি ২			
পুলিস এ সি ১	১ম রয়েল ফুসিলিয়ার্স ১				
রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ১	রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট এসোঃ ০	ক্যালকাটা এফ সি ২	ক্যালকাটা ১	ইবি আর ০	
ফরিদপুর ক্লাব ০	ক্যালকাটা এফ সি ২				
	ছোটনাগপুর স্পোর্টিং এসোঃ ০	ই আই আর ১			
	ই আই আর ৫				
	কাণ্টনমেণ্ট জিমখানা (পেশোয়ার) (আসে নি)		হবিগঞ্জ টাউন ০		
	মহমেডান স্পোর্টিং (মৈমনসিং) (আসে নি)				
	২য় বর্ডার রেজিমেণ্ট ০	হবিগঞ্জ টাউন			
	হবিগঞ্জ টাউন ক্লাব ১				
	ই বি আর স্পোর্টস্ ক্লাব ১	ই বি আর (১—০—২)	ই বি আর ৩		
	স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব ০				
	জর্জ্জ টেলিগ্রাফ ২-১	কলিকাতা রেঞ্জার্স (১-০-০)			
	কলিকাতা রেঞ্জার্স ২-২				
	১ম ডি সি এল আই (W. O)	ডি সি এল আই ০	ওয়ারী ০		
	চিটাগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোঃ (Scr.)				
হাওড়া ইউনিয়ন (০-০)	ওয়ারী ক্লাব ১	ওয়ারী ক্লাব ১			
ওয়ারী ক্লাব (ঢাকা) (০-১)	ডালহৌসী এ সি ০				
ভবানীপুর ক্লাব (০-২)	ভবানীপুর ক্লাব ০	কাষ্টমস্ এ সি ২	কাষ্টমস্ ১	কাষ্টমস্ ২	
অরোরা এথলেটিক এসোঃ (০-০)	কাষ্টমস এ সি ১				
কুমিল্লা স্পোর্টিং এসোঃ (১-০)	উড়িষ্যা ক্লাব ১	দিল্লী এফ এ ০			
উড়িষ্যা ক্লাব (১-৩)	দিল্লী ফুটবল এসোসিয়েশন ৪				
বরিশাল ফুটবল এসোসিয়েশন ২	বরিশাল এফ এ ০	ক্যামারোনিয়ান্স ২	ক্যানারোনিয়ন্স ১	ক্যানারোনিয়ান্স ১	কাষ্টমস্ ১
এলায়েন্স ক্লাব (গয়া) ০	১ম ক্যামারোনিয়ান্স ১				
বেঙ্গল আর্টিলারী ২	বেঙ্গল আর্টিলারী ০	কুলটি ক্লাব ১			
বনবিহারী ডিষ্ট্রিক্ট এসোঃ ১	কুলটি ক্লাব ১				
	খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট এসোঃ (১—৩)	খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট এসোঃ ০	এরিয়ান্স ০		
	কুমারটুলি ইন্‌ষ্টিটিউট (১—০)				
	এরিয়ান্স ক্লাব (০—১)	এরিয়ান্স ক্লাব ৪			
	মোহনবাগান ক্লাব (০—০)				

ভারতবর্ষ

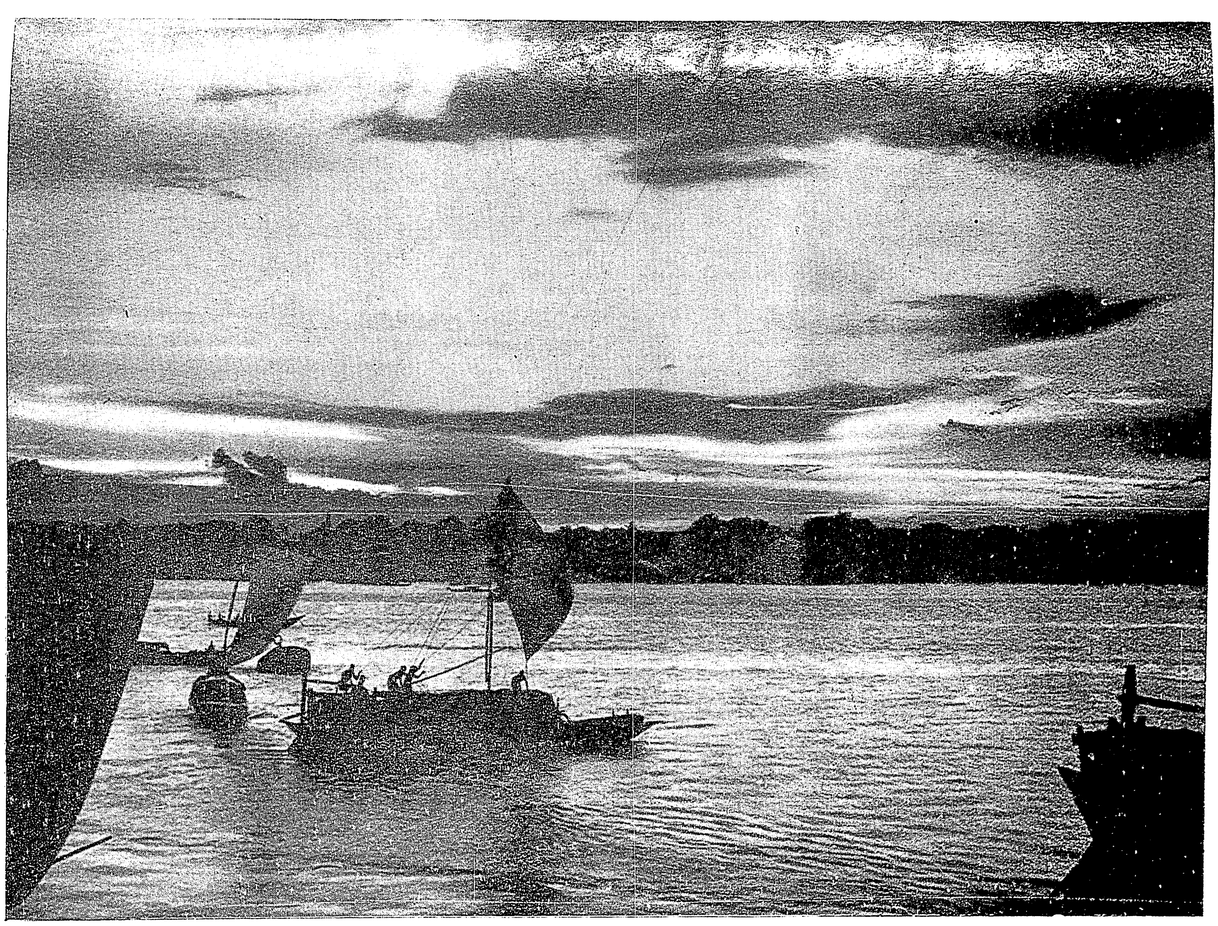

গঙ্গাবক্ষে সন্ধ্যা

শিল্পী—পান্না সেন, কলিকাতা

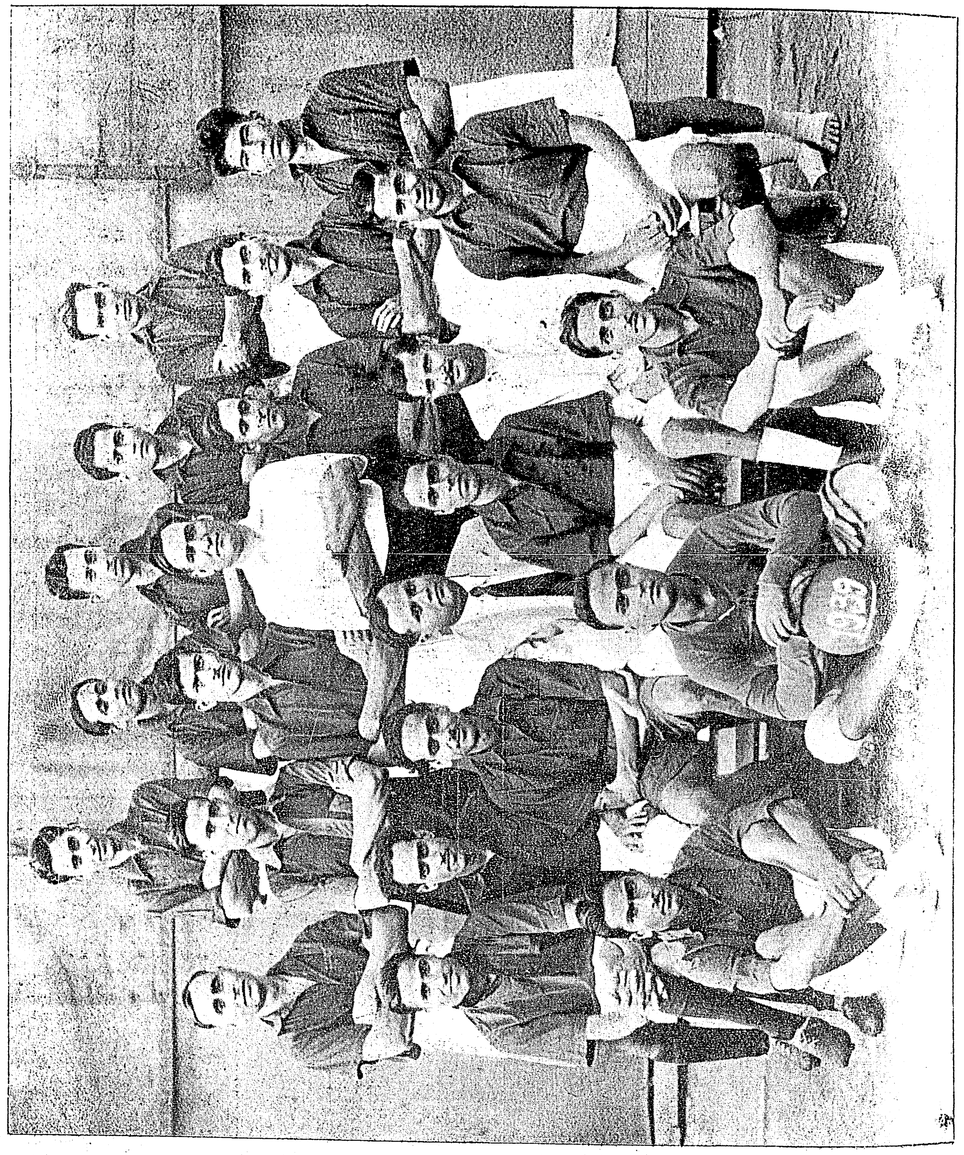

১৯৩৯ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

ছবি—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড

চ্যারিটি ক্ষতিগ্রস্ত ঃ

বৃষ্টির জন্য এবং জনপ্রিয় কোন দল সেমিফাইনালেও উঠতে না পারায় চ্যারিটিতে টাকা উঠেছে অত্যন্ত কম। শীল্ড ফাইনালও দর্শনীয় হয় নি। দর্শকসমাগমও হ'য়েছিল অন্যবারের অপেক্ষা কম। ফাইনালে বিক্রয়লব্ধ অর্থ উঠেছিল মাত্র ৬৪৮০॥৵০ আনা।

লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ঃ

১৯১৫ সালে মোহনবাগান প্রথম বিভাগ লীগে খেলতে অনুমতি পান। এতকাল পরে ১৯৩৯ সালে তাঁরা লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে দেশবাসীর আনন্দবর্দ্ধন করেছেন। তাঁদের লীগ চ্যাম্পিয়ন প্রাপ্তিতে ভারতবাসীরা শান্তভাবে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত ইহাকে ঢক্কানিনাদিত করা হয় নাই। কর্পোরেশনও নীরব আছেন পৌর সম্বর্দ্ধনা দেন নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ীদের যেমন দিয়েছিলেন।

১৯১৬, ১৯২০, ১৯২১ ও ১৯২৫ সালে মোহনবাগান রানার্স আপ্ হতে পেরেছিল। ১৯২৫ সালে মাত্র এক পয়েন্টের জন্য তাদের লীগ ফস্কে যায়, ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯২০ ও ১৯২১ সালে দু' পয়েন্টের ব্যবধান হয় ক্যালকাটা ও ডালহৌসীর সঙ্গে। এবার মোহনবাগান হেরেছে মাত্র একটা ম্যাচে। তাদের বিপক্ষে গোল হয়েছে মাত্র ৭টা, তারা সপক্ষে গোল করেছে ৩১টা। সর্ব্বাপেক্ষা কম গোল খেয়েছিল ক্যালকাটা ১৯২২ সালে, মাত্র একটা। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কম গোল হয়েছিল ৮টা ১৯৩৬ সালে, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ২০টা ১৯৩৮ সালে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গোল দিয়েছে ডারহাম্‌স্ ১৯৩১ সালে ৫১টা।

লীগ কাপ

মোহনবাগানের বিশেষ কৃতিত্ব যে তারা প্রথম থেকেই অগ্রগামী থাকে, একদিনের জন্যও তাদের কেহ অতিক্রম করতে পারে নি। বিদ্রোহী দলদের আই এফ এ কর্ত্তৃক লীগ থেকে বিতাড়নের জন্য তাদের সঙ্গে দু'টি খেলা বাকী থাকে, কিন্তু তার ফলাফলের উপর চ্যাম্পিয়ন পাবার কোন ব্যতিক্রম ঘটতো না।

মোহনবাগানের পক্ষে কে কয়টি গোল দিয়েছেন ঃ—এ রায়চৌধুরী ১১, এম ব্যানার্জ্জি ৮, এস মিত্র ৪, এস গুঁই ২, এস চৌধুরী ২, এস দেব রায় ২, ডাঃ এস দত্ত ১, বি মুখার্জ্জি ১।

মোহনবাগান হারিয়েছে ও ড্র করেছে ঃ—রেঞ্জার্সকে ১-০, ২-০, বর্ডারসকে ১-০, ০-০, পুলিশকে ২-০, ৫-০, কাষ্টমসকে ৩-০, ০-০, এরিয়ান্সকে ২-০, ৩-১, ক্যামারোনিয়ন্সকে ২-০, ১-০, ক্যালকাটাকে ১-০, ১-০, ই বি আরকে ০, ১-১,

এম ব্যানার্জী

এ রায় চৌধুরী

বিমল মুখার্জী

কে দত্ত

মহমেডানকে ০-০, ০-০, কালীঘাটকে ১-১, ইষ্টবেঙ্গলকে ২-১, ভবানীপুরকে ১-০ ; হরেছে ভবানীপুরের কাছে ২-১।

প্রথম বিভাগ লীগের ফলাফল ঃ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বি	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	২৪	১৬	৭	১	৩১	৭	৩৯
রেঞ্জার্স	২৪	১৬	২	৬	৩৬	১৯	৩৪
কাষ্টমস	২৪	১০	৮	৬	২৭	২১	২৮
ই বি আর	২৪	১১	৬	৭	৩৪	২৮	২৮
মহমেডান	২৪	১০	৫	৯	৩১	১৫	২৫
ইষ্টবেঙ্গল	২৪	৮	৮	৮	২৩	১০	২৪
কালীঘাট	২৪	৯	৫	১০	৩১	১৯	২৩
ক্যামারোনিয়ান্স	২৪	৭	৮	৯	২০	২৮	২২
পুলিশ	২৪	৮	৫	১১	২০	৩৬	২১
এরিয়ান্স	২৪	৭	৪	১৩	২১	৩৭	১৮
ভবানীপুর	২৪	৭	৪	১৩	২২	৩৯	১৮
ক্যালকাটা	২৪	৩	৮	১৩	২৩	৪০	১৪
বর্ডার রেজিমেণ্ট	২৪	৫	৪	১৫	১৯	৩৯	১৪

লীগ চ্যাম্পিয়ান ঃ রেষ্ট

সন্তোষ মেমোরিয়াল ফণ্ডের সাহায্যার্থ লীগ চ্যাম্পিয়ান ও রেষ্টের খেলায় লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ৩-১ গোলে পরাজিত হয়। জল কাদায় পরিপূর্ণ মাঠে মোহনবাগান তাদের নিয়মিত খেলোয়াড় না বা তে পারে নি। ব্যাকে ডাঃ এস দত্ত, হাফে প্রেমলাল ও বেণীপ্রসাদ এবং ফরওয়ার্ডে এস্ মিত্র খেলেন নি। এঁরা সকলে খেললে খেলার ফলাফল কি হ'তো বলা যায় না। রেষ্টের ড্রি স ক ল অত্যাশ্চর্য্য খেলে একাই তিনটি গোল ক রে ন। দু'টি গোল চ্যাম্পিয়নদলের ব্যাকের দোষে হয়। টিকিট বিক্রয় করে মাত্র ২৯৩৪৶০ টাকা পাওয়া গেছে। রেষ্টের পক্ষে ড্রি স ক ল, মুলার, প্র সা দ, আলিহোসেন ও এন ঘোষের খেলা ভাল হ'য়েছিল। রায়চৌধুরীর গোলটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মোহনবাগান—কে দত্ত ; পি শেঠ ও পি চক্রবর্ত্তী ; বিমল, কে ব্যানার্জ্জী ও আর সেন ; ওঁই, মোহিনী ব্যানার্জ্জি, রায়চৌধুরী, প্রেমলাল ও এস চৌধুরী।

রেষ্ট—আলিহোসেন (ভবানীপুর) ; রে (ক্যামারোনিয়ান্স) ও আর্ল (রেঞ্জার্স) ; জে লামসডেন (রেঞ্জার্স), রেবেলো (কাষ্টমস) ও কক্স (বডার্স) ; এন ঘোষ (এরিয়ান্স), জে মিলস্ (পুলিশ), ড্রিসকল (ক্যামারোনিয়ান্স), মুলার (রেঞ্জার্স) ও কে প্রসাদ (এরিয়ান্স)। রেফারী—এম আমেদ।

রেফারিং ঃ

রেফারিং যথাপূর্ব্বং দোষশূন্য হয় নি। কয়েকটি বিশেষ ত্রুটি শীল্ড খেলা পরিচালনায় লক্ষিত হয়েছে। রেফারি গিলসন কাষ্টমসের বিপক্ষে ভবানীপুরের একটি ন্যায়সঙ্গত গোল অফসাইডের অজুহাতে নাকচ করে দেন। জার্ডিন সামসেরের সট্ ফেরালে সেই বল পেয়ে সাম্পাঞ্জি গোল করেন। ফাইনালে জার্ডিনের কাছ থেকে ঠিক ঐ রকমে বল পেয়ে টেম্পলটন দ্বিতীয় গোলটি করে, কিন্তু সেটি অফসাইড হয় নি।

দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ছবি—আনন্দবাজার

মোহনবাগানের বিপক্ষে এরিয়ানের গোলটি সম্পূর্ণ অফসাইড থেকে হয়। এ দিন কর্পোরাল হ্যাণ্ডিসাইড রেফারি ছিলেন।

ক্যামারোনিয়ন্স বরিশাল এফ এর বিরুদ্ধে পেনালটি পায় এবং গোল করে ; কিন্তু রেফারি পুনরায় সট করতে আজ্ঞা দেন, কারণ গোলরক্ষক নড়েছিল। দ্বিতীয়বারের সটে গোল হয় না। আইনে পরিষ্কার ভাবে আছে,—for an infringement of this nature the benefit should go to the offended and the goal should have been allowed although the goalkeeper was guilty of an offence by moving his feet at the time the kick was being taken. রেফারি হচ্ছেন লেফ্‌টেনেণ্ট থ্রাসার, ইষ্টইয়র্ক রেজিমেণ্টের।

ইষ্টইয়র্ক ও বি এন আরের রিপ্লে খেলায় রেফারি বদলের কারণ কি ? দ্বিতীয় দিনের রেফারি ছিলেন ইউ চক্রবর্ত্তী। বি এন আরের পক্ষে গোলটিও গোলযোগ বিহীন নয়। ইষ্ট ইয়র্কের গোলরক্ষক ওয়াট was charged when he was in the process of clearing the ball. The ball had dropped from his hands and R. Carr shoved it into the net. গোলরক্ষককে ধাক্কা দেওয়া সম্বন্ধে আইন এই,—"The goal-keeper shall not be charged excepting when he is holding the ball or obstructing an opponent or when he has passed out-side the goal area".

কাষ্টমস ও ক্যামারোনিয়ন্সের খেলায় কাষ্টমসের স্মিথের বিপক্ষে 'জাম্পিং' ফাউলের জন্য পেনালটি দেওয়া অনুচিত হয়েছে। স্মিথ ডেভিসকে বল মারতে দিয়ে লাফিয়ে সরে যায়, কোন বিপক্ষের খেলোয়াড় তার দু'তিন গজ দূরেও ছিল না। রেফারি ছিলেন গিলসন।

কাষ্টমস ও ই বি আরের সেমিফাইনাল খেলায় কাষ্টমসের গোলটি অফসাইড থেকে হয়েছিল। রেফারি হ্যাণ্ডিসাইড।

দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা বেশ বেলা থাকতেও অতিরিক্ত সময় খেলান হয় নাই,—মোহনবাগান ও এরিয়ান্সের খেলা, রেঞ্জার্স ও ই বি আরের ও ইষ্ট ইয়র্ক ও বি এন আরের খেলা। কয়দিনই সামরিক রেফারি ছিলেন। অথচ ওয়ারী ও কাষ্টমসের খেলায় জল-কাদার মাঠে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে, ক্ষীণালোকেও ভারতীয় রেফারি অতিরিক্ত সময় খেলিয়ে ওয়ারীর পরাজয় ঘটিয়েছেন।

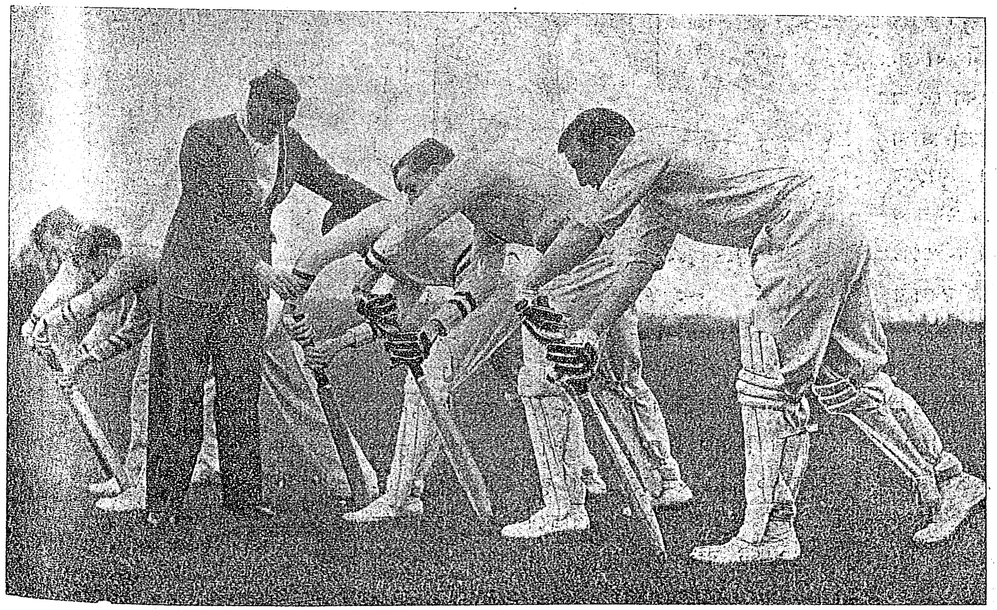

ফ্রাঙ্ক উলি কিংস স্কুলের ছাত্রদের ক্রিকেট শিক্ষা দিতেছেন

সি বি ক্লার্ক

ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড ঃ— ১৬৪ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ও ১২৮ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ— ১৩৩ ও ৪৩ (৪ উইকেট)

খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'য়েছে।

২২শে জুলাই শনিবার, আকাশের অবস্থা ভাল নয়। লাঞ্চের আগে ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা আরম্ভ হ'ল না। বেলা ১-৩০ মিনিটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টসে জিতলেও ইংলণ্ডকে ব্যাট করতে দিলে।

হ্যাটন ও ফ্যাগকে দিয়ে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ২-১৫ মিনিটে আরম্ভ হ'ল। বত্রিশ মিনিট খেলবার পর কোন উইকেট না খুইয়ে ইংলণ্ডের ১১ রান হ'য়েছে তখন বৃষ্টি নাবলো খেলা বন্ধ হ'য়ে গেল। হ্যাটন ও ফ্যাগ যথাক্রমে ৬ ও ২ রান করে নট্ আউট রইলেন। দর্শকসংখ্যা হ'য়েছিল ১১০০০ হাজার।

দ্বিতীয় দিনে খেলা আরম্ভ হ'ল ১২-১৫ মিনিটে ; কিন্তু বৃষ্টির জন্য কয়েকবার খেলা বন্ধ রাখতে হ'য়েছিল। আরম্ভে দর্শক সমাগম হয় ৭০০০ হাজার। পূর্ব্ব দিনের ৬ রানের সঙ্গে মাত্র ৮ রান যোগ হওয়ার সঙ্গেই অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হ'লে খেলা আলো অভাবে ও বৃষ্টির জন্য আধ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকে।

খেলা সুরু হ'লে পর, ফ্যাগ সাত রানে হাইলটনের বলে আউট হ'লেন। লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের ১ উইকেটে ৩৪ রান উঠেছে। উইকেটের অবস্থা খুবই খারাপ। ব্যাটস্‌ম্যানরা স্বচ্ছন্দভাবে খেলতে পারছেন না, কোন রকমে উইকেট রক্ষা করছেন। পেণ্টার ৯ রান করে ক্লার্কের বলে সীলের হাতে ধরা দিলেন। পরের ওভারে মাত্র এক রান যোগ হ'লে হ্যাটন সর্ট-লেগে গ্রাণ্টের বলে ক্যাচ তুললে মার্টিনডেল তাঁকে লুফ্‌লেন। হ্যামণ্ড ও কমটন জুটি হ'য়ে খেলতে লাগলেন। বৃষ্টির জন্য কিছু সময় খেলা বন্ধ রইল। কমটন ৪ রানে আউট হলেন। হার্ডষ্টাফ যোগ দিলেন। হ্যামণ্ড ২২ রানে ক্লার্কের বলে ষ্টাম্পড হ'লেন। উড্ হার্ডষ্টাফের সঙ্গে যোগ দিলেন।

হেডলে

চা-পানের সময় ইংলণ্ডের ৬ উইকেটে ১৫১ রান উঠল। দর্শক-সংখ্যা ১০,০০০ হাজারে দাঁড়াল। হার্ডষ্টাফ ৭৬ রান করে গ্রাণ্টের বলে উইলিয়ামসের কাছে ধরা

গ্রাণ্ট

পড়লেন, ১টা ছয় ও ৭টা চার ছিল। তিনি ১০০ মিনিট খেলেছেন। ইংলণ্ড তাদের ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড করলে।

হার্ডষ্টাফ

বাউস

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হ'ল ষ্টোলমেয়ার ও গ্রাণ্টকে দিয়ে। ৩৫ রানে ষ্টোলমেয়ার ৫ রান করে গডার্ডের বলে তারই কাছে ধরা দিলেন। গ্রাণ্ট ৪৭ রানে গডার্ডের বলে আউট হ'লেন। দিনের শেষে ৩ উইকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৮৫ রান উঠল। হেডলে ১৬ রান করে নট্ আউট রইলেন।

তৃতীয় দিনে আকাশের অবস্থা ভাল। কিন্তু রাত্রের বৃষ্টির জন্য উইকেটের অবস্থা সুবিধা নয়। আরম্ভ সেইজন্য দেরী ক'রে হ'ল। কালকের নট্-আউট ব্যাটসম্যান হেডলে ও সীলে খেলা আরম্ভ করলেন। সূর্য্যের তেজে উইকেট শুকুলেও খেলার অবস্থা ভাল হলো না; খুব তাড়াতাড়ি উইকেট পড়তে লাগল। তা'হলেও হেডলে তৃতীয় পর্য্যায়ে এসে শেষ ব্যাটসম্যানের সঙ্গে খেলে গেলেন। ১৪০ মিনিটে ৫১ রান করে হেডলে বাউসের বলে উডের হাতে আউট হ'লে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ১৩৩ রানে শেষ হ'ল। বাউস মাত্র ১৪ রান দিয়ে ৫টি উইকেট পেলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ছটা উইকেট ৩৩ রানে নিয়েছেন।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করল হ্যাটন ও ফ্যাগ। হ্যাটনের ১৬ রান উঠলে তাঁর এ বৎসরে ২০০০ রান পূর্ণ হলো। চা পানের সময় ৪ উইকেটে ইংলণ্ডের ১০৪ রান উঠেছে। হ্যাটন ১৭ রানে, পেণ্টার ০ রানে, ফ্যাগ ও হ্যামণ্ড ৩২ রানে আউট হ'য়েছেন। ৬ উইকেটে ১২৮ রান উঠলে ইংলণ্ড ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড করলে। কম্‌টন ৩৪ ও রাইট ০ রানে নট্ আউট রইলেন। কন্সট্যাণ্টাইন ৪২ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। জয়লাভ করতে তাদের ১৬০ রান তুলতে হ'বে, সময় মাত্র ৭০ মিনিট ; ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৪ উইকেটে দিনের শেষে ৪৩ রান করলে দ্বিতীয় টেষ্ট অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'ল।

ইংলণ্ড ঃ—হ্যামণ্ড (ক্যাপটেন), পেণ্টার, কম্পটন, উড, বাউস, কপসন, গডার্ড, হ্যাটন্, ফ্যাগ, হার্ডষ্টাফ ও রাইট।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ—গ্রাণ্ট (ক্যাপটেন), ষ্টোলমেয়ার, হেডলে, গোহেজ, সীলে, ক্যামেরন, উইলিয়ামস্, কন্সট্যাণ্টাইন, মারটিনডেল, হেলটন ও ক্লার্ক।

ক্রিকেট মনোনয়ন কমিটি ঃ

ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের বোম্বাই অধিবেশনে মনোনয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে, উহাতে নির্ব্বাচিত হ'য়েচেন ডাঃ কাঙ্গা, সি রামস্বামী এবং জাহাঙ্গীর খাঁ। আশ্চর্য্য হবার কথা, যেখানে প্রফেসার দেওধর ও মেজর নাইডু

লর্ডস মাঠে দর্শকদের সুবিধার জন্য স্কোর কার্ড ছাপা হবার পূর্ব্বে খেলোয়াড়দের নামের তালিকা দেখান হচ্ছে

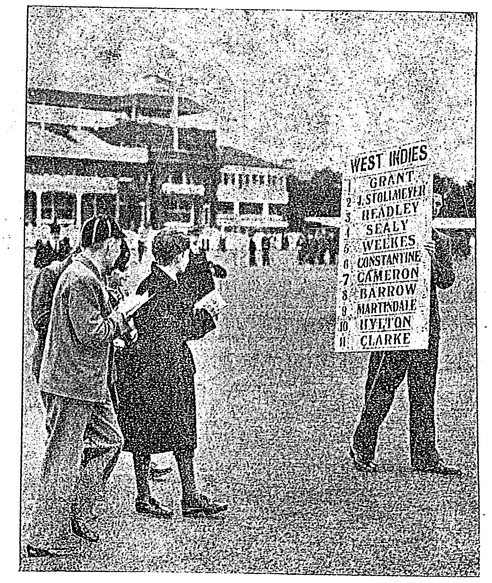

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সেখানে জাহাঙ্গীর খাঁ অথবা রামস্বামী নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচন ভোট দ্বারা সম্পাদিত হয়। মনোনয়ন কমিটিতে নিম্নলিখিত নামগুলিও প্রস্তাবিত হয়েছিল—এ এল হোসী, সি কে নাইডু, এস ডি মেলো, এস এন হাদি ও এ ইউ বোটাওয়ালা। হোসী ৫, নাইডু ৪, এস ডি মেলো ২ ভোট পেয়েছিলেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডে জাহাঙ্গীর খাঁ জিমখানার অধিনায়ক হ'য়ে ভাল খেলেছেন, কিন্তু সেজন্যে মনোনয়ন কমিটির সদস্য হবার যোগ্যতা হয় না। তিনি ভারতের খেলোয়াড়দের খেলা সম্বন্ধে

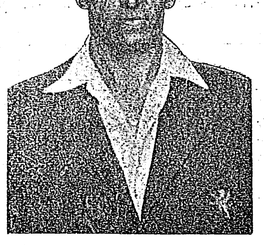

ওয়েলার্ড

বিশেষ পরিচিতও নন। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন ব্রাডম্যানও বহুকাল মনোনয়ন কমিটির সদস্যপদ লাভ করতে পারেন নি। এমন কি অধিনায়কের পদও পেয়েছেন তিনি অতি অল্পদিন। রামস্বামীর যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। তবে ডাঃ কাঙ্গার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

এম সি সি ঃ

নিম্নলিখিত ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নিয়ে আগামী এম সি সি দল গঠিত হ'য়েছে, এঁরা ভারতে খেলতে আসবেন।

হিউম্যান

নিকলস্

জেমস্ ল্যাংরিজ

ওয়্যাট

এ জে হোমস (সাসেক্স ও এম সি সি), জে এম ব্রোকলব্যাঙ্কস (এম সি সি ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়), এইচ টি বার্টলেট (কেমব্রিজ, সারে ও সাসেক্স), এস সি গ্রিফিথ (কেমব্রিজ, সারে ও সাসেক্স), আর এইচ সি হিউম্যান (কেমব্রিজ এবং উষ্টার্স), আর ই এস ওয়্যাট (ওয়ারউইকসায়ার), ই ডেভিস (গ্লামোরগান), এইচ ই ডোলারী (ওয়ারউইকসায়ার), এইচ গিমলেট (সোমারসেট), জেমস ল্যাংরিজ (সাসেক্স), জি এস মোবে (সারে), এম এস নিকলস্ (এসেক্স), জে এফ পার্কার (সারে), এ ডবলউ ওয়েলার্ড (সমারসেট), পিটার স্মিথ (সাসেক্স)।

ভারতবর্ষের ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ পি সুব্বারায়ণ এম সি সির দল গঠন সম্বন্ধে বলেছেন, এম সি সির দলের তালিকা দেখে আমি হতাশ না হয়ে পারি না। কেহই অখ্যা

কার করতে পারবেন না যে এই নির্ব্বাচিত দল ইংলণ্ডের প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক দল নহে। ইংলণ্ড ক্রিকেট খেলায় যে পর্য্যায়ে উঠেছে, তাতে দু'টি সমান শক্তিশালী দল গঠন করতে পারে। কিন্তু এইরূপ নির্ব্বাচিত দলের তালিকায় প্রমাণিত হয়, কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় ক্রিকেট সম্বন্ধে ক্ষীণ ধারণা পোষণ করেন। গিমলেট ব্যতীত কেহই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে খেলতে মনোনীত হন নাই। ইংলণ্ডের পক্ষে নিয়মিত যে সব খেলোয়াড় খেলে থাকেন, তাদের কেহই এই দলে নেই। এমন কি, ইংলণ্ডের তিনটি প্রধান কাউন্টি, ইয়র্কসায়ার, গ্লুষ্টারসায়ার ও মিডলসেক্সের কোন খেলোয়াড় দলভুক্ত হন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় ল্যাঙ্কাসায়ারেরও কেহ নেই!

তবে এই দল খুব নিম্নস্তরের নহে। ইংলণ্ডের সম্মান কোনরূপ রক্ষা করতে সক্ষম হবে। অধিনায়ক এ জে হোমস একজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। দল পরিচালনা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এম সি সি দলের ম্যানেজার হিসাবে গিয়াছিলেন।

ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ এই দলের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলায় সাফল্য লাভ করবেন বলে আমার ধারণা। টেষ্ট খেলায় ভারতের সফলতাই ইংলণ্ডের ক্রিকেট কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারের সমুচিত প্রত্যুত্তর হবে। তাঁরা তখন বুঝবেন যে ভারতীয় ক্রিকেট সম্বন্ধে তাঁদের পোষিত ধারণাপেক্ষা উচ্চতর ধারণা ভারত দাবী করে।

এই দলে বোলার ও ব্যাটসম্যানের অভাব নেই। ওয়েলার্ড ও নিকলস দক্ষ ওপনিং বোলার। পার্কার মিডিয়াম পেস বোলার। পিটার স্মিথ ও জে এম ব্রোকলব্যাঙ্কস স্পিন বোলার। জেমস ল্যাংরিজ লেফট হ্যাণ্ড স্পিন বোলার। ব্যাটিং শক্তিও মন্দ নহে। জন ল্যাংরিজ ও এমারী ডেভিস ওপনিং ব্যাটসম্যান। পর্য্যায়ক্রমে ওয়্যাট, গিমলেট খেলবেন। গিমলেট সম্প্রতি ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, প্রথম খেলোয়াড় হিসাবেও খেলতে পারেন। ডোলারী ও হিউম্যানও বিশেষ শক্তিশালী ব্যাটসম্যান। ১৯৩৬ সালে উষ্টারস্ দলে খেলে ইহারাই ভারতীয় দলের পরাজয় ঘটিয়েছিলেন। উইকেট রক্ষক হিসাবে তিনজন আছেন। তার মধ্যে বার্টলেট সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইনি উইকেট রক্ষা ও ব্যাটিংয়ে বিশেষ দক্ষ। অধিনায়ক এজে হোমস সুদক্ষ খেলোয়াড়, খেলা পরিচালনা বিষয়েও তাঁর অভিজ্ঞতা আছে।

গৌরীসেনের যে বিপুল অর্থ ইঁহাদের ভারত আগমন উপলক্ষে ব্যয়িত হবে তা' শুধু মোটের উপর চলনসই বা

নিপিজ্, রেস

ভারতীয় ক্রিকেট দলকে পরাস্ত করবার মত শক্তিশালী এইরূপ দলের জন্যই কি? ভারতবাসী আশা করেছিল যে বিপুল অর্থব্যয়ের বিনিময়ে, হ্যামণ্ড না হোক অন্তত পক্ষে হ্যাটন, পেণ্টার, কপসন ও লেল্যাণ্ডের খেলা তারা দেখতে পাবে। ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের এম সি সিকে জানান উচিত যে, নামজাদা খেলোয়াড় না এলে গ্যারাণ্টি অর্থের গ্যারাণ্টি নেওয়া দুষ্কর হবে। মনে হয়, অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে এই দলের আকর্ষণ বিশেষ কার্য্যকরী হবে না।

কীটনের সাফল্য ঃ

নট্‌সের ওপনিং ব্যাটসম্যান কীটন মিডল্‌সেক্সের বিরুদ্ধে নট আউট ৩২১ রান তুলে হ্যামণ্ডের নট আউট ৩০২

কীটন

রানের রেকর্ড ভঙ্গ করে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। নট্‌সের ব্যাটস্‌ম্যানদের পক্ষেও ইহা নূতন রেকর্ড; পূর্ব্বে ১৯০৩ সালে জোন্স ২৯৬ রান করে নট্‌স ক্লাবে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

ফ্রিনটন-অন-সী টুর্ণামেণ্ট ঃ

ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় গাউস মহম্মদ ৩-৬, ৭-৫, ৬-০ গেমে ব্রিটিশ ইণ্টার ন্যাশানাল খেলোয়াড় জন ওলিফকে পরাজিত করে ফ্রিনটন-অন-সী টুর্ণামেণ্ট বিজয়ী হ'য়েছেন।

বাজ পরাজিত ঃ

আষ্টিন ভিলা মাঠে এক প্রদর্শনী খেলায় এলস্‌ ওয়ার্থ ভাইন্‌স্‌ ৬-২, ৭-৯, ৭-৫ গেমে বাজকে পরাজিত করেছেন। খেলাটিতে ১০,০০০ হাজার দর্শক সমবেত হ'য়েছিল।

আইরিশ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

পুরুষদের ডবলসে ভারতীয় খেলোয়াড় গাউস মহম্মদ ও সাবুর ৬-২, ৬-৪, ৬-২ গেমে জি এল রোর্গাস (আয়ার) ও ডি সি কোম্বকে (নিউজিল্যাণ্ড) পরাজিত করে আইরিশ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ডিলেফোর্ড (গ্রেট বৃটেন)

গাউস মহম্মদ সাবুর

৬-৪, ৫-৭, ৬-৪, ৬-২ গেমে গাউস মহম্মদকে পরাজিত করতে সক্ষম হ'য়েছেন।

জো লুই ঃ

জো লুই টনি গ্যালোনটোর সহিত মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় প্রায় বিশ হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন করেছেন। গত চারটি খেলাতে তাঁর মোট আয় হ'য়েছে এক লক্ষ পাউণ্ড। তাঁর সঙ্গে গ্যালোনটো ১১ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ড লড়ায় তাঁর এভারেজ নষ্ট হয়েছে। ম্যাক্স স্মেলিং, জন হেনরী লুইস ও জ্যাক রোপারকে পরাজিত করতে জো লুইয়ের এভারেজ ২ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড সময় লেগেছিল। ঐ খেলাগুলিতে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৬৫ পাউণ্ড উপার্জ্জন করেছিলেন। গ্যালোনটোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাঁর এভারেজ আয় প্রতি সেকেণ্ডে ১০৮ পাউণ্ড দাঁড়িয়েছে।

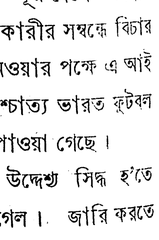

জো লুই

জো লুই নিজের পৃথিবীর হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ানসিপ অক্ষুন্ন রাখবার জন্য আগামী সেপ্টেম্বর মাসে নিউ-ইয়র্কের বব্‌ পাস্তোরের সঙ্গে কুড়ি রাউণ্ডের মুষ্টি যুদ্ধ করবেন।

৮০০ মিটারে নূতন রেকর্ড ঃ

জার্ম্মানীর আর হারবিগ ৮০০ মিটার দৌড় ১ মিনিট ৪৬·৬ সেকেণ্ডে শেষ করে পৃথিবীর নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ছিল উডারসনের ১ মিনিট ৪৮·৪ সেকেণ্ড।

আমেরিকায় পেশাদার গল্‌ফ প্রতিযোগিতা ঃ

হেনরী পিকার্ড আমেরিকার গল্‌ফার' এসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়ানসিপের ফাইনালে বাইরন নেলসনকে পরাজিত করেছেন।

রুল নং ৩৩ ঃ

রুল নং ৩৩ নাকি জারী না হতেই উহার উদ্দেশ্য প্রায় সাধিত হয়েছে। ফেডারেশনের সভ্যরা দূর দেশে অবস্থান করায় ফেডারেশনের পক্ষে ঐ রুল ভঙ্গকারীর সম্বন্ধে বিচার করা অসম্ভব বিধায় এই আইন তুলে নেওয়ার পক্ষে এ আই এফ এফের প্রেসিডেণ্টের সম্মতি এবং পাশ্চাত্য ভারত ফুটবল এসোসিয়েশনের সম্পাদকের অনুমোদন পাওয়া গেছে।

বাহবা যুক্তি! আইন করলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পৃথিবীতে বোধ হয় এই প্রথম দেখা গেল। জারি করতে

হলো না বা জারি করা গেল না; অপরাধকারীরা ভয়ে গালিয়ে গেল। রাম রাজত্ব ফিরে এলো বোধ হয়। ফেডারেশনের সভ্যরা দূরে থাকায় যে অসুবিধা তা' তো সব রুলের ক্ষেত্রেই ঘট্‌বে। প্রত্যেক সভাতেই তো তাঁরা সমবেত হয়ে থাকেন। রুলে গল্‌তি থাকে তো তাকে পুনরায় সংশোধিত আকারে গঠন করতে হবে। বাঙ্গলা দেশে এই রুল গঠনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে দেখা যায় নি। ঐ রুল অমান্য করে এবারও দলে দলে প্রতিদিনই বিদেশ থেকে খেলোয়াড় আমদানী হয়েছে—উদ্দেশ্য ছিল কি, বেশী করে খেলোয়াড় আমদানী করা?

পশ্চিম ভারতের সেক্রেটারীর মতে, প্রদেশ থেকে প্রদেশে খেলোয়াড় আমদানী রীতিতে খেলোয়াড়দের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয়। অতএব উহা চলুক। দলকে শুধু জয়ী করবার জন্য সারা ভারত বা ভারতের বাইরে থেকে বিদেশী আমদানী করে নিজ প্রদেশের ছেলেদের আখের মাটী করে দিলেই বুঝি খেলার উন্নতি সাধন করা হয়। এখানেও প্রাদেশিকতা রয়েছে—বাঙ্গলাই খেলোয়াড় আমদানীতে ক্ষতিগ্রস্ত বেশী হচ্ছে। ভারতের সকল প্রদেশ থেকে খেলোয়াড় এসে বাঙ্গলা ভরে গেছে। অন্য প্রদেশের তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। তাদের দেশবাসী এখানে এসে বেশ দু' পয়সা কামাচ্ছে। সেখানে ফুটবল খেলার এত সরগরমও নেই, আর পয়সা দেবার লোকেরও অভাব।

বিহার অলিম্পিক এসোসিয়েশন ঐ রুল বাতিল করার পক্ষপাতী নহেন। তাঁরা লিখেছেন, দু'টি কারণ দেখান হয়েছে, প্রথম—এই রুল প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়—প্রেসিডেণ্ট ও পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশন এই রুলের বাতিল অনুমোদন করছেন। প্রথমটি যদি সত্য হয়, তবে বলতে হবে যে এ আই এফ এর ব্যবস্থায় দুর্ব্বলতা আছে। দ্বিতীয়টি—আবেগের ব্যাপার। আইনতঃ কোন রুল বদলান যায় না রুল নং ৩৪এর অনুসরণ ব্যতীত।

আমরা বিহারের যুক্তি সর্ব্বান্তকরণে অনুমোদন করি। আই এফ এ এই বিষয়ে মতামত দিবার ভার প্রাদেশিক সাব কমিটির উপর দিয়েছেন। দেখা যাক, তাঁরা কি মতামত দেন।

শীল্ড ফাইনাল স্থগিত ঃ

এই প্রথমবার শীল্ড ফাইনাল স্থগিত হলো। কয়েক দিন-ব্যাপী বারিপাত এবং সেই দিন দুপুরের বারিপাতের জন্য ৩রা আগষ্ট তারিখে নির্দ্দিষ্ট শীল্ড খেলা আই এফ. এর আদেশে বন্ধ থাকে। দুপুরে উভয় দলকে এই সংবাদ ফোন যোগে জানান হয়।

এরূপ জলকাদায় ফাইনাল না খেলিয়ে আই এফ এ সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯২৩ সালের ফাইনালের কথা। তিন দিন ধরে প্রবল বারিপাত চলেছে। ফাইনাল খেলার দিন বৃষ্টির বেগ

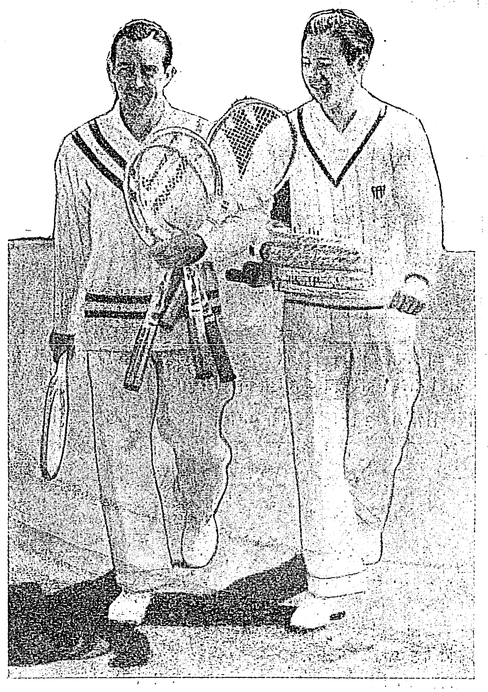

উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা বিজয়ী আর এল রিগ ও বিজিত ই টি কুক (বামে)

আরো বর্দ্ধিত হয়ে মুষলধারে চললো খেলারম্ভের আধ ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। সারা ক্যালকাটা মাঠ জলে ভাসছে। আউট লাইন, গোল লাইন সব ধুয়ে মুছে গেছে। খেলা হবার সম্ভাবনা নেই। রেফারি এলেন, মাঠ দেখে মন্তব্য করলেন—playable, খেলা চলবে। মোহনবাগান খেলোয়াড়ী মনোভাব দেখিয়ে খেলতে নামলে। বল ভাসছে, নগ্নপদে বাঙ্গালীর পক্ষে খেলা একেবারেই অসম্ভব।

ক্যালকাটা সুনিশ্চিত জয় জেনে আনন্দের সঙ্গে খেলছে, তাদের জিত হ'লো তিন গোলে।

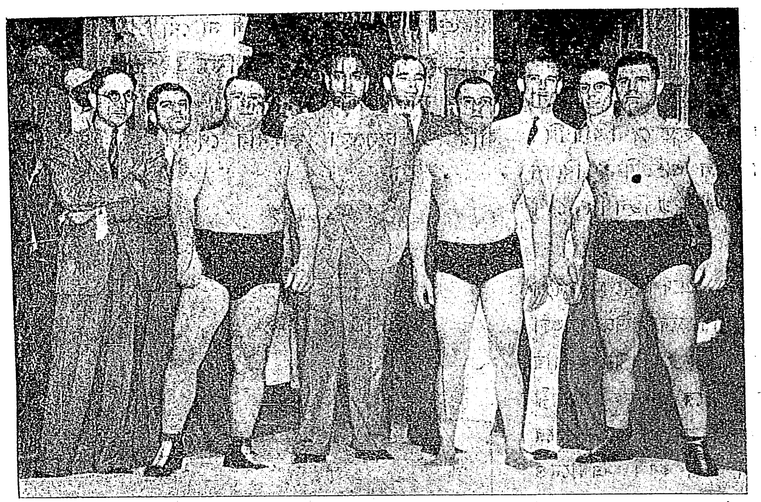

১৯৩৭ সালে বৃষ্টির জন্য চতুর্থ রাউণ্ডের চ্যারিটি মোহনবাগান বনাম ডি সি এল আইয়ের শীল্ড খেলা আই এফ এ স্থগিত করে পরের পর দিন নির্দ্ধারিত করেন। ডি সি এল আই দল তাতে যেরূপ খেলোয়াড়ি মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল, তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তখন একটি মুসলিম পত্রও ডি সি এল আইয়ের পক্ষে ওকালতী করেছিল এই বলে যে রেফারির আদেশ ব্যতীত খেলা স্থগিত রাখা চলে না। আমরা তখনও ইহার প্রতিবাদ করেছিলুম, কারণ খেলা হবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আই এফ এর খেলা স্থগিত করবার ক্ষমতা আছে বা থাকা উচিত। নইলে ড্র খেলার জন্য অন্য খেলার তারিখও পিছিয়ে দিতে তাঁরা পারেন না। মাঠে খেলোয়াড়রা নামবার পর রেফারির খেলা চালান বা বন্ধ করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা। কিন্তু এবার ফাইনালের দু' দলই বুটধারী (দু' একজন ব্যতীত) তখন জলকাদায় দু' দলেরই সমান সুবিধা ও অসুবিধা। আর কোন দল মোহনবাগান নয়, তাই এবার আর সেই পত্র constitution এর কথা তোলে নি।

১০.৮.৩৯

কুস্তি প্রতিযোগিতা :—জর্জ্জ (রুমেনিয়ার চ্যাম্পিয়ান), বাবিয়েন (বুলগেরিয়ার চ্যাম্পিয়ান), রামপুরের রাজা সাহেব বাহাদুর এবং জিবিস্কো (পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ান) দিল্লীতে সম্প্রতি তাঁদের খেলা দেখিয়েছেন

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীঅয়স্কান্ত বক্সী প্রণীত নাটক "ডক্টর মিস কুমুদ"—১৲
শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সরীসৃপ"—মূল্য ১॥০
লেডি ডাক্তার প্রণীত "দেশ-বিদেশের যৌন-বোধ—১৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত "সর্ব্বগ্রাসী-প্রেম"—২॥০
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীমন্মহারাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী ও উপদেশাবলী" ১ম খণ্ড—১।০
শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত "লামাদের দেশে"—৷৵০
শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অচিন-দেশ"—॥০
শেখ ফজলুল করীম সাহিত্যবিশারদের "বিবি রহিমা"—১৷০
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অজানা অতিথি"—২৲
শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত নাটক "বক-ধার্ম্মিক"—১৲
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত "বাঙ্গলার ধর্ম্মগুরু"—২৲
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস "জীবন-নদীর তীরে"—১॥০
শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "সরমা"—১৲
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্য-লহরী উপন্যাস "পিশাচের কূটচক্র"—৷৵০
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "গুপ্ত সংবাদ বিক্রেতা"—৷৵০
শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ প্রণীত "সহপাঠিনী"—১॥০
শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নাটক "মাকড়সার জাল"—১৲
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত "নগ্নতার ইতিহাস"—১।০
শ্রীকেশব সেন প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক "কেদার রায়"—৷৵০
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "বিদ্রোহিণী"—২৲
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত উপন্যাস "তরুণ গুপ্তে বিচিত্র কীর্ত্তিগাথা"—৷৵০
শ্রীগোপাল বটব্যাল প্রণীত গল্প সংগ্রহ "অলৌকিকা"—॥০
শ্রীপ্রমোদকুমার বসু প্রণীত উপন্যাস "পরাগড়ি"
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের "মুক্তি-পাগল বঙ্কিমচন্দ্র"—১৲
শ্রীহৃষীকেশ শীল প্রণীত "শ্রীগীতার ভক্তিব্যাখ্যা"—২৲
শ্রীসুবোধ বসু প্রণীত উপন্যাস "পদ্মা—প্রমত্তা নদী"—৩৲
শ্রীমাখনলাল ধর প্রণীত "সাঁতারের চিঠি"—১৲
শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ছোটদের "অচিন দেশের রাজকন্যা"—৷৵০
শ্রীপ্রবোধ ঘোষ প্রণীত ছোট গল্প "আরতি"—১৲
শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ধর্ম্ম বিজ্ঞান"—১৲
শ্রীসমর দে প্রণীত ছোটদের ছড়া "খেলা ঘর"—।০

সম্পাদক
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ || শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত সুরা ও কাব্যে এস আজ রচি' ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

বনতলে রূপলোক—